ইসলামের
বুনিয়াদী
শিক্ষা

ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৮০

২৪তম প্রকাশ

জমাদিউল আউয়াল	১৪৩৫
চৈত্র	১৪২০
মার্চ	২০১৪

বিনিময় ঃ ১৪০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

خطبات-এর বাংলা অনুবাদ

ISLAMER BUNIADI SHIKSHA by Sayeed Abul A'la Moududi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 140.00 Only.

বিংশ শতকের ইসলামী পুনর্জাগরণের নকীব মরহুম আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) ইসলামী আদর্শের যথার্থ ধারণা পেশ করতে গিয়ে ১৯৩৭-৩৮ সালে পাকিস্তানের পাঠান কোটের দারুল ইসলামে জুময়ার নামাযে যে খোতবা পেশ করেন, পরবর্তীকালে তা 'খোতবাত' নামে প্রকাশিত হয়। তিনি আজকের দিনের কেবলমাত্র বংশ বা জন্মসূত্রে পরিচয় প্রাপ্ত মুসলমানদের দুর্দশার কারণ নির্দেশ করে ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়সমূহ যেমন ঈমান, ইসলাম, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও জিহাদের সঠিক গুরুত্ব অনুধাবনের মাধ্যমে এগুলো থেকে ফলপ্রসূ কল্যাণ লাভে তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর মতে এসব মৌলিক ইবাদাত অন্তসারশূন্য আচার-অনুষ্ঠানে পরিণত হওয়ায় মুসলমানদের মানসিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে কোন প্রকার পরিবর্তনকামী প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। অথচ সৌভাগ্যক্রমে বিনা পরিশ্রমে একমাত্র মুসলমান পরিচয়দানের অধিকারী হওয়ায় তারা লাভ করেছে ইসলামের ইবাদাত স্বরূপ কল্যাণমুখী অনুষ্ঠানগুলো।

তিনি বলেন, কালেমায়ে তাওহীদ মানব জীবনের সমস্ত জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে। নামায-রোযা মানুষকে পরস্পরের অকৃত্রিম ও বিশ্বস্ত বন্ধু বানাতে পারে, যাকাত ব্যবস্থার দ্বারা দুনিয়ার অর্থব্যবস্থা সুষ্ঠতা লাভ করতে পারে এবং তা মানুষকে অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে মুক্তি দেয়, হজ্জ পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে ইসলামী আন্দোলনের বাণী পৌছে দিয়ে এক অভিন্ন মুসলিম মিল্লাত গঠনের প্রেরণা যোগায়। প্রকৃতপক্ষে এসব ইবাদাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে বাস্তব ও অর্থবহ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এক মহান দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সঠিকভাবে যোগ্য করে গড়ে তোলা। আর এই অমোঘ ও চিরন্তন দায়িত্ব হচ্ছে 'জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ'। আজকের বিশ্বের মুসলমানদের এই দুর্ভাগ্যজনক আত্ম-বিস্মৃতির পটভূমিতে তাদেরকে নতুন করে অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে মাওলানার এক যুগান্তকারী প্রয়াস হচ্ছে এই অনবদ্য গ্রন্থখানি। এই অনন্য গ্রন্থখানি ইসলামী জীবনীশক্তির বাস্তব প্রতিফলন জিহাদের অনুপ্রেরণায় সমৃদ্ধ।

ইতিমধ্যে এ গ্রন্থটি বিশ্বের প্রত্যন্ত প্রান্তে প্রায় সব প্রধান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে এর সব ক'টি অধ্যায় পৃথক পৃথকভাবে হাকীকত সিরিজ নামে বাংলা ভাষী ভাইদের কাছে পেশ করেছি। প্রিয় পাঠকদের বিরামহীন দাবীর প্রেক্ষিতে এর সব ক'টি অধ্যায়কে একত্রে 'ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা' নামে প্রকাশ করা হয়েছে।

—প্রকাশক

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ঈমানের হাকীকত

بسم الله الرحمن الرحيم

মুসলমান হবার জন্য জ্ঞানের আবশ্যকতা

প্রত্যেক মুসলমানই একথা ভাল করে জানে যে, দুনিয়ায় ইসলাম আল্লাহ তাআলার একটি সবচেয়ে বড় নিয়ামত। আল্লাহ তাআলা তাকে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা)-এর উম্মত করে সৃষ্টি করেছেন এবং ইসলামের ন্যায় এত বড় একটা নিয়ামত তাকে দান করেছেন বলে প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহর শোকর আদায় করে থাকে। এমন কি, স্বয়ং আল্লাহ তাআলাও ইসলামকে মানুষের প্রতি সবচেয়ে বড় ও উৎকৃষ্ট নিয়ামত বলে ঘোষণা করেছেন। বলেছেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط (المائدة : ٣)

"আজ আমি তোমাদের আনুগত্যের বিধান (জীবন বিধান) পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম।"

–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৩)

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের প্রতি এই যে, অনুগ্রহ করেছেন, এর হক আদায় করা তাদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। কারণ যে ব্যক্তি অপরের অনুগ্রহের হক আদায় করে না, সে বড়ই অকৃতজ্ঞ। আর সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা হচ্ছে মানুষের প্রতি আল্লাহ তাআলার এ বিরাট অনুগ্রহের কথা ভুলে যাওয়া। এখন আপনারা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের হক কিভাবে আদায় করা যেতে পারে? তাহলে আমি তার উত্তরে বলব যে, আল্লাহ তাআলা যখন আপনাকে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা)-এর উম্মাত করে সৃষ্টি করেছেন, তখন পূর্ণরূপে ও খাঁটিভাবে তার অনুগামী হতে পারলেই আল্লাহ তাআলার এ অনুগ্রহের হক আদায় হবে। আপনাকে যখন আল্লাহ তাআলা মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন, তখন তাঁর এ অনুগ্রহ ও দয়ার হক আদায় করতে হলে আপনাকে খাঁটি মুসলমান হতে হবে। এছাড়া আপনি অন্য কোন প্রকারেই এবং কোন উপায়েই তাঁর এ মহান উপকারের 'হক'

আদায় করতে পারেন না। আর আপনি যদি এই 'হক' আদায় করতে না পারেন বা না-করেন, তাহলে আপনি এই অকৃতজ্ঞতার জন্য মহা অপরাধী হবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকেই এই মহাপাপ হতে রক্ষা করুন, আমীন।

অতপর আপনারা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, পূর্ণ মুসলমান কিভাবে হওয়া যায় ? তবে তার উত্তর খুবই বিস্তৃত ও লম্বা হবে। এই পুস্তকে আমি ক্রমশ এর এক একটি অংশ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে থাকবো। সর্বপ্রথম আমি এমন একটি বিষয় বলবো, মুসলমান হতে হলে যার প্রয়োজন সকলের আগে এবং যাকে বলা যায় মুসলমান হওয়ার পথের প্রথম ধাপ।

একটু ধীরভাবে চিন্তা করে দেখুন যে, আপনারা সদাসর্বদা যে 'মুসলিম' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন, এর অর্থ কি ? মানুষ কি মায়ের গর্ভ হতেই ইসলাম ধর্ম সাথে করে নিয়ে আসে ? মুসলিম ব্যক্তির পুত্র অথবা মুসলিম ব্যক্তির পৌত্র হলেই কি মুসলমান হওয়া যায় ? ব্রাহ্মণের পুত্র হলেই যেমন ব্রাহ্মণ, চৌধুরীর পুত্র হলেই যেমন চৌধুরী এবং শুদ্রের পুত্র হলেই যেমন শুদ্র হওয়া যায়, তেমনি রূপে মুসলমান নামধারী ব্যক্তির পুত্র হলেই কি মুসলমান হতে পারে ? 'মুসলমান' কি কোন বংশ বা কোন শ্রেণীর নাম ? ইংরেজ জাতির মধ্যে জন্ম হলেই ইংরেজ, চৌধুরী বংশে জন্মিলেই চৌধুরী হয়, তেমনি মুসলমানরাও কি 'মুসলমান' নামক একটি জাতির বংশে জন্মলাভ করেছে বলেই 'মুসলমান' নামে অভিহিত হবে ? আমার এসব প্রশ্নের উত্তরে আপনারা কি এটাই বলবেন না যে, না, 'মুসলমান' তাকে বলে না। মায়ের গর্ভ হতেই মুসলমান হয়ে কেউ জন্মে না, বরং ইসলাম গ্রহণ করলেই মুসলমান হওয়া যায় এবং ইসলাম ত্যাগ করলেই মানুষ আর মুসলমান থাকে না—মুসলিম সমাজ হতে একেবারে খারিজ হয়ে যায়। যে কোন লোক—সে ব্রাহ্মণ হোক কিংবা পাঠান হোক, ইংরেজ হোক অথবা আমেরিকান, বাংগালী হোক অথবা হাবশী —সে যখন ইসলাম গ্রহণ করবে তখনই সে মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি 'মুসলমান' সমাজে জন্মগ্রহণ করেও ইসলামের নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান পালন করে চলে না, সে মুসলমান রূপে গণ্য হতে পারে না ; সে সৈয়দের পুত্রই হোক আর পাঠানের পুত্রই হোক তাতে কিছু আসে যায় না।

আমার পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলোর এ জবাব হতেই জানা গেল যে, আল্লাহ তাআলার বড় নিয়ামত—মুসলমান হওয়ার নিয়ামত—যা আপনি লাভ করেছেন, ওটা জন্মগত জিনিস নয়, তাকে আপনি মায়ের গর্ভ হতে জন্ম হওয়ার সাথে সাথেই লাভ করতে পারেন না এবং আজীবন এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করুন আর না-ই করুন তা আপনার সাথে নিজে নিজেই সর্বদা লেগে থাকবে

—এমন জিনিসও তা নয়। এটা একটি চেষ্টালভ্য নিয়ামত ; তা লাভ করতে হলে আপনাকে রীতিমত চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা-সাধনা করে যদি আপনি তা লাভ করেন, তবেই তাকে আপনি পেতে পারেন।—আর এর প্রতি যদি মোটেই খেয়াল না করেন, তবে এর সৌন্দর্য হতে বঞ্চিত হবেন (নাউযুবিল্লাহ)।

অতএব, প্রমাণিত হলো যে, ইসলাম গ্রহণ করলেই মানুষ মুসলমান হয়। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ কি ? মুখে মুখে যে ব্যক্তি 'আমি মুসলমান' বা 'আমি মুসলমান হয়েছি' বলে চীৎকার করবে, তাকেই কি মুসলমান মনে করতে হবে ? অথবা পূজারী ব্রাহ্মণেরা যেমন না বুঝে কতকগুলো সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করে, তেমনিভাবে আরবী ভাষায় কয়েকটি শব্দ না বুঝে মুখে উচ্চারণ করলেই কি মুসলমান হওয়া যাবে ? ইসলাম গ্রহণ করার তাৎপর্য কি এটাই ? উক্ত প্রশ্নের জবাবে আপনারা কি এটাই বলবেন না যে, ইসলাম গ্রহণের অর্থ এটা নয়। ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা)-এর প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যবস্থাকে বুঝে আন্তরিকতার সাথে সত্য বলে বিশ্বাস করা, জীবনের একমাত্র ব্রত ও আদর্শ হিসেবেই এটাকে গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা ; ইসলাম গ্রহণ করার তাৎপর্য এটাই। কাজেই যিনি এরূপ না করবেন তিনি মুসলমান হতে পারবেন না। আপনাদের এ জবাব হতে এটাই প্রকাশ পেল যে, প্রথমত ইসলাম জেনে ও বুঝে নেয়া এবং বুঝে নেয়ার পর তাকে কাজে পরিণত করার নাম ইসলাম গ্রহণ। কেউ কিছু না জেনেও ব্রাহ্মণ হতে পারে, কারণ সে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে, অতএব সে ব্রাহ্মণ থাকবে, কেউ কিছু না জেনেও চৌধুরী হতে পারে, যেহেতু সে চৌধুরীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে—চৌধুরীই সে থাকবে। কিন্তু ইসলামকে না জেনে কেউ মুসলমান হতে পারে না ; কারণ মুসলমান ব্যক্তির ঔরসে জন্ম হলেই মুসলিম হওয়া যায় না—ইসলামকে জেনে-বুঝে বিশ্বাস করে কাজ করলেই তবে মুসলমান হওয়া যায়। চিন্তা করে দেখুন, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা)-এর শিক্ষা ও জীবনব্যবস্থা না জেনে তাকে বিশ্বাস করা ও তদনুযায়ী কাজ করা কিরূপে সম্ভব হতে পারে ? আর না জেনে না বুঝে এবং বিশ্বাস না করেই বা মানুষ মুসলমান হতে পারে কিরূপে ? অতএব, বুঝা যাচ্ছে যে, মূর্খতা নিয়ে মুসলমান হওয়া ও মুসলমান থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। যারা মুসলমানের ঘরে জন্মলাভ করেছে, মুসলমান নামে যারা নিজেদের পরিচয় দেয় ও মুসলমান বলে দাবী করে তারা সকলেই প্রকৃতপক্ষে মুসলমান নয়। যিনি ইসলাম কি তা জানেন এবং বুঝে-শুনে তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিই মুসলমান। কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে নামের পার্থক্য নয়। অতএব, একজনের নাম রামপ্রসাদ, এজন্য সে হিন্দু এবং আর একজনের নাম

আবদুল্লাহ, অতএব সে মুসলমান—তা হতে পারে না। পরন্তু কাফের ও মুসলমানের মধ্যে শুধু পোশাকের পার্থক্যই আসল পার্থক্য নয়। কাজেই একজন ধূতি পরে বলে সে হিন্দু এবং অন্যজন পায়জামা বা লুঙ্গী পরে বলে সে মুসলমান বিবেচিত হতে পারে না। বরং মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে আসল পার্থক্য হচ্ছে উভয়ের ইলম বা জ্ঞানের পার্থক্য। এক ব্যক্তি কাফের এই জন্য যে, সে জানে না তার সৃষ্টিকর্তার সাথে তার কি সম্পর্ক এবং তার বিধান অনুসারে জীবন-যাপনের প্রকৃত পথ কোন্‌টি ? কিন্তু একটি মুসলমান সন্তানের অবস্থাও যদি এরূপ হয়, তবে তার ও কাফের ব্যক্তির মধ্যে কোন্ দিক দিয়ে পার্থক্য করা যাবে ? এবং এই দু'জনের মধ্যে পার্থক্য করে আপনি একজনকে কাফের ও অপরজনকে মুসলমান বলবেন কেমন করে ? কথাগুলো বিশেষ মনোযোগ সহকারে এবং ধীরভাবে ভেবে দেখা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলার যে মহান নিয়ামতের জন্য আপনারা শোকর আদায় করছেন, একে লাভ করা এবং রক্ষা করা এ দু'টি কাজই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ইলম বা জ্ঞানের ওপর। ইলম বা জ্ঞান না থাকলে মানুষ তা পেতে পারে না—সামান্য পেলেও তাকে বাঁচিয়ে রাখা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সবসময়ই তাকে হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা ও খুঁতখুঁতে ভাব মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। মুসলমান না হয়েও এক শ্রেণীর লোক নিজেদের মুসলমান মনে করে, এর একমাত্র কারণ তাদের মূর্খতা। যে ব্যক্তি একেবারেই জানে না যে, ইসলাম ও কুফরের মধ্যে এবং ইসলাম ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য কি, সে তো অন্ধকারাচ্ছন্ন পথের পথিকের মত ; সরল রেখার ওপর দিয়ে চলতে চলতে আপনা আপনি তার পা দু'খানা কখন যে পিছলিয়ে যাবে বা অন্য পথে ঘুরে যাবে, তা সে জানতেই পারবে না। জীবনের পথে চলতে চলতে সে সরল পথ হতে কখন যে সরে গিয়েছে, তা সে টেরও পাবে না। এমনও হতে পারে যে, পথিমধ্যে কোন ধোঁকাবাজ শয়তান এসে তাকে বলবে—"মিঞা তুমি তো অন্ধকারে পথ ভুলে গিয়েছ, আমার সাথে চল, আমি তোমাকে তোমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেব।" বেচারা অন্ধকারের যাত্রী নিজের চোখে যখন সরল-সঠিক পথ দেখতে পায় না, তখন মূর্খতার দরুনই নিজের হাত কোন দাজ্জালের হাতে সঁপে দিয়ে তার অনুসরণ করতে আরম্ভ করবে এবং সে তাকে পথভ্রষ্ট করে কোথা হতে কোথা নিয়ে যাবে তার কোন ঠিক ঠিকানা থাকবে না। তার নিজের হাতে আলো নেই এবং সে নিজে পথের রেখা দেখতে ও চিনে চলতে পারে না বলেই তো সে এতবড় বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু তাঁর কাছে যদি আলো থাকে, তবে সে পথও ভুলবে না, আর অন্য কেউও তাকে গোমরাহ করে বিপথে নিয়ে যেতে পারবে না। এ কারণেই ধারণা করে নিতে পারেন যে, ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়া এবং পবিত্র কুরআনের উপস্থাপিত বিধান ও হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা)-এর প্রদত্ত শিক্ষা

ভাল করে না জানা মুসলমান ব্যক্তির পক্ষে কতবড় বিপদের কথা ! এই অজ্ঞতার কারণে সে নিজেও পথভ্রষ্ট হতে পারে এবং অপর কোন দাজ্জালও তাঁকে বিপদগামী করতে পারে। কিন্তু যদি তার কাছে জ্ঞানের আলো থাকে, তবে সে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে এবং প্রতি ধাপে ইসলামের সরল পথ দেখতে পাবে। প্রতি পদেই কুফরি, গোমরাহী, পাপ, জ্বেনা, হারামী প্রভৃতি যেসব বাঁকা পথ ও হারাম কাজ সামনে আসবে, তা সে চিনতে এবং তা হতে বেঁচে থাকতে পারবে। আর যদি কোন পথভ্রষ্টকারী তার কাছে আসে তবে তার দু'-চারটি কথা শুনেই তাকে চিনতে পারবে। এবং এ লোকটি যে পথভ্রষ্টকারী ও এর অনুসরণ করা যে কিছুতেই উচিত নয়, তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে।

আমি যে ইলম বা জ্ঞানের কথা উল্লেখ করলাম, এর ওপরই আপনাদের ও আপনাদের সন্তান-সন্ততির মুসলমান হওয়া ও মুসলমান থাকা একান্তভাবে নির্ভর করে। এটা সাধারণ বস্তু নয়, একে অবহেলাও করা যায় না। কৃষক তার ক্ষেত-খামারের কাজে অলসতা করে না, ক্ষেত্রে পানি দিতে এবং ফসলের হেফাজত করতে গাফলতি করে না, গরু-বাছুরগুলোকে ঘাস-কুটা দিতে অবহেলা করে না ; কারণ এসব ব্যাপারে অলসতা করলে তার না খেয়ে মারার ও প্রাণ হারাবারও আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু মুসলমান হওয়া ও মুসলমান থাকা যে জ্ঞানের ওপর নির্ভর করছে, তা লাভ করতে মানুষ কেন এত অবহেলা করছে ? এতে কি ঈমানের মত অতি প্রিয় ও মূল্যবান নিয়ামত নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় নেই ? ঈমান কি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় নয় ? মুসলমানগণ প্রাণ রক্ষার ব্যাপারে যতটা সময় ব্যয় ও পরিশ্রম করে, এর দশ ভাগের এক ভাগও কি ঈমান রক্ষার কাজে ব্যয় করতে পারে না ?

আপনারা প্রত্যেকে এক একজন মৌলভী হবেন, বড় বড় কিতাব পড়ে এবং জীবনের দশ বারোটি বছর কেবল পড়াশুনার কাজে ব্যয় করে মস্তবড় একজন আল্লামা হবেন, এমন কথা আমি বলছি না। মুসলমান হওয়ার জন্য এত কিছু পড়ার বা বড় কোন ডিগ্রী লাভ করার কোন আবশ্যকতা নেই। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে, আপনারা রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মাত্র এক ঘন্টা সময় দ্বীনি এলম (ইসলামী বিদ্যা) শিখার কাজে ব্যয় করুন ; অন্ততপক্ষে প্রত্যেক মুসলমান বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলেরই এতটুকু ইলম বা জ্ঞান অর্জন করা দরকার, যা হতে তারা পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্য জানতে পারবে, তা ভাল রূপে বুঝতে পারবে, তা ভালরূপে বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। আর হযরত মুহাম্মাদ (সা) যেসব অন্যায় কুসংস্কার দূর করতে এবং সেই স্থানে যা স্থাপন করতে এসেছিলেন, তাও উত্তমরূপে জানতে পারবে এবং আল্লাহ তাআলা মানুষের জীবন যাপনের জন্য যে বিশেষ নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে

দিয়েছেন তার সাথে তারা ভাল করে পরিচিত হতে পারবে। এটুকু ইলম হাসিল করার জন্য খুববেশী সময়ের দরকার করে না, আর ঈমান যদি াস্তবিকই কারো প্রিয় বস্তু হয়, তবে এ কাজে একটা ঘন্টা মাত্র ব্যয় করা তার পক্ষে এতটুকুও কঠিন কাজ নয়।

মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য

প্রত্যেক মুসলমান নিশ্চয়ই একথা জানে যে, মুসলমান ব্যক্তির মর্যাদা ও সম্মান কাফের ব্যক্তিদের অপেক্ষা অনেক উচ্চে। আল্লাহ তাআলা মুসলমানকে পসন্দ করেন এবং কাফেরকে অপসন্দ করেন। মুসলমানের গোনাহ ক্ষমা করা হবে কাফেরের অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। মুসলমান জান্নাতে যাবে এবং কাফের জাহান্নামে। কিন্তু মুসলমান এবং কাফেরের মধ্যে এতখানি পার্থক্য কেন হলো, সেই সম্বন্ধে একটু গভীরভাবে চিন্তা করা আবশ্যক।

কাফের ব্যক্তিরা যেমন হযরত আদম (আ)-এর সন্তান, মুসলমানরাও তেমনি তাঁর সন্তান। মুসলমান যেমন মানুষ, কাফেররাও তেমনি মানুষ। মুসলমানদের মত তাদেরও হাত-পা, চোখ-কান সবই আছে। তারাও এ পৃথিবীর বায়ুতেই শ্বাস গ্রহণ করে, এ যমীনের ওপর বাস করে এবং খাদ্য খায়। তাদের জন্ম এবং মৃত্যু মুসলমানদের মতই হয়। যে আল্লাহ মুসলমানদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকেও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তাহলে মুসলমানদের স্থান উচ্চে এবং তাদের স্থান নীচে হবে কেন ? মুসলমান কেন জান্নাতে যাবে আর তারা কেন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে ? একথাটি বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখা আবশ্যক। মুসলমানদের এক একজনের নাম রাখা হয়েছে আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান বা তদনুরূপ অন্য কোন নাম, অতএব তারা মুসলমান। আর কিছু লোকের নাম রাখা হয়েছে দীননাথ, তারা সিং, রবার্টসন প্রভৃতি, কাজেই তারা কাফের ; কিংবা মুসলমানগণ খাতনা করায়, আর তারা তা করায় না, মুসলমান গরুর গোশত খায়, তারা তা খায় না—শুধু এটুকু কথার জন্যই মানুষে মানুষে এতবড় পার্থক্য হতে পারে না। আল্লাহ তাআলাই যখন সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সকলকেই তিনি লালন-পালন করেন—তিনি এতবড় অন্যায় কখনও করতে পারেন না। কাজেই তিনি এ রকম সামান্য বিষয়ের কারণে অন্যায় কখনও করতে পারেন না। কাজেই তিনি এ রকম সামান্য বিষয়ের কারণে মানুষে মানুষে এতবড় পার্থক্য করবেন এবং তাঁরই সৃষ্ট এক শ্রেণীর মানুষকে অকারণে দোযখে নিক্ষেপ করবেন—তা কিছুতেই হতে পারে না।

বাস্তবিকই যদি তা না হয়, তবে উভয়ের মধ্যে আসল পার্থক্য কোথায় তা চিন্তা করে দেখতে হবে। বস্তুত উভয়ের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কেবল মাত্র কুফরি ও ইসলামের। ইসলামের অর্থ—আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা এবং কুফরীর অর্থ আল্লাহকে অস্বীকার করা, অমান্য করা ও আল্লাহ তাআলার

অবাধ্য হওয়া। মুসলমান ও কাফের উভয়ই মানুষ, উভয়ই আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট জীব, তাঁরই আজ্ঞাবহ দাস। কিন্তু তাদের একজন অন্যজন অপেক্ষা এজন্য শ্রেষ্ঠ যে, একজন নিজের প্রকৃত মনিবকে চিনতে পারে, তাঁর আদেশ পালন করে এবং তাঁর অবাধ্য হওয়ার দুঃখময় পরিণামকে ভয় করে। কিন্তু অন্যজন নিজ মনিবকে চিনে না এবং তাঁর অবাধ্য হওয়ার দুঃখময় পরিণামকে ভয় করে। কিন্তু অন্যজন নিজ মনিবকে চিনে না এবং তাঁর আদেশ পালন করে না, এজন্যই সে অধপাতে চলে যায়। এ কারণেই মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট এবং কাফেরের প্রতি অসন্তুষ্ট, মুসলমানকে জান্নাতে দেয়ার ওয়াদা করেছেন এবং কাফেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার ভয় দেখিয়েছেন।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মুসলমানকে কাফের হতে পৃথক করা যায় মাত্র দু'টি জিনিসের ভিত্তিতে ঃ প্রথম, ইলম বা জ্ঞান ; দ্বিতীয়, আমল বা কাজ। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানকে প্রথমেই জানতে হবে যে, তার প্রকৃত মালিক কে ? কি তাঁর আদেশ ও নিষেধ ? তাঁর মর্জিমত চলার উপায় কি ? কিসে তিনি সন্তুষ্ট হন আর কিসে তিনি অসন্তুষ্ট হন—এসব বিস্তৃতভাবে জেনে নেয়ার পর নিজেকে প্রকৃত মালিকের একান্ত অনুগত বানিয়ে দেবে, তাঁর মর্জিমত চলবে, নিজের স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করবে। তার মন যদি 'মালিকের' ইচ্ছার বিপরীত কোন বস্তুর কামনা করে তবে সে নিজের মনের কথা না শুনে 'মালিকের' কথা শুনবে। কোন কাজ যদি নিজের কাছে ভাল মনে হয়, কিন্তু মালিক সেই কাজটিকে ভাল না বলেন, তবে তাকে মন্দই মনে করবে। আবার কোন কাজ যদি নিজের মনে খুব মন্দ বলে ধারণা হয়, কিন্তু 'মালিক' তাকে ভাল মনে করেন এবং কোন কাজ যদি নিজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে হয় অথচ 'মালিক' যদি তা করার হুকুম দেন, তবে তার জান ও মালের যতই ক্ষতি হোক না কেন, তা সে অবশ্যই করবে। আবার কোন কাজকে যদি নিজের জন্য লাভজনক মনে করে, আর 'মালিক' তা করতে নিষেধ করেন তবে তাতে দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পত্তি লাভ করতে পারলেও তা সে কখনই করবে না। ঠিক এ ইলম ও এরূপ আমলের জন্যই মুসলমান আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দাহ। তার ওপর আল্লাহ তাআলার রহমত বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ তাআলা তাকে সম্মান দান করেন। কিন্তু উল্লিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে কাফের কিছুই জানে না এবং এ জ্ঞান না থাকার দরুনই তার কার্যকলাপও তদনরূপ হয় না এ জন্য যে, সে আল্লাহ তাআলা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ এবং তাঁর অবাধ্য বান্দাহ। ফলত সে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হবে।

এ আলোচনার শেষকথা এই যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, অথচ কাফেরের মতই জাহেল বা অজ্ঞ এবং আল্লাহ তাআলার

অবাধ্য এমতাবস্থায় কেবল নাম, পোশাক ও খানা-পিনার পার্থক্যের কারণে সে কাফের অপেক্ষা কোনভাবেই শ্রেষ্ঠ হতে পারে না, আর কোন কারণেই সে ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ তাআলার রহমতের হকদার হতে পারে না।

ইসলাম কোন জাতি, বংশ বা সম্প্রদায়ের নাম নয়। কাজেই বাপ হতে পুত্র এবং পুত্র হতে পৌত্র আপনা-আপনিই তা লাভ করতে পারে না। ব্রাহ্মণের পুত্র মূর্খ এবং চরিত্রহীন হলেও কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের পুত্র বলেই সে ব্রাহ্মণের মর্যাদা পেয়ে থাকে এবং উচ্চ বংশ বলে পরিগণিত হয়। আর চামারের পুত্র জ্ঞানী ও গুণী হয়েও নীচ ও হীন থেকে যায়। কারণ সে চামারের মত নীচ জাতির ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু ইসলামে এসব বংশ বা গোত্রীয় মর্যাদার বিন্দুমাত্র স্থান নেই। এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থ কুরআনে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেনঃ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ "তোমাদের মধ্যে যে লোক আল্লাহ তাআলাকে বেশী ভয় করে এবং সকলের অধিক তাঁর আদেশ পালন করে চলে সে-ই তাঁর কাছে অধিক সম্মানিত।" হযরত ইবরাহীম (আ) একজন মূর্তি-পূজারীর ঘরে জন্ম লাভ করেছিলেন ; কিন্তু তিনি আল্লাহ তাআলাকে চিনতে পেরে তাঁর আদেশ পালন করলেন ; এ জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে সমস্ত জগতের নেতা বা ইমাম করে দিয়েছিলেন। হযরত নূহ (আ)-এর পুত্র একজন নবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিল ; কিন্তু সে আল্লাহ তাআলাকে চিনতে পারল না বলে তাঁর অবাধ্য হয়ে গেল। এজন্য তার বংশমর্যাদার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হলো না। উপরন্তু যে শাস্তি দেয়া হলো, সমস্ত দুনিয়া তা হতে শিক্ষা লাভ করতে পারে। অতএব বুঝে দেখুন, আল্লাহ তাআলার কাছে মানুষে মানুষে যা কিছু পার্থক্য হয়ে থাকে, তা কেবল ইলম ও আমলের জন্য মাত্র। দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর অনুগ্রহ কেবল তারাই পেতে পারে, যারা তাঁকে তাঁর প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী চিনে এবং তাঁর অনুসরণ করে।

কিন্তু যাদের মধ্যে এ গুণ নেই, তাদের নাম আবদুল্লাহই হোক, আর আবদুর রহমান হোক, দীননাথই হোক, আর তারাসিং-ই হোক, আল্লাহ তাআলার কাছে এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই—এরা কেউই আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ পাবার অধিকার পেতে পারে না।

মুসলমানগণ নিজেদের মুসলমান বলে মনে করে এবং মুসলমানের ওপর আল্লাহ তাআলার রহমত বর্ষিত হয় বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু একটু চোখ খুলে চেয়ে দেখুন, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ কি তাদের ওপর সত্যই নাযিল হচ্ছে ? পরকালের কথা পরের জন্যই রইল, এই দুনিয়ায় মুসলমানদের যে দুরাবস্থা হচ্ছে তা-ই একবার খেয়াল করে দেখা আবশ্যক।

মুসলমান বাস্তবিকই যদি আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দাহ হতো তাহলে আল্লাহর সেই প্রিয়জনেরা দুনিয়ায় নানাভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে কেন ? আল্লাহ কি যালেম (নাউযুবিল্লাহ) ? মুসলমান যদি আল্লাহ তাআলার 'হক' জানত, তাঁর আদেশ পালন করতো, তাহলে তিনি তাঁর অবাধ্য বান্দাদেরকে মুসলমানদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা করে দেবেন কেন ? আর তাদেরকে তার আনুগত্যের বিনিময়ে শাস্তিইবা দেবেন কোন কারণে ? আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই যালেম নন এবং তাঁর আনুগত্য করার বিনিময় অপমান ও শাস্তি নয়। একথা যদি একান্তভাবে বিশ্বাস করা হয় তবে স্বীকার করতেই হবে যে, মুসলমানদের মুসলমান হওয়ার দাবীতে কিছুটা গলদ আছে। তাদের নাম সরকারী দফতরে নিশ্চয়ই মুসলমান হিসেবে লিখিত আছে ; কিন্তু সেই সরকারী দফতরের সার্টিফিকেট অনুসারে আল্লাহ তাআলার দরবারে বিচার হবে না। আল্লাহ তাআলার নিজস্ব দফতরত রয়েছে এবং তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাজেই তাঁর দফতরে মুসলমানদের নাম তাঁর অনুগত লোকদের তালিকায় লিখিত আছে, না অবাধ্য লোকদের তালিকায় লিখিত হয়েছে তা খোঁজ করে দেখা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের কাছে কিতাব পাঠিয়েছেন, তা পড়ে মুসলমানগণ প্রকৃত 'মালিক'-কে চিনতে পারে ; কিন্তু ঐ কিতাবে যা লিখিত আছে, তা জানার জন্য মুসলমানগণ একটুও চেষ্টা করেছে কি ? আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি নবী পাঠিয়েছেন, তিনি মুসলিম হওয়ার উপায় ও নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর নবী দুনিয়ায় এসে কি শিক্ষা দিয়েছেন, তা জানার জন্য তারা কখনও যত্নবান হয়েছে কি ? আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে ইজ্জত লাভ করার পথের সন্ধান বলে দিয়েছেন, কিন্তু তারা সেই পথে চলছে কি ? যেসব কাজ মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে, আল্লাহ তাআলা তা এক এক করে বলে দিয়েছেন, কিন্তু মুসলমান কি সেসব কাজ ত্যাগ করেছে ? এ প্রশ্নগুলোর কি উত্তর হতে পারে ? যদি স্বীকার করা হয় যে, আল্লাহ তাআলার কিতাব হতে মুসলমানগণ যেমন কোন জ্ঞান লাভ করতে চেষ্টা করেনি, তেমনি তাঁর প্রদর্শিত পথেও তারা একটুও চলেনি, তাহলে তারা মুসলমান হলো কিরূপে এবং তারা পুরস্কারই বা কিরূপে চাচ্ছে। তারা যে ধরনের মুসলমানীর দাবী করছে, ফলও তেমনি পাচ্ছে, আর তেমনি পুরস্কার তারা পরকালেও পাবে।

আমি প্রথমেই বলেছি যে, মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে ইলম ও আমল— জ্ঞান ও কাজ ছাড়া আর কোনই প্রভেদ নেই। কারো ইলম ও আমল যদি কাফেরের ইলম ও আমলের মত হয়, আর তবুও সে নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয় তাহলে বুঝতে হবে, যে, তার মত মিথ্যাবাদী আর কেউই নয়। কাফের পবিত্র কুরআন পড়ে না এবং তাতে কি লিখিত আছে তা সে জানে না।

কিন্তু মুসলমানের অবস্থা যদি এ রকমই হয় তাহলে সে নিজেকে মুসলমান বলবে কোন অধিকারে ? নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা) দুনিয়ার মানুষকে যে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করার জন্য যে সরল পথ দেখিয়েছেন, কাফেরগণ তা কিছুই জানে না। এখন মুসলমানও যদি সেই রকমই অজ্ঞ হয় তাহলে তাকে 'মুসলমান' কেমন করে বলা যায় ? কাফের আল্লাহর মর্জি মত চলে না, চলে নিজ ইচ্ছামত ; মুসলমানও যদি সেরূপ স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধীন হয়, সেরূপ নিজের খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্তী হয়, সেরূপই আল্লাহর প্রতি উদাসীন ও বেপরোয়া হয় এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুগত দাস হয়, তবে তার নিজেকে 'মুসলিম' অর্থাৎ 'আল্লাহর আদেশ পালনকারী' বলার কি অধিকার আছে ? কাফের হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করে না যে কাজে সে লাভ ও আনন্দ দেখতে পায়—তা আল্লাহ তাআলার কাছে হালাল হোক কি হারাম হোক—অসংকোচে সে তাই করে যায়। মুসলমানও যদি এ নীতি গ্রহণ করে তবে তার ও কাফের ব্যক্তির পার্থক্য রইল কোথায় ? মোটকথা, কাফেরের ন্যায় মুসলমানও যদি ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ হয় এবং কাফের ও মুসলমানের কাজ-কর্ম যদি একই রকম হয়, তাহলে দুনিয়ায় কাফেরের পরিবর্তে কেবল মুসলমানরাই সম্মান লাভ করবে কেন ? কাফেরের ন্যায় মুসলমানরাও পরকালে শাস্তি ভোগ করবে না কিসের জন্য ? এটা এমন একটি গুরুতর বিষয় যে, এ সম্বন্ধে আমাদের ধীরভাবে চিন্তা করা আবশ্যক।

একথা মনে করার কারণ নেই যে, আমি মুসলমানকে কাফেরের মধ্যে গণ্য করছি, কারণ তা কখনও উচিত নয়। আমি নিজেও এ সম্বন্ধে যারপর নেই চিন্তা করি এবং আমি চাই যে, আমাদের সমাজের প্রত্যেকেই এ সম্বন্ধে চিন্তা করুক। আমরা আল্লাহ তাআলার রহমত হতে বঞ্চিত হচ্ছি কেন, চারিদিক হতে আমাদের ওপর কেন এ বিপদরাশি এসে পড়ছে ? যাদেরকে আমরা 'কাফের' অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্য বান্দাহ মনে করি, তারা আমাদের ওপর সকল ক্ষেত্রে বিজয়ী কেন ? আর আমরা যারা আল্লাহর আদেশ পালনকারী বলে দাবী করি, তারাই বা সব জায়গায় পরাজিত কেন ? এর কারণ সম্বন্ধে আমি যতই চিন্তা করি, ততই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আমাদের ও কাফেরদের প্রতি বর্তমানে শুধু নামেই পার্থক্য রয়ে গিয়েছে। কার্যত আমরা আল্লাহ তাআলার প্রতি অবহেলা, ভয়হীনতা এবং অবাধ্যতা দেখাতে কাফেরদের অপেক্ষা কিছুমাত্র পিছনে নেই। তাদের ও আমাদের মধ্যে সামান্য কিছু প্রভেদ অবশ্যই আছে, কিন্তু তার জন্য আমরা কোনরূপ প্রতিদান বা পুরস্কারের আশা করতে পারি না, বরং সেই জন্য আমরা অধিক শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। কেননা আমরা জানি যে, কুরআন আল্লাহ তাআলার কিতাব, অথচ আমরা এর সাথে কাফেরের ন্যায়ই ব্যবহার করছি। আমরা জানি, হযরত মুহাম্মাদ (স) প্রকৃত,

শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী, অথচ তাঁর অনুসরণ করা আমরা কাফেরদের মতই ত্যাগ করেছি। আমরা জানি যে, মিথ্যাবাদীর প্রতি আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন এবং ঘুষখোরদের ও ঘুষদাতা উভয়ই নিশ্চিতরূপে দোযখে যাবে বলে ঘোষণা করেছেন, সুদখোর ও সুদদাতাকে জঘন্য পাপী বলে অভিহিত করেছেন। চোগলখুরী ও গীবতকারীকে আপন ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন, অশ্লীলতা ও লজ্জাহীনতার জন্য কঠিন শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু এ সমস্ত কথা জানার পরও আমরা কাফেরদের মতই বেপরোয়াভাবে এসব কাজ করে যাচ্ছি। মনে হয়, যেন আমাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় মাত্রই নেই। এ জন্য কাফেরদের তুলনায় আমরা কিছুটা 'মুসলমান' হয়ে থাকলেও আমাদের জীবনে তার কোন প্রতিফলন আমরা পাচ্ছি না ; বরং কেবল শাস্তিই পাচ্ছি —নানাভাবে এবং নানাদিক দিয়ে। আমাদের ওপর কাফেরদের জয়লাভ এবং সর্বত্র আমাদের পরাজয় এ অপরাধেরই শাস্তি। ইসলাম রূপ এক মহান নেয়ামত আমাদেরকে দেয়া হয়েছে, অথচ আমরা তার বিন্দুমাত্র কদর করিনি, এটা অপেক্ষা বড় অপরাধ আর কি হতে পারে ?

ওপরে যা কিছু বলেছি, তা কাউকে ভর্ৎসনা করার উদ্দেশ্যে বলিনি, ভর্ৎসনা করার উদ্দেশ্যে কলমও ধরিনি। আসলে উদ্দেশ্য এই যে, আমরা যা কিছু হারিয়ে ফেলেছি, তা ফিরে পাবার জন্য চেষ্টা করা হোক। হারানো জিনিস পুনরায় পাওয়ার চিন্তা মানুষের ঠিক তখনই হয়, যখন সে নিশ্চিতরূপে জানতে ও বুঝতে পারে যে, তার কি জিনিস এবং কত মূল্যবান জিনিস হারিয়েছে। এজন্যই আমি মুসলমানদেরকে সতর্ক করার চেষ্টা করছি, যদি তাদের জ্ঞান ফিরে আসে এবং তারা যে প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস হারিয়ে ফেলেছে তা যদি বুঝতে পারে, তবে তা পুনরায় পেতে চেষ্টা করবে।

আমি প্রথম প্রবন্ধে বলেছি যে, মুসলমানের প্রকৃত মুসলমান হবার জন্য সর্বপ্রথম একান্ত দরকার হচ্ছে খাঁটি ইসলামী শিক্ষা ও ইসলাম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা কি ? রাসূল পাকের প্রদর্শিত পথ কি ? ইসলাম কাকে বলে ? কুফর ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য কোন বিষয়ে ? এসব কথা প্রত্যেক মুসলমানেরই সুস্পষ্টরূপে জেনে নেয়া আবশ্যক। এ জ্ঞান না থাকলে কোন ব্যক্তিই মুসলমান হতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারা সেই ইলম অর্জন করতে কোনই চেষ্টা করে না। এটা হতে বুঝা যায় যে, তারা যে কত বড় নেয়ামত ও রহমত হতে বঞ্চিত, সে কথা এখন পর্যন্ত তারা বুঝতে পারেনি। শিশু কেঁদে না ওঠলে মা-ও তাকে দুধ দেয় না, পিপাসু ব্যক্তি পিপাসা বোধ করলেই নিজেই পানির তালাশ করে, আল্লাহ-ও তাকে পানি মিলিয়ে দেন। মুসলমানদের নিজেদেরই যদি পিপাসা না থাকে, তবে পানি ভরা কূপ

তাদের মুখের কাছে আসলেও তাতে কোন লাভ নেই। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা কত বড় এবং কত ভীষণ ক্ষতি তা তাদের নিজেদেরই অনুধাবন করা উচিত। আল্লাহ তাআলার কিতাব তাদেরই কাছে মওজুদ আছে, অথচ নামাযে তারা আল্লাহ্ তাআলার কাছে কি প্রার্থনা করে, তা তারা জানে না, এটা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের কথা আর কি হতে পারে ? যে 'কালেমা' পাঠ করে তারা ইসলামে প্রবেশ করে, এর অর্থ পর্যন্ত তারা জানে না। এই কালেমা পাঠ করার সাথে সাথে তাঁদের ওপর কি কি দায়িত্ব এসে পড়ে তাও জানে না। বস্তুত একজন মুসলমানের পক্ষে এতদপেক্ষা ক্ষতি ও দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। ক্ষেত-খামার নষ্ট হওয়ার পরিণাম যে কি, তা সকলেই জানে। ফসল নষ্ট হলে না খেয়ে মরতে হবে তাতে কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার পরিণাম যে কত ভীষণ ও ভয়াবহ, সেই কথা তারা অনুভব করতে পারে না। কিন্তু এ ক্ষতির কথা যখন তারা অনুভব করতে পারবে, তখন তারা নিজেরাই এই ভীষণ ক্ষতির কবল হতে বাঁচতে সচেষ্ট হবে, তখন ইনশাআল্লাহ তাদেরকে এ ক্ষতি হতে বাঁচাবার ব্যবস্থাও করা হবে।

ভাববার বিষয়

বর্তমান দুনিয়ায় একমাত্র মুসলমানদের কাছেই আল্লাহ তাআলার কালাম সম্পূর্ণ অবিকৃত ও অপরিবর্তিত অবস্থায় বর্তমান আছে। কুরআনের যে শব্দ আল্লাহর নবীর প্রতি নাযিল হয়েছিল, আজ পর্যন্ত অবিকল তা-ই আছে। এ দিক দিয়ে দুনিয়ার মুসলমানগণ ভাগ্যবান জাতি, তাতে সন্দেহ নেই। আবার দুনিয়ার এ মুসলমানই একমাত্র হতভাগ্য ; যাদের কাছে আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালাম এর আসল অবস্থায় বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এর বরকত ও অফুরন্ত নিয়ামত হতে তারা বঞ্চিত। কুরআন শরীফ তাদের ওপর এ জন্য নাযিল হয়েছিল যে, তারা এটা পড়বে, বুঝবে, তদনুযায়ী কাজ করবে। এটা এসেছিল তাদেরকে শক্তি এবং সম্মান দান করার জন্য। এটা তাদেরকে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রকৃত 'খলিফা' বানাতে এসেছিল। আর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যতদিন তারা কুরআনের হেদায়াত অনুযায়ী চলেছে, ততদিন এটা তাদেরকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নেতা বানিয়ে রেখেছে। কিন্তু আজকাল তারা কুরআন দ্বারা জ্বিন-ভূত তাড়ান ছাড়া আর কোন কাজই করছে না। এর আয়াত লিখে তারা গলায় বাঁধে, তা লিখে ও গুলে পানি খায়, আর শুধু পুণ্য সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে না বুঝে পাঠ করে, তারা আজ এর কাছে হিদায়াত চায় না। তাদের ধর্ম বিশ্বাস কি রকম হবে, তা তারা কুরআনের কাছে জিজ্ঞেস করে না। তাদের কাজ-কর্ম কিরূপ হওয়া উচিত তাদের চরিত্র কিরূপ হওয়া দরকার, তারা এ দুনিয়ায় কিরূপে জীবন-যাপন করবে, লেন-দেন কিভাবে করবে, কোন নিয়ম অনুসারে তারা মানুষের সাথে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা করবে, আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদের প্রতি এবং তাদের নিজেদের প্রতি তাদের কর্তব্য কি, আর তা কিভাবেই বা পালন করবে, দুনিয়ায় কার হুকুম মানবে আর কার হুকুম অমান্য করবে, কার সাথে সম্বন্ধ রাখা উচিত, কার সাথে নয়, তাদের মিত্র কে আর শত্রুই বা কে, কিসে তাদের সম্মান ও সফলতা হবে, কোন কাজে ধন-দৌলত লাভ হবে, তাদের ব্যর্থতা এবং ক্ষতিই বা কিসে হতে পারে—কুরআনের নিকট এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব চাওয়া মুসলমানগণ এখন ছেড়ে দিয়েছে। এখন তারা কাফের, মুশরিক, গোমরাহ ও স্বার্থপর লোকদের কাছে এবং নফসরূপ শয়তানের কাছে এ সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ চায়, আর এদের পরামর্শ অনুযায়ীই তারা কাজ করে। কাজেই আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের হুকুম অনুসারে কাজ করার যে পরিণাম হতে পারে, তাই হয়েছে। আর সেই ফলই তারা আজ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ ও এক এক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাড়ে হাড়ে ভোগ করছে। কুরআন শরীফ সমস্ত মংগলের উৎস, লোকেরা যে রকমের এবং যে পরিমাণের মংগল এর কাছে চাবে,

কুরআন তাই এবং ততটুকুই দান করবে। জ্বিন-ভূত তাড়ান, সর্দি-কাশির চিকিৎসা, মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ, চাকুরী লাভ আর এ ধরনের সব ছোট ছোট ও নিকৃষ্ট জিনিস যদি তারা এর কাছে চায়, তবে তাই দান করবে। আর যদি দুনিয়ার বাদশাহী এবং সারেজাহানের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব পেতে চায়, তবে তাও তাদেরকে দেবে। এমন কি, যদি আল্লাহর আরশের কাছে পৌঁছতে চায়, তবে কুরআন তাদেরকে সেখান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে। মূলত তা তার পাত্রের যোগ্যতার ওপরই নির্ভর করে। তারা আজ মহাসমুদ্রের কাছ হতে মাত্র দু' ফোটা পানি নিচ্ছে, অথচ সমুদ্র তাদেরকে বড় বড় নদী দান করতে পারে।

আমাদের মুসলমান ভাইগণ আল্লাহর পাক কিতাবের সাথে যে ধরনের অসংগত ব্যবহার করে থাকে, তা এতই হাস্যকর ব্যাপার যে, এরা নিজেরা যদি দুনিয়ার কোন কাজে অন্য কোন লোককে সে ধরনের ব্যবহার করতে দেখতো তবে তারা তাকে বিদ্রূপ করতে ক্রটি করতো না, বরং তারা তাকে পাগল মনে করতো। কোন ব্যক্তি যদি ডাক্তারের কাছ হতে ওষুধের তালিকা লিখে এনে কাপড়ে জড়িয়ে গলায় বেঁধে রাখে, কিংবা পানিতে ধুয়ে তা পান করে, তবে আপনারা তাকে কি বলবেন ? আপনারা কি তার কাজ দেখে হাসবেন না এবং তাকে নিতান্ত আহাম্মক মনে করবেন না ? কিন্তু সবচেয়ে বড় ডাক্তার আপনাদের রোগের চিকিৎসা ও আপনাদেরকে নিরাময় করার উদ্দেশ্যে যে অতুলনীয় তালিকা লিখে দিয়েছেন, তার সাথে দিন-রাত আপনাদের চোখের সামনেই এ ধরনের ব্যবহার হচ্ছে। অথচ সেই জন্য কারো এতটুকু হাসির উদ্রেক হয় না। একথা কেউই ভেবে দেখেন না যে, ওষুধের তালিকা গলায় বাঁধার বা ধুয়ে খাবার জিনিস নয়, এর বিধান অনুযায়ী ওষুধ বানিয়ে ব্যবহার করার জন্যই তা লিখিত হয়েছে।

কোন রুগ্ন ব্যক্তি যদি একখানা ডাক্তারী কিংবা হেকিমী বই নিয়ে পড়তে শুরু করে আর মনে করে যে, এ বইখানা পড়লে সব রোগ আপনা আপনি দূর হয়ে যাবে। তবে আপনারা তাকে কি বলবেন ? আপনারা কি বলবেন না যে, তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তাকে পাগলখানায় পাঠিয়ে দাও ? কিন্তু হায় ! একমাত্র মহা চিকিৎসক আল্লাহ তাআলা আপনাদের রোগের চিকিৎসার জন্য যে মহান কিতাব পাঠিয়েছেন, তার সাথে আপনাদের ব্যবহার ঠিক একই রকম হচ্ছে। আপনারা তা পড়েন আর মনে করেন যে, এটা পড়লেই সব রোগ দূর হয়ে যাবে—এর বিধান মত কাজ করার কোনই দরকার নেই। আর এ কিতাব যেসব জিনিসকে ক্ষতিকর মনে করে বর্জন করতে বলে তা বর্জন করারও কোন দরকার মনে করেন না। তাহলে রোগ দূর করার জন্য যে ব্যক্তি শুধু বই পড়াই

যথেষ্ট মনে করে, তার সম্পর্কে আপনারা যে মত প্রকাশ করে থাকেন, আপনাদের নিজেদের সম্পর্কে সেরূপ মত প্রকাশ করেন না কেন ?

আপনি জানেন না এমন কোন ভাষায় যদি আপনার কাছে কোন চিঠি আসে তবে আপনি অমনি এর অর্থ জানার জন্য ঐ ভাষা যে ব্যক্তি জানে তার কাছে দৌড়ে যান। এর অর্থ যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি জানতে না পারেন, ততক্ষণ আপনার বিন্দুমাত্র শান্তি থাকে না। সাধারণ কায়-কারবারের চিঠি নিয়ে আপনি এই প্রকার অস্থির হয়ে পড়েন ; এতে আপনার হয়ত দু'-চার পয়সারই উপকার হতে পারে, তার বেশী নয়। কিন্তু সারেজাহানের মালিক আল্লাহর কাছ হতে যে চিঠি আপনার কাছে এসেছে, আর যার মধ্যে আপনার ইহকাল ও পরকালের সমস্ত মংগল নিহিত আছে তাকে আপনি অবহেলা করে ফেলে রাখেন, এর অর্থ জানার কোন আগ্রহ বা অস্থিরতাই আপনার মধ্যে জাগে না। এটাকি বাস্তবিকই আশ্চর্যের ব্যাপার নয় ? এসব কথা আমি হাসি-তামাশার জন্য বলছি না। আপনারা যদি একথা চিন্তা করে দেখেন তবে আপনাদের অন্তরই বলে দেবে যে, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় অবিচার হচ্ছে আল্লাহর এই মহান কিতাবের প্রতি। আর এ অবিচার শুধু তারাই করছে, যারা ও কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে বলে দাবী করে এবং এর জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত বলে প্রচার করে। পবিত্র কুরআনের প্রতি তাদের ঈমান নিশ্চয়ই আছে এবং তারা এটাকে প্রাণ অপেক্ষাও বেশী ভালবাসে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, ঠিক তারাই এর ওপর সকলের অপেক্ষা বেশী যুলুম করছে। আর আল্লাহর কালামের প্রতি যুলুম করার ফল তো সকলেরই জানা আছে। খুব ভাল করে বুঝে নিন, আল্লাহর কালাম মানুষের কাছে এ জন্য আসেনি যে, এটা পেয়েও সে দুর্ভাগ্য ও দুঃখ-মুসিবতের মধ্যে পড়ে থাকবে। পবিত্র কুরআন তো সৌভাগ্য ও সার্থকতা লাভ করার একমাত্র উৎস ; এটা দুর্ভাগ্য ও হীনতা লাভের কোন কারণ হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা নিজেই বলে দিয়েছেন ঃ

طٰهٰ ۚ مَآ اَنۡزَلۡنَا عَلَيۡكَ الۡقُرۡاٰنَ لِتَشۡقٰٓى ۙ (طٰهٰ : ١-٢)

"ত্ব-হা- হে নবী ! তোমার প্রতি কুরআন এ জন্য নাযিল করিনি যে, এটা সত্ত্বেও তুমি হতভাগ্য হয়ে থাকবে।"-(সূরা ত্ব-হা ঃ ১-২)

এর দ্বারা মানুষের ভাগ্য খারাপ হওয়ার এবং সকলের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হওয়ার কোনই আশংকা নেই। কোন জাতির কাছে আল্লাহর কালাম বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তার লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হওয়া, পরের অধীন হওয়া, অপমানিত ও পদদলিত হওয়া, গোলামীর নাগপাশে বন্দী হওয়া, তার সমস্ত কর্তৃত্ব অপরের

হাতে ন্যস্ত হওয়া এবং পরের দ্বারা জন্তু-জানোয়ারের মত বিতাড়িত ও নির্যাতিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। এমন দুঃখপূর্ণ অবস্থা সেই জাতির ঠিক তখনই হতে পারে যখন তারা আল্লাহর কালামের ওপর যুলুম করতে শুরু করে। বনী ইসরাঈলের অবস্থা আপনাদের অজানা নয়। তাদের প্রতি তাওরাত ও ইনজীল নাযিল করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ط (المائدة : ٦٦)

"তাওরাত, ইনজীল এবং অন্যান্য যেসব কিতাব তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল, তারা যদি তা অনুসরণ করে চলতো, তবে তাদের প্রতি আকাশ হতে রিযিক বর্ষিত হতো এবং যমীন হতে খাদ্যদ্রব্য ফুটে বের হতো।"

কিন্তু তারা আল্লাহ তাআলার এসব কালামের প্রতি যুলুম করেছিল, আর তার ফলে ঃ

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ق وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○ (البقرة : ٦١)

"লাঞ্ছনা এবং পরমুখাপেক্ষিতা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহর গযবে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিল, এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহর বাণীকে অমান্য করতে শুরু করেছিল, আর পয়গাম্বরগণকে অকারণে হত্যা করেছিল। তাছাড়া আরও কারণ এই যে, তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল এবং তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা যে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, তা তারা অতিক্রম করে গিয়েছিল।"-(সূরা বাকারা ঃ ৬১)

অতএব, যে জাতি আল্লাহর কিতাব ধারণ করে থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ায় লাঞ্ছিত, পদদলিত এবং পরের অধীন ও পরের তুলনায় শক্তিহীন হয়, নিসন্দেহে মনে করবেন যে, তারা নিশ্চয়ই আল্লাহর কালামের ওপর যুলুম করছে। আর তাদের ওপর এই যে দুঃখ-বিপদের তুফান আসছে, তার মূল কারণই হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের প্রতি যুলুম। অতএব, আল্লাহর এ গযব হতে রেহাই পাওয়ার এছাড়া আর কোন উপায় থাকতে পারে না। তারা আল্লাহর কালামের প্রতি যুলুম করা ত্যাগ করবে এবং এর ষোলআনা 'হক' আদায় করতে চেষ্টা করবে। আপনারা যদি এই মহাপাপ হতে ফিরে না থাকেন, আপনাদের এ হীন

অবস্থার কিছুতেই পরিবর্তন হবে না। (তা আপনারা গ্রামে গ্রামে কলেজ-ই খুলুন, আপনাদের প্রত্যেকটি সন্তান গ্রাজুয়েট হোক, আর ইহুদীদের মত সুদী কারবার করে কোটিপতিই হোক না কেন, তার ফল প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয়)।

মুসলমান কাকে বলে এবং মুসলিম শব্দের অর্থ কি, একথা প্রত্যেক মুসলমানকে সর্বপ্রথমেই জেনে নিতে হবে। কারণ মনুষ্যত্ব কাকে বলে এবং মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য কি, তা যদি মানুষের জানা না থাকে, তবে সে জানোয়ারের মত কাজ করতে শুরু করবে—সে তার মনুষ্যত্বের মূল্য বুঝতে পারবে না। অনরূপভাবে যদি কেউ একথা জানতে না পারে যে, মুসলমান হওয়ার অর্থ কি এবং মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে কেমন করে পার্থক্য করা যায়, তবে সে তো অমুসলমানের মত কাজ-কর্ম করতে শুরু করবে এবং তার মুসলমানীর কোন সম্মানই সে রক্ষা করতে পারবে না। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানকে এবং মুসলমানের প্রত্যেকটি সন্তানকেই ভাল করে জেনে নিতে হবে যে, সে যে নিজেকে নিজে মুসলমান মনে করে এ মুসলমান হওয়ার অর্থ কি ? মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে কি পরিবর্তন ও পার্থক্য হয়ে যায় ? তার ওপর কি কর্তব্য ও দায়িত্ব এসে পড়ে ? ইসলামের কোন্ সীমার মধ্যে থাকলে মানুষ মুসলমান থাকতে পারে এবং কোন্ সীমা অতিক্রম করলেই বা সে মুসলমানী হতে খারিজ হয়ে যায় ? এসব কথা না জানলে মুখ দিয়ে সে মুসলমানীর যতই দাবী করুক না কেন, তার মুসলমান থাকা সম্ভব নয়।

ইসলাম অর্থ আল্লাহর আনুগত্য করা ও হুকুম পালন করে চলা। নিজেকে আল্লাহ্ তাআলার কাছে সোপর্দ করে দেয়ার নাম হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহর সম্মুখে নিজের আযাদী ও স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করার নাম ইসলাম। আল্লাহর বাদশাহী এবং আনুগত্যকে মাথানত করে স্বীকার করে নেয়ার নাম ইসলাম। যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত কাজ-কারবারকে আল্লাহর হাতে সঁপে দেয়, সেই ব্যক্তি মুসলমান। আর যে ব্যক্তি নিজের সব ব্যাপারে নিজের ইচ্ছামত সম্পন্ন করে কিংবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোও হাতে তা সোপর্দ করে সে মুসলমান নয়। আল্লাহর হাতে সঁপে দেয়ার তাৎপর্য এই যে, তিনি তাঁর কিতাব এবং তাঁর নবীর মারফত যে হেদায়াত ও সৎপথের বিধান পাঠিয়েছেন, মানুষ তাকে পুরোপুরি কবুল করবে এবং তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করতে পারবে না। জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে এবং কাজে শুধু পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নিয়ম অনুসরণ করে চলবে। যে ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি, দুনিয়ার প্রথা এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সকলকেই—সবকিছু পশ্চাতে ফেলে রেখে এবং প্রত্যেক ব্যাপারেই কেবল আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীসের কাছে পথের সন্ধান জানতে চায়—জিজ্ঞেস করে যে, আমার কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়, আর

সেখান হতে যে নিয়মই পাওয়া যাক না কেন বিনা আপত্তিতে তা মেনে নেয়, তার বিপরীত যা তা সবই সে অস্বীকার করে—শুধু সেই ব্যক্তি মুসলমান। কারণ সে তো নিজেকে আল্লাহর কাছে একেবারে সঁপে দিয়েছে। আর এভাবে আল্লাহর হাতে নিজেকে সঁপে দিলেই মানুষ মুসলমান হতে পারে। এর বিপরীত—যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ওপর মোটেই নির্ভর করে না, বরং নিজের মন যা বলে তাই করে, কিংবা বাপ-দাদা হতে চলে আসা নিয়ম-কানুনের অনুসরণ করে চলে, কিংবা দুনিয়ায় যা কিছু হচ্ছে সে-ও তাই করে, নিজের কোন ব্যাপারেই সে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কাছে জিজ্ঞেস করে না যে, তার কি করা উচিত, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিধান জেনে সে বলে ওঠে যে, আমার বুদ্ধি তা গ্রহণ করতে চায় না, তাই আমি তা মানি না, অথবা বাপ-দাদার কাল হতে তার উল্টা নিয়ম চলে আসছে কাজেই তার অনুসরণ করব না ; কিংবা দুনিয়ার নিয়ম তার বিপরীত, তাই আমি সেই নিয়ম অনুসারেই চলবো—তবে সেই ব্যক্তি কিছুতেই মুসলমান নয়। যদি সে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, তবে সে মিথ্যাবাদী সন্দেহ নেই।

আপনি যখন কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পড়েন এবং মুসলমান হওয়ার কথা স্বীকার করেন, তখন আপনি তার মধ্য দিয়ে একথাও স্বীকার করে থাকেন যে, আপনার আল্লাহর আইন আপনার জন্য একমাত্র আইন ; আল্লাহ তাআলাই আপনার প্রভু ও আদেশ কর্তা। তখন আপনার শুধু আল্লাহরই আনুগত্য করতে হবে। আপনার কাছে শুধু সেই বিধানই সত্য বিধানরূপে স্বীকৃতি পাবে যা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সাহায্যে পাওয়া যায়। এর অর্থ এই যে, আপনি মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর সামনে নিজের আযাদী বিসর্জন দিয়েছেন।

অতপর আপনার নিজের স্বতন্ত্র মত বলতে কিছুই থাকতে পারে না, দুনিয়ার বিভিন্ন প্রথা বা পারিবারিক নিয়ম-রীতিরও কোনই গুরুত্ব থাকতে পারে না অথবা অমুক হযরত এবং অমুক বুজর্গ সাহেব কি বলেছেন, আল্লাহর কালাম এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাতের মোকাবিলায় এ ধরনের কোন কথাই আপনি এখন পেশ করতে পারেন না। আপনার প্রত্যেকটি বিষয়ই পবিত্র কুরআন ও হাদীসের সামনে পেশ করাই এখন আপনার একমাত্র কাজ। যা তার অনুরূপ হবে না আপনি তা উঠিয়ে দূরে নিক্ষেপ করবেন—তা যারই প্রথা হোক না কেন। নিজেকে মুসলমান বলা এবং তারপর পবিত্র কুরআন ও হাদীসকে বাদ দিয়ে নিজের মত, দুনিয়ার প্রথা কিংবা মানুষের কোন কথা বা কাজের অনুসরণ করা সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিরোধী। কোন অন্ধ ব্যক্তি যেমন নিজেকে চোখওয়ালা বলতে পারে না, কোন নাকহীন ব্যক্তি যেমন নিজেকে

নাকওয়ালা বলতে পারে না, ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত কাজ-কর্ম পবিত্র কুরআন হাদীস অনুসারে সমাধা করে না, বরং তা পরিত্যাগ করে নিজের বুদ্ধি বা দুনিয়ার প্রথা অথবা কোন ব্যক্তি বিশেষের কথা বা কাজের অনুসরণ করে চলে—সে কিছুতেই নিজেকে মুসলমান বলতে পারে না।

কেউ যদি নিজে মুসলমান থাকতে না চায়, তবে তার মুসলমান থাকার জন্য তার ওপর জোর-জবরদস্তি করতে পারে না। যে কোন ধর্ম গ্রহণ করা এবং যে কোন নামধারণ করার স্বাধীনতা প্রত্যেকটি মানুষেরই রয়েছে। কিন্তু কোন মানুষ যখন নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, তখন তার একথা খুব ভাল করেই বুঝে নেয়া উচিত যে, সে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান থাকতে পারে, যতক্ষণ সে ইসলামের সীমার মধ্যে থাকবে। আল্লাহর কালাম এবং তাঁর রাসূলের হাদীসকে সত্য ও মঙ্গলের একমাত্র মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করা এবং এর বিরোধী প্রত্যেকটি জিনিসকে বাতিল ও মিথ্যা মনে করাই হচ্ছে ইসলামের সীমা। এ সীমার মধ্যে যে থাকবে সে মুসলমান ; এটা যে লংঘন করবে সে ইসলাম হতে বিচ্যুত-বহির্ভূত হয়ে পড়বে। তারপরও সে যদি নিজেকে মুসলমান মনে করে এবং মুসলমান বলে দাবী করে, তবে সে নিজেকেও ধোঁকা দিচ্ছে, আর দুনিয়াকেও ধোঁকা দিচ্ছে সন্দেহ নেই।

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○ (المائدة : ٤٤)

"যে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না সে কাফের।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৪)

কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ

আপনারা জানেন, মানুষ একটি কালেমা পাঠ করে ইসলামের সীমার মধ্যে প্রবেশ করে থাকে। সেই কালেমাটি খুব লম্বা-চওড়া কিছু নয় কয়েকটি শব্দ মাত্র। لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এই কয়টি শব্দ মুখে উচ্চারণ করলেই মানুষ একেবারে বদলে যায়। একজন কাফের যদি এটা পড়ে, তবে সে মুসলমান হয়ে যায়। ফলে পূর্বে সে নাপাক ছিল, এখন সে পাক হয়ে গেল। পূর্বে তার ওপর আল্লাহর গযব আসতে পারতো ; কিন্তু এখন সে আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ হয়ে গেল। প্রথমে সে জাহান্নামে যাবার যোগ্য ছিল, এখন জান্নাতের দুয়ার তার জন্য খুলে গেল। শুধু এটুকুই নয়, এই 'কালেমার'র দুরুন মানুষে মানুষেও বড় পার্থক্য হয়ে পড়ে। এ 'কালেমা' যারা পড়ে তারা এক উম্মাত আর যারা এটা অস্বীকার করে তারা হয় আলাদা এক জাতি। পিতা যদি 'কালেমা' পড়ে আর পুত্র যদি তা অস্বীকার করে তবে পিতা আর পিতা থাকবে না, পুত্র আর পুত্র বলে গণ্য হবে না, পিতার সম্পত্তি হতে সেই পুত্র কোন অংশই পাবে না, তার নিজের মা ও বোন পর্যন্ত তাকে দেখা দিতে ঘৃণা করবে। পক্ষান্তরে একজন বিধর্মী যদি কালেমা পড়ে, আর ঐ ঘরের মেয়ে বিয়ে করে, তবে সে এবং তার সন্তান ঐ ঘর হতে মীরাস পাবে। কিন্তু নিজ ঔরসজাত সন্তান শুধু এই 'কালেমা'কে অস্বীকার করার কারণেই একেবারে পর হয়ে যাবে। এটা দ্বারা বুঝতে পারা যায় যে, এই 'কালেমা' এমন জিনিস যা পর লোককে আপন করে একত্রে মিলিয়ে দেয়। আর আপন লোককে পর করে পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন করে।

একটু ভেবে দেখুন মানুষে মানুষে এতবড় পার্থক্য হওয়ার প্রকৃত কারণ কি ? 'কালেমা'তে কয়েকটা অক্ষর ছাড়া আর কি-ই বা রয়েছে ? কাফ, লাম, মীম, আলিফ, সীন আর এ রকমেরই কয়েকটা অক্ষর ছাড়া আর তো কিছুই নয়। এ অক্ষরগুলো যুক্ত করে মুখে উচ্চারণ করলেই কোন্ যাদুর স্পর্শে মানুষ এতখানি বদলে যায় ! শুধু এতটুকু কথা দ্বারা কি মানুষের পরস্পরের মধ্যে এত আকাশ-পাতাল পার্থক্য হতে পারে ? ...... একটু চিন্তা করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন—আপনাদের বিবেক-বুদ্ধি বলে ওঠবে যে, কয়েকটা অক্ষর মিলিয়ে মুখে উচ্চারণ করলেই এতবড় ক্রিয়া কিছুতেই হতে পারে না। মূর্তিপূজক মুশরিকগণ অবশ্য মনে করে যে, একটা মন্ত্র পড়লেই পাহাড় টলে যাবে। যমীন ফেটে যাবে এবং তা হতে পানি উথলে ওঠবে ! —মন্ত্রের কোন অর্থ কেউ অবগত হোক বা না-ই হোক, তাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। কারণ

অক্ষরের মধ্যেই যাবতীয় শক্তি নিহিত আছে বলে তারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। কাজেই তা মুখে উচ্চারিত হলেই সকল রহস্যের দুয়ার খুলে যাবে। কিন্তু ইসলামে এরূপ ধারণার কোনই মূল্য নেই। এখানে আসল জিনিস হচ্ছে অর্থ ; শব্দের মধ্যে যা কিছু ক্রিয়া বা তা'ছীর আছে, তা অর্থের দরুনই হয়ে থাকে। শব্দের কোন অর্থ না হলে, তা মনের মূলের সাথে গেঁথে না গেলে এবং তার ফলে মানুষের চিন্তাধারা, বিশ্বাস, চরিত্র ও তার কাজ-কর্মে পরিবর্তন না ঘটলে, শুধু শব্দের উচ্চারণ করলেই কোন লাভ নেই।

একথাটি সহজ উদাহরণ দ্বারা আপনাদেরকে বুঝাতে চাই। মনে করুন, আপনার ভয়ানক শীত লাগছে। এখন আপনি যদি মুখে 'লেপ-তোষক' 'লেপ-তোষক' করে চিৎকার করতে শুরু করেন, তবে শীত লাগা কিছুমাত্র কমবে না। সারা রাত বসে 'লেপ-তোষক' বলে হাজার তাসবীহ্ পড়লেও কোন ফল ফলবে না। অবশ্য আপনি লেপ-তোষক যোগাড় করে যদি গায়ে দিতে পারেন তবে শীত লাগা নিশ্চয় বন্ধ হয়ে যাবে। এরূপে মনে করুন, আপনার তৃষ্ণা লেগেছে। এখন যদি আপনি সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত 'পানি' 'পানি' করে চিৎকার করতে থাকেন, তবে তাতে পিপাসা মিটবে না। কিন্তু এক গ্লাস পানি নিয়ে যদি পান করেন, তবে আপনার কলিজা অবশ্যই ঠাণ্ডা হবে। মনে করুন, আপনার অসুখ হয়েছে ; এখন যদি আপনি 'ওষুধ' 'ওষুধ' করে তাসবীহ্ পাঠ শুরু করেন, আপনার রোগ তাতে দূর হবে না। হাঁ যদি ঠিক ওষুধ খরিদ করে তা সেবন করেন, তবে আপনার রোগ সেরে যাবে। কালেমার অবস্থাও ঠিক এটাই। শুধু ছয়-সাতটি শব্দ মুখে বলে দিলেই এত বড় পার্থক্য হতে পারে না, যে মানুষ কাফের ছিল সে এর দরুন একেবারে মুসলমান হয়ে যাবে, নাপাক হতে পাক হবে, দুশমন লোক একেবারে বন্ধু হয়ে যাবে, জাহান্নামী ব্যক্তি একেবারে জান্নাতী হয়ে যাবে। মানুষে মানুষে এরূপ পার্থক্য হয়ে যাওয়ার একটি মাত্র উপায় আছে। তা এই যে, প্রথমে এই শব্দগুলোর অর্থ বুঝে নিতে হবে, সেই অর্থ যাতে মানুষের মনের মূলে শিকড় গাড়তে পারে, সেই জন্য চেষ্টা করতে হবে। এভাবে অর্থ জেনে ও বুঝে যখন এটা মুখে উচ্চারণ করবেন, তখনই আপনারা বুঝতে পারবেন যে, এই 'কালেমা' পড়ে আপনারা আপনাদের আল্লাহর সামনে কত বড় কথা স্বীকার করেছেন, আর এর দরুন আপনাদের ওপর কত বড় দায়িত্ব এসে পড়েছে। এসব কথা বুঝে শুনে যখন আপনারা 'কালেমা' পড়বেন, তখন আপনাদের চিন্তা এবং আপনার সমস্ত জীবনের ওপর এ 'কালেমা'র পূর্ণ আধিপত্য স্থাপিত হবে। এরপর এ 'কালেমা'র বিরোধী কোন কথা আপনাদের মন ও মগজে একটুও স্থান পেতে পারে না। চিরকালের তরে আপনাদের একথাই মনে করতে হবে যে, এই

'কালেমা'র বিপরীত যা তা মিথ্যা—এ 'কালেমা'ই একমাত্র সত্য। আপনাদের জীবনের সমস্ত কাজ-কারবারে এ 'কালেমা'ই হবে একমাত্র হুকুমদাতা। এ 'কালেমা' পড়ার পরে কাফেরদের মত স্বাধীনভাবে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন না। এখন এ 'কালেমা'রই হুকুম পালন করে চলতে হবে, এটা যে কাজ করতে বলবে তাই করতে হবে এবং যে কাজের নিষেধ করবে তা হতে ফিরে থাকতে হবে। এভাবে 'কালেমা' পড়লেই মানুষে মানুষে পূর্বোল্লিখতরূপে পার্থক্য হতে পারে।

এখন 'কালেমা'র অর্থ কি, তা পড়ে মানুষ কি কথা স্বীকার করে, আর তা স্বীকার করলেই মানুষ কোন্ বিধান মত চলতে বাধ্য হয় প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করবো।

কালেমার অর্থ ঃ 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, হযরত মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ তাআলার রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ।" কালেমার মধ্যে যে 'ইলাহ' শব্দটি রয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে মালিক, সৃষ্টিকর্তা, মানুষের জন্য বিধান রচনাকারী, মানুষের দোয়া যিনি শোনেন এবং গ্রহণ করেন—তিনিই উপাসনা পাবার একমাত্র উপযুক্ত। এখন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়লে তার অর্থ এই হবে যে, আপনি প্রথম স্বীকার করলেন ঃ এ দুনিয়া আল্লাহ ছাড়া সৃষ্টি হতে পারেনি, এর সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই বর্তমান আছেন, আর সেই সৃষ্টিকর্তা বহু নয়—মাত্র একজন। তিনি ছাড়া আর কারোও খোদায়ী বা প্রভুত্ব কোথাও নেই ; দ্বিতীয়ত 'কালেমা' পড়ে আপনি স্বীকার করলেন যে, সেই এক আল্লাহ-ই মানুষের ও সারে জাহানের মালিক। আপনি ও আপনার প্রত্যেকটি জিনিস এবং দুনিয়ার প্রত্যেকটি বস্তুই তাঁর। সৃষ্টিকর্তা তিনি, রেযেকদাতা তিনি, জীবন ও মৃত্যু তাঁরই হুকুম মত হয়ে থাকে। সুখ ও বিপদ তাঁরই তরফ হতে আসে। মানুষ যা কিছু পায়, তাঁরই কাছ হতে পায়—সকল কিছুর দাতা প্রকৃতপক্ষে তিনি। আর মানুষ যা হারায়, তা প্রকৃতপক্ষে তিনিই কেড়ে নেন। শুধু তাঁকেই ভয় করা উচিত, শুধু তাঁরই কাছে প্রার্থনা করা উচিত, তাঁরই সামনে মাথা নত করা উচিত। কেবলমাত্র তারই ইবাদাত ও বন্দেগী করা কর্তব্য। তিনি ছাড়া আমাদের মনিব, মালিক ও আইন রচনাকারী আর কেউই নেই। একমাত্র তাঁরই হুকুম মেনে চলা এবং কেবল তাঁরই আইন অনুসারে কাজ করা আমাদের আসল ও একমাত্র কর্তব্য।

'কালেমা' لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ পড়ে আপনি আল্লাহর কাছে এই ওয়াদা-ই করে থাকেন, আর সারা দুনিয়া এ মৌলিক অঙ্গীকারের সাক্ষী হয়ে থাকে। এর বিপরীত কাজ করলে আপনার জিহ্বা, আপনার হাত-পা, আপনার প্রতিটি

পশম এবং আকাশ ও পৃথিবীর এক একটি অণু-পরমাণু যাদের সামনে আপনি এ ওয়াদা করেছিলেন আপনার বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে সাক্ষ্য দেবে। আপনি সেখানে একেবারে অসহায় হয়ে পড়বেন। আপনার সাফাই প্রমাণ করার জন্য একটি সাক্ষী কোথাও পাবেন না। কোন উকিল কিংবা ব্যারিষ্টার আপনার পক্ষ সমর্থন করার জন্য সেখানে থাকবে না। বরং স্বয়ং উকিল সাহেব কিংবা ব্যারিষ্টার সাহেব দুনিয়ার আদালতে যারা আইনের মারপ্যাঁচ খেলে থাকে, তারা সকলেই সেখানে আপনারই মত নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়ে যাবে। সেই আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে, জাল দলীল দেখিয়ে এবং উকিলের দ্বারা মিথ্যা ওকালতী করিয়ে আপনারা রক্ষা পেতে পারবেন না। দুনিয়ার পুলিশের চোখ হতে আপনারা নিজেদের অপরাধ লুকাতে পারেন, কিন্তু আল্লাহর পুলিশের চোখ হতে তা গোপন করা সম্ভব নয়। দুনিয়ার পুলিশ ঘুষ খেতে পারে, আল্লাহর পুলিশ কখনও ঘুষ খায় না। দুনিয়ার সাক্ষী মিথ্যা বলতে পারে, আল্লাহর সাক্ষী সকলেই সত্যবাদী—তারা মিথ্যা বলে না। দুনিয়ার বিচারকেরা অবিচার করতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা অবিচারক নন। তারপর আল্লাহ যে জেলখানায় পাপীদেরকে বন্দী করবেন, সেখান হতে পলায়ন করা কোন মতেই সম্ভব নয়। কাজেই আল্লাহর সাথে মিথ্যা ওয়াদা করা বড় আহাম্মকি এবং সবচেয়ে বেওকুফী সন্দেহ নেই। যখন আল্লাহর সামনে ওয়াদা করছেন, তখন খুব ভাল করে বুঝে শুনে করুন এবং তা পালন করার চেষ্টা করুন, নতুবা শুধু মুখে ওয়াদা করতে আপনাকে কেউ জবরদস্তি করছে না। কারণ মুখে শুধু স্বীকার করার কোন মূল্যই নেই।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলার পর বলতে হয় 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। এর অর্থ এই যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর মধ্যস্থতায়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর আইন মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন—একথা আপনারা স্বীকার করছেন। আল্লাহকে নিজেদের মনিব, মালিক ও বাদশাহ স্বীকার করার পর একথা অবগত হওয়ার একান্ত দরকার ছিল যে, সেই বাদশাহে দো-আলমের আইন ও হুকুম কি ? আমরা কোন্ কাজ করলে তিনি খুশী হবেন, আর কোন কাজ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন ? কোন আইন অনুসরণ করলে তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন, আর কোন্ আইনের বিরোধিতা করলে তিনি আমাদেরকে শাস্তি দেবেন ? এসব জানার জন্য আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে তাঁর দূত নির্দিষ্ট করেছেন। তাঁর মধ্যস্থতায় তিনি আমাদের প্রতি তাঁর কিতাব পাঠিয়েছেন এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর হুকুম মত কিরূপে জীবনযাপন করতে হয়, তা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখিয়ে গিয়েছেন।

কাজেই আপনারা যখন বলেন, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' তখন এর দ্বারা আপনারা একথাই স্বীকার করে থাকেন যে, যে আইন এবং যে নিয়ম হযরত মুহাম্মাদ (সা) বলেছেন, আপনারা তা অনুসরণ করে চলবেন। আর যে আইন এর বিপরীত হবে তাকে পদদলিত করবেন। এ ওয়াদা করার পর যদি আপনারা হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রচার আইনকেই ছেড়ে দেন, আর দুনিয়ার আইন অনুসরণ করে চলেন তবে আপনাদের চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী ও বেঈমান আর কেউ নেই। কারণ হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রচারিত আইনকে একমাত্র সত্য আইন মেনে এবং তার অনুসরণ করে চলার অঙ্গীকার করেই আপনারা ইসলামের সীমার মধ্যে এসেছেন। একথা স্বীকার করেই আপনারা মুসলমানদের ভাই হয়েছেন, এরই দুরুন আপনারা মুসলমান পিতার উত্তরাধিকারী হতে পেরেছেন। এরই দৌলতে আপনারা মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করেছেন। এরই কারণে আপনাদের সন্তান ন্যায়ত সন্তান হতে পেরেছে। এরই দরুন মুসলমানগণ আপনাদেরকে সাহায্য করেছে, আপনাদেরকে যাকাত দিয়েছে, আপনাদের জান-মাল ও মান-সম্মানের হেফাযত করার দায়িত্ব নিয়েছে। এতসব হওয়া সত্ত্বেও যদি আপনারা নিজেদের ওয়াদা ভঙ্গ করেন, তবে এটা অপেক্ষা বড় বেঈমানী দুনিয়ায় আর কি হতে পারে ? আপনরা যদি لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ-এর অর্থ জানেন এবং জেনে-বুঝেই এটা স্বীকার করেন, তাহলে সকল অবস্থাতেই আল্লাহর আইন মেনে চলা আপনাদের কর্তব্য। আল্লাহর আইন জারি হয়ে না থাকলেও আপনাদের এটা জারি করা উচিত। যে ব্যক্তি মনে করে যে, আল্লাহর পুলিশ, সৈন্য, আদালত এবং জেলখানা কোথাও মওজুদ নেই, কাজেই তাঁর আইন লংঘন করা সহজ, আর গর্ভমেন্টের পুলিশ, ফৌজ, আদালত এবং জেলখানা চারদিকে বর্তমান আছে, কাজেই তার আইন ভঙ্গ করা বড়ই মুশকিল—তবে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমি পরিষ্কার ভাষায়ই বলে দিচ্ছি যে لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه কালেমা সে মিথ্যাই পড়েছে। সে এটা দ্বারা তার আল্লাহকে, সারে জাহানকে, সমস্ত মুসলমানকে এবং স্বয়ং নিজের মনকে ধোঁকা দিচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইতিপূর্বে কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ আমি বলেছি। এখন সেই বিষয়ে অন্য আর একদিক দিয়ে ভেবে দেখতে বলছি।

আল্লাহ তাআলা আপনাদের এবং প্রত্যেক জিনিসেরই মালিক একথা আপনারা স্বীকার করছেন। কিন্তু এর অর্থ কি ? এর অর্থ এই যে, আপনাদের জান-মাল আপনাদের নিজের দেহ আল্লাহর। আপনাদের হাত, কান এবং

আপনাদের দেহের কোন একটা অঙ্গও আপনাদের নিজের নয়। যে জমি আপনারা চাষাবাদ করেন, যেসব পশু দ্বারা আপনারা কাজ করান, যেসব জিনিস-পত্র আপনারা সবসময় ব্যবহার করছেন, এদের কোনটাই আপনাদের নিজের নয়। সবকিছুই আল্লাহ তাআলার মালিকানা এবং আল্লাহর দান হিসেবেই এগুলো আপনারা পেয়েছেন। একথা স্বীকার করার পর আপনাদের একথা বলার কি অধিকার থাকতে পারে যে, জান-প্রাণ আমার, শরীর আমার, মাল আমার, অমুক জিনিস আমার, আর অমুক জিনিসটি আমার। অন্য একজনকে কোন জিনিসের মালিক বলে ঘোষণা করার পর তার জিনিসকে আবার নিজের বলে দাবী করা সম্পূর্ণ অর্থহীন। যদি বাস্তবিকই আল্লাহকে দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের মালিক মনে করেন, তবে তা হতে আপনা আপনি দু'টি জিনিস আপনাদের ওপর এসে পড়ে। প্রথম এই যে, আল্লাহ-ই যখন মালিক আর তিনি তাঁর মালিকানার জিনিস আমানত স্বরূপ আপনাদেরকে দিয়েছেন, তখন সেই মালিকের হুকুম মতই আপনাদের সেই জিনিসগুলো ব্যবহার করতে হবে। তাঁর মর্জির উলটা কাজ যদি এর দ্বারা করেন, তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা আমানতের খেয়ানত করছেন। আপনাদের হাত-পা পর্যন্ত সেই মালিকের মর্জির বিপরীত কাজে ব্যবহার করার কোন অধিকার আপনাদের নেই। আপনাদের চোখ দ্বারাও তার নিষিদ্ধ জিনিস দেখতে পারেন না, যা তাঁর মর্জির বিপরীত। আপনাদের এই জমি-জায়গাকে মালিকের বিধানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার আপনাদের কোনই অধিকার নেই। আপনাদের যে স্ত্রী এবং সন্তানকে নিজেদের বলে দাবী করেন, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে দান করেছেন বলেই তারা আপনাদের আপন হয়েছে, কাজেই তাদের সাথে আপনাদের ইচ্ছামত নয়—মালিকেরই হুকুম মত ব্যবহার করা কর্তব্য। তার মতের উলটা যদি ব্যবহার করেন, তবে আপনারা ডাকাত নামে অভিহিত হবার যোগ্য। পরের জিনিস হরণ করলে পরের জায়গা শক্তির বলে দখল করলে আপনারা তাকে বলেন, বেঈমান ; সেরূপ আল্লাহর দেয়া জিনিসকে নিজের মনে করে নিজের ইচ্ছা কিংবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোও মর্জিমত যদি ব্যবহার করেন, তবে সেই বেঈমানীর অপরাধে আপনারাও অপরাধী হবেন। মালিকের মর্জি অনুসারে কাজ করলে যদিও আপনাদের কোন ক্ষতি হয় হোক, জান চলে যায় যাক, হাত-পা ভেংগে যায় যাক, সন্তানের লোকসান হয় হোক, মাল ও জমি-জায়গা বরবাদ হয়ে যায় যাক, আপনারা সেই জন্য কোন পরোয়া করবেন না। জিনিসের মালিকই যদি এর ক্ষয় বা ক্ষতি পসন্দ করেন, তবে তা করার তাঁর অধিকার আছে। তবে হাঁ, মালিকের মর্জির খেলাফ যদি আপনারা করেন, আর তাতে যদি কোন জিনিসের ক্ষতি হয়ে পড়ে, তবে সে জন্য আপনারাই অপরাধী হবেন, সন্দেহ নেই। কারণ পরের জিনিস আপনারা নষ্ট করেছেন।

আপনারা আপনাদের জানকে পর্যন্ত নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারেন না। মালিকের মর্জি অনুসারে জান কুরবান করলে মালিকেরই হক আদায় হবে, তাঁর মতের উলটা কাজে প্রাণ দিলে মস্তবড় বেঈমানী করা হবে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, মালিক যে জিনিসই আপনাকে দান করেছেন, তা যদি সেই মালিকের কাজেই ব্যবহার করেন, তবে তার দ্বারা কারোও প্রতি কোন অনুগ্রহ হতে পারে না—মালিকের প্রতিও নয়। এ পথে যদি আপনারা কিছু দান করলেন, কোন খেদমত করলেন, কিংবা আপনাদের প্রিয়বস্তু— প্রাণকে কুরবান করলেন, তবে তা কারোও প্রতি আপনাদের একবিন্দু অনুগ্রহ নয়। আপনাদের প্রতি মালিকের যে 'হক' ছিল এর দ্বারা শুধু তাই আদায় করলেন মাত্র। এতে গৌরব বা অহংকার করার মত কিংবা তারীফ বা প্রশংসা পাবার মত কিছু নেই। মনে রাখবেন, মুসলমান ব্যক্তি মালিকের পথে কিছু খরচ করে কিংবা তার কিছু কাজ করে কিছুমাত্র গৌরব বোধ করে না, বরং সে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে : গৌরব বা অহংকার ভাল কাজকে বরবাদ করে দেয়। যে ব্যক্তি প্রশংসা পাবার আশা করে এবং শুধু সে উদ্দেশ্যেই ভাল কাজ করে কারণ সে তার কাজের প্রতিফল এ দুনিয়াতেই পেতে চাচ্ছে, আর তাই সে পেয়েছে। নিখিল দুনিয়ার মালিক আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ দেখুন, তিনি তাঁর নিজের জিনিস আমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন, আর বলেন যে, এ জিনিস তোমাদের কাছ থেকে আমি ক্রয় করলাম এবং তার মূল্যও তোমাদেরকে দেব। আল্লাহু আকবার। আল্লাহর দান ও অনুগ্রহের কি কোন সীমা-পরিসীমা আছে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط

"আল্লাহ তাআলা ঈমানদার ব্যক্তিদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করেছেন এবং তার বিনিময়ে তাদের জন্য জান্নাত নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ১১১)

আপনাদের সাথে মালিকের এরূপ ব্যবহার ! কিন্তু আপনি তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করছেন, তা একবার বিচার করে দেখুন। মালিক যে বস্তু আপনাদেরকে দিয়েছেন, তারপর সেই মালিক সে জিনিস মূল্য দিয়ে আপনাদের কাছ থেকে ক্রয় করেছেন, সে জিনিসকে আপনারা অন্যের কাছে বিক্রি করছেন, আর খুবই সামান্য ও নিকৃষ্ট মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করছেন। যার কাছে বিক্রি করছেন সে মালিকের মর্জির উলটা কাজে আপনাদের সেসব জিনিসকে ব্যবহার করে, আর আপনারা তাদেরকে আপনাদের রেযেকদাতা মনে করেই তাদের কাজ করে থাকেন। মূলত আপনাদের দেহের শক্তিগুলো এমনভাবে বিক্রি

করার কোন অধিকার আপনাদের নেই। আল্লাহদ্রোহী শক্তি যা কিছু কিনতে চায়, আপনারা তাই তাদের কাছে বিক্রি করেন, তা অপেক্ষা বড় দুর্নীতি আর কি হতে পারে ? একবার বিক্রি করা জিনিসকে পুনরায় অন্যের কাছে বিক্রি করা আইনত এবং নীতিগতভাবে অপরাধ। দুনিয়ায় এজন্য আপনার বিরুদ্ধে প্রবঞ্চনার মামলা চলতে পারে। আপনারা কি মনে করেন আল্লাহর আদালতে এ বিষয়ে মামলা চলবে না ?

পাক কালেমা ও নাপাক কালেমা

কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ ইতিপূর্বে বলেছি ; এখানে সেই সম্পর্কেই আর একটু ব্যাখ্যা করে আপনাদেরকে বুঝাতে চাই। কারণ এ কালেমাই ইসলামের মূল ভিত্তি, এরই সাহায্যে মানুষ ইসলামে দাখিল হয়, আর এ কালেমাকেই ভাল করে না বুঝে এবং সে অনুসারে নিজের জীবনকে গঠন না করে কোন মানুষ মুসলমান থাকতে পারে না। আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে এ কালেমার পরিচয় এভাবে দিয়েছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَاۤءِ ۝ تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ط وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ نِ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ قف وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَايَشَاۤءُ ۝ (ابرهيم : ٤٤)

"কালেমায়ে তাইয়্যেবার উদাহরণ যেমন কোন ভাল জাতের গাছ, এর শিকড় মাটির নীচে মজবুত হয়ে গেঁথে রয়েছে। এর শাখা-প্রশাখাগুলো আকাশের শূন্যলোকে বিস্তৃত—আল্লাহর হুকুমে তা অনবরত ফলের পর ফলদান করছে। আল্লাহ এরূপ দৃষ্টান্ত মানুষের উপদেশ গ্রহণের জন্য দিয়েছেন। এর বিপরীত হচ্ছে কালেমায়ে খাবিসাহ অর্থাৎ খারাপ আকিদা ও মিথ্যা কথা। এর উদাহরণ যেমন বন-জঙ্গলের ছোট ছোট আগাছা-পরগাছা। মাটির একেবারে উপরিভাগে তা জন্মে, সামান্য এক টানেই তা উৎপাটিত হয়ে যায় ; কারণ এর শিকড় মাটিতে খুব মজবুত হয়ে গাঁথতে পারে না। আল্লাহ সেই পাকা কথার দরুন মু'মিনদেরকে ইহকালে ও পরকালে সুদৃঢ় রাখেন এবং যালেমদেরকে বিভ্রান্ত করে থাকেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।"–(সূরা ইবরাহীম ঃ ২৪-২৭)

আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা এমন একটা অতুলনীয় উদাহরণ দিয়েছেন যে, আপনারা একটু চিন্তা করলেই এটা হতে খুব বড় শিক্ষা পেতে পারেন। দেখুন একটি আম গাছের শিকড় মাটির কত নীচে গেঁথে রয়েছে, ওপরের দিকে

কতখানি উচ্চ হয়ে ওঠেছে, তার কত ডাল-পালা চারদিকে বিস্তৃত হয়েছে, আর তাতে প্রতি বছর কত ভাল ভাল ফল ফলছে। কিন্তু এটা কেমন করে হলো ? এর বীজ খুব শক্তিশালী ছিল বলেই এত বড় একটা গাছ হবার তার পূর্ণ হক ছিল। আর সেই 'হক' এত সত্য ছিল যে, যখন এটা নিজের 'হক'-এর দাবী করলো, তখন মাটি, পানি, বায়ু, দিনের গরম, রাতের ঠাণ্ডা সব জিনিসই তার দাবী মেনে নিয়েছে। আমের সেই বীচি যার কাছে যা চেয়েছে তারা প্রত্যেকেই তাকে তা দিয়েছে। এভাবে সে নিজের অধিকারের জোরে এত বড় একটা গাছ হয়ে ওঠতে পেরেছে। পরে সে মিষ্টি মিষ্টি ফল দিয়ে একথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, বাস্তবিকই এমন একটা গাছ হওয়ার তার অধিকার ছিল। আকাশ ও পৃথিবীর সকল শক্তি একত্র হয়েও যদি তার সাহায্য করে থাকে, তবে তা কিছুমাত্র অন্যায় করেনি, বরং এদের এরূপ করাই উচিত ছিল। কারণ জমি, পানি, বায়ু এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক জিনিসের মধ্যে গাছ-পালার খোরাক যোগাবার ও এদের বড় করে তোলার শক্তি এজন্য নিহিত আছে যে, তা দ্বারা ভাল জাতের গাছগুলোর অনেক উপকার হবে।

এছাড়া বন-জঙ্গলে ছোট ছোট এমন কত গাছ আছে—যা নিজে নিজেই হয়েছে। এদের মধ্যে কি শক্তি আছে ? ছোট একটু শিকড় একটা ছোট ছেলে তা টেনে উপড়ে ফেলতে পারে। কিংবা তা এতই নরম ও দুর্বল যে, একটু দমকা হাওয়া লাগলেই তা নত হয়ে পড়ে। তা কাঁটায় ভরা, স্পর্শ করলেই কাঁটা বিদ্ধ হয়। তা মুখে দিলে মুখ নষ্ট করে দেয়। রোজ রোজ কত জন্ম হয়, কত যে উপড়িয়ে ফেলা হয়, তার হিসেব আল্লাহই জানেন। এগুলোর এরূপ অবস্থা কেন ? কারণ এগুলোর মধ্যে আম গাছের মত অতখানি জোর নেই। জমিতে যখন ভাল জাতের গাছ হয় না, তখন জমি বেকার পড়ে থেকে একেবারে হতাশ হয়ে যায়। কাজেই সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এসব আগাছা পরগাছাকে তার বুকে স্থান দেয়। পানি কিছু সাহায্য করে, বায়ু তার কিছু শক্তি দান করে ; কিন্তু আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিসই এসব পরগাছার কোন স্বত্ব স্বীকার করতে চায় না। এজন্য জমি তার বুকের মধ্যে এদের শিকড় বিস্তৃত হতে দেয় না, পানি ওর খুব বেশী সাহায্য করে না। আর বায়ুও ওকে প্রাণ খুলে বাতাস দান করে না। এভাবে টানাটানির পর যখন ওটা একটু মাথা জাগায়, তখন তা এত তিক্ত ও বিষাক্ত হয়ে ওঠে যাতে প্রমাণ হয়ে যায় যে, আকাশ ও পৃথিবীর শক্তিসমূহ মূলত এ আগাছা জন্মাবার জন্য নয়। আগাছাগুলো প্রকৃতির বুক হতে সামান্য কিছু শক্তি যে পেয়েছে এদের পক্ষে এটাই মস্ত ভাগ্যের কথা।

এ দু'টি উদাহরণ সামনে রাখুন, তারপর কালেমায়ে তাইয়্যেবা ও কালেমায়ে খাবীসার পার্থক্য সম্পর্কে ভাল করে চিন্তা করুন।

কালেমায়ে তাইয়্যেবা কী ? .... একটা সত্য কথা ; এমন সত্য কথা যে, এ দুনিয়ায় তা অপেক্ষা অধিক সত্য কথা আর একটিও নেই। এক আল্লাহই সারেজাহানের ইলাহ, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসই একথার সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। মানুষ, জানোয়ার, গাছ, পাথর, বালুকণা, প্রবহমান ঝর্ণা, উজ্জ্বল সূর্য চারদিকে বিস্তৃত এই সমস্ত জিনিস—এর কোন্‌টাকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেননি ? আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন ? তাঁর দয়া ও মেহেরবানী ছাড়া অন্য কারোও অনুগ্রহে কি এগুলো বেঁচে আছে ? এদের মধ্যে কোন একটিকেও কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জীবন বা মৃত্যু দান করতে পারে ? এই সারেজাহান যখন আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি তাঁরই দয়ায় যখন এসবকিছু বর্তমান আছে এবং তিনিই যখন এসবের একমাত্র মালিক ও হুকুমদাতা, তখন যে সময়েই আপনি বলবেন এ পৃথিবীতে সে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোও প্রভুত্ব বা খোদায়ী নেই, তৎক্ষণাৎই আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটা জিনিসই বলে ওঠবে ঃ তুমি সত্য কথাই বলেছো, আমরা সকলেই তোমার কথার সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছি। সেই আল্লাহর সামনে যখন আপনি মাথা নত করবেন, বিশ্বভুবনের প্রত্যেকটি জিনিসই আপনার সাথে তারই সামনে ঝুঁকে পড়বে। কারণ, ... এই সমস্ত জিনিসও একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করে। আপনি যখন তাঁরই হুকুম পালন করে চলবেন, তখন আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসই আপনার সাথী হবে, কারণ এসবই যে একমাত্র তাঁরই অনুগত। আপনি যখন তাঁর পথে চলতে শুরু করবেন, তখন আপনি একাকী হবেন না, এ নিখিল জাহানের অগণিত 'সৈন্য' আপনার সাথে চলতে আরম্ভ করবে। কারণ, আকাশের সূর্য হতে শুরু করে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম বস্তুকণা পর্যন্ত সর্বদা তাঁরই নির্ধারিত পথে চলছে। আপনি যখন সেই এক আল্লাহর ওপর নির্ভর করবেন, তখন সামান্য শক্তির ওপর নির্ভর করা হবে না—আপনার ভরসা করা হবে এমন এক বিরাট শক্তির ওপর, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত শক্তি ও ধন-সম্পদের একমাত্র মালিক। মোটকথা, এই নিগূঢ় তত্ত্ব যদিও আপনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে চলেন, তবে আপনি ভাল করেই জানতে পারবেন যে, কালেমায়ে তাইয়্যেবার প্রতি ঈমান এনে যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে সেই আদর্শ অনুসারে গঠন করে নেবে, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় শক্তিই তার সাহায্য কাজে নিযুক্ত হবে। দুনিয়ার জীবন হতে পরকাল পর্যন্ত সে কেবল উন্নতিই করতে থাকবে। তার কোন চেষ্টাই ব্যর্থ হবে না, কোন উদ্দেশ্যই অপূর্ণ থাকতে পারবে না। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা একথাই বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ 'এই কালেমা এমন একটা গাছ, যার শিকড় গভীর মাটির তলে মজবুত হয়ে গেঁথে রয়েছে এবং শাখা প্রশাখা আকাশের মহাশূন্যে বিস্তৃত হয়ে আছে। আর সবসময়ই তারা আল্লাহর হুকুমে ফলদান করে থাকে।'

'কালেমায়ে খাবীসাহ' এর সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ উপস্থিত করে। কালেমায়ে খাবীসাহ অর্থ ঃ এ দুনিয়ার ইলাহ্ বা সৃষ্টিকর্তা কেউ নেই, কিংবা এ দুনিয়ায় একাধিক ইলাহ রয়েছে। একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, তা অপেক্ষা বড় মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন কথা আর কিছুই হতে পারে না। আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুই বলে ওঠে, তুমি মিথ্যাবাদী, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আছেন। আমাদেরকে আর তোমাদেরকে সেই আল্লাহ্ই তো সৃষ্টি করেছেন। আর সে আল্লাহই তোমাকে ঐ জিহ্বা দিয়েছেন যার দ্বারা তুমি এতবড় একটা মিথ্যা কথা বলছো। মুশরিক বলে যে, আল্লাহ্ এক নয়, তাঁর সাথে আরও অনেক দেবদেবী রয়েছে। তারাও রেযেক দেয়, তারাও তোমাদের মালিক, তারাও তোমাদের ভাগ্য গড়তে ও ভাংগতে পারে। উপকার করা কিংবা ক্ষতি করার ক্ষমতা তাদেরও আছে। তোমাদের দোয়া তারাও শুনতে পারে। তারাও তোমাদের মকসুদ পূর্ণ করতে পারে, তাদেরকে ভয় করে চলা উচিত। তাদের ওপর ভরসা করা যেতে পারে। দুনিয়া পরিচালনার ব্যাপারে তাদেরও হুকুম চলে। আল্লাহ্ ছাড়া তাদেরও হুকুম পালন করে চলা কর্তব্য। এসবই কালেমায়ে খাবীসাহ্। এসব কথার উত্তরে আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস বলে ওঠে ঃ 'তুমি মিথ্যাবাদী, তোমার প্রত্যেকটা কথাই সত্যের বিলকুল খেলাফ।' এখন ভেবে দেখুন, এ কালেমা যে ব্যক্তি কবুল করবে এবং সে অনুসারে নিজের জীবনকে গঠন করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে সে কেমন করে উন্নতি লাভ করতে পারে ? আল্লাহ্ অনুগ্রহ করে এসব লোককে অবসর ও অবকাশ দিয়ে রেখেছেন এবং রেযেক দেবারও ওয়াদা করেছেন। কাজেই আকাশ ও পৃথিবীর শক্তিগুলো কিছু না কিছু পরিমাণে তাদেরকে প্রতিপালন করবে—যেমন বন-জঙ্গলে আগাছা-পরগাছাগুলোকে করছে। কিন্তু পৃথিবীর কোন একটা জিনিসও আগ্রহ করে তাদেরকে সাহায্য করবে না এবং পূর্ণশক্তি দিয়ে তাদের সহায়তা করবে না। তারা ঠিক জঙ্গলের আগাছার মতই কিছুদিন মাত্র বেঁচে থাকতে পারবে—তার বেশী নয়।

উক্তরূপ পার্থক্য এ কালেমাদ্বয়ের পরিণাম ফলের ব্যাপারেও বর্তমান রয়েছে। 'কালেমায়ে তাইয়্যেবা' যখন ফল দান করবে, তখন তা খুবই মিষ্ট ও সুস্বাদুই হবে। দুনিয়ার বুকে তা দ্বারা শান্তি স্থাপিত হবে। চারদিকে সত্য ও পূর্ণ সুবিচার কায়েম হবে। নিখিল দুনিয়ার মানুষ তা দ্বারা অসাধারণ উপকার লাভ করতে পারবে। কিন্তু কালেমায়ে খাবীসাহ যতই বৃদ্ধি পাবে, কেবল কাঁটায় ভরা ডাল-পালাই তা হতে বের হবে। তিক্ত ও বিষাক্ত ফল তাতে ফলবে। এর শিরার শিরায় বিষ ভরা থাকবে। নিজেদের চোখ দিয়েই আপনারা তা দেখে নিতে পারেন। দুনিয়ার যেখানেই কুফরি, শিরক এবং নাস্তিকতার জোর বেশী, সেখানে কী হচ্ছে ? সেখানে মানুষ মানুষের রক্ত পান করছে। দেশের পর দেশ

গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করার আয়োজন খুব জোরের সাথেই চলছে। বিষাক্ত গ্যাস তৈরী হচ্ছে। এক জাতি অন্য জাতিকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য ওঠেপড়ে লেগেছে। শক্তিমান দুর্বল ব্যক্তিগণকে নিজের গোলাম বানিয়ে রেখেছে—তার ভাগের রুটি কেড়ে নেবার জন্য শুধু দুর্বল মানুষকে সেখানে সৈন্য, পুলিশ, জেল ও ফাঁসির ভয় দেখিয়ে অবনমিত করে রাখার এবং শক্তিশালী জাতির যুলুম নীরবে সহ্য করার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে। এছাড়া এসব জাতির ভিতরের অবস্থা আরও ভয়ানক খারাপ। তাদের নৈতিক চরিত্র এতই কদর্য যে, স্বয়ং শয়তানও তা দেখে লজ্জা পায়। মানুষ সেখানে জন্তু-জানোয়ার অপেক্ষাও হীনতর কাজ করছে। মায়েরা সেখানে নিজেদের হাতেই নিজেদের সন্তানকে হত্যা করছে—যেন এ সন্তান তাদের সুখ-সম্ভোগের পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে। স্বামীরা সেখানে নিজেদের স্ত্রীদেরকে অন্যের কোলে ঠেলে দিচ্ছে শুধু পরের স্ত্রীকে নিজের বুকে পাবার উদ্দেশ্যে। উলংগদের ক্লাব ঘর তৈরী করা হয়েছে, সেখানে নারী-পুরুষ পশুর মত উলংগ হয়ে চলাফেরা করছে। ধনী ব্যক্তি সুদ গ্রহণ করে গরীবদের প্রতি কেনা গোলামের ন্যায় ব্যবহার করছে। মনে হয়, কেবল তাদেরই খেদমত করার জন্য দুনিয়ায় এদের জন্ম হয়েছে। মোটকথা, এই 'কালেমায়ে খাবীসা'র দরুন সেখানে কাঁটায় চারদিকে ভরে গেছে ; আর যে ফলই তাতে ফলছে তা হয়েছে ভয়ানক তিক্ত ও বিষাক্ত।

আল্লাহ তাআলা এ দু'টি উদাহরণ বিশ্লেষণ করার পর বলেছেন, 'কালেমায়ে তাইয়্যেবা'র প্রতি যারা ঈমান আনবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে একটি মজবুত বাণীর সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন—তারা অটল ও অক্ষয় হবে। আর তার মোকাবিলায় 'কালেমায়ে খাবীসা'কে যারা বিশ্বাস করবে, আল্লাহ তাআলা তাদের সকল আয়োজন ও চেষ্টাকেই ব্যর্থ করে দেবেন। তারা কখনই কোন সহজ কাজ করতে পারবে না। তা দ্বারা দুনিয়া কিংবা আখেরাতে তাদের কিছুমাত্র কল্যাণও সাধিত হতে পারে না।

'কালেমায়ে তাইয়্যেবা' ও 'কালেমায়ে খাবীসা'র পার্থক্য ও উভয়ের ফলাফল আপনারা শুনলেন। এখন আপনারা অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে পারেন যে, আমরাও 'কালেমায়ে তাইয়্যেবা'কে মানি ; কিন্তু তবু কোন্ কারণে আমাদের উন্নতি হয় না ? আর যে কাফেরগণ কালেমায়ে খাবীসাকে বিশ্বাস করে তারাই বা কোন্ কারণে এত শক্তিমান ও উন্নত হচ্ছে ?

এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার ভার আমার ওপর। আমি এর জবাব দেব, কিন্তু পূর্বেই বলেছি, আমার জবাব শুনে কেউ রাগ করতে পারবেন না। আমার জবাব ঠিক কি না আপনারা শুধু তাই বিচার করে দেখবেন।

আপনারা কালেমায়ে তাইয়্যেবার প্রতি ঈমান এনেছেন বলে দাবী করেন এবং তবুও আপনাদের উন্নতি হচ্ছে না, প্রথমত একথাটাই মিথ্যা। কারণ কেবল মুখে মুখে কালেমায়ে তাইয়্যেবা পড়লেই কোন কাজ হয় না, তা মন দিয়ে পড়তে হবে। মন দিয়ে পড়ার অর্থ বিশ্বাস ও মতবাদের পরিবর্তন করা। এর বিরোধী কোন বাদ বা মতবাদ যেন কালেমা বিশ্বাসী ব্যক্তির মনে স্থান না পায় এবং কালেমার নির্দেশের বিপরীত কোন কাজও যেন সে কখনও না করে। কিন্তু বলুন, আপনাদের প্রকৃত অবস্থা কি এরূপ ? আপনাদের মধ্যে কি কালেমায়ে তাইয়্যেবার বিপরীত হাজারও কুফরি ও মুশরিকী ধারণা বর্তমান নেই ? মুসলমানের মাথা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোও সামনে নত হয় না ? মুসলমান আল্লাহ ছাড়া অন্য লোককে কি ভয় করে না ? অন্যের সাহায্যের ওপর কি ভরসা করে না ? আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও কি তারা রেযেকদাতা বলে বিশ্বাস করে না ? আল্লাহর আইনকে ছেড়ে দিয়ে তারা খুশী হয়েই কি অন্যের আইন অনুসরণ করে চলে না ? মুসলমান হবার দাবীদার লোকেরা আদালতে গিয়ে পরিষ্কারভাবে বলে না যে, আমরা শরীয়াতের বিচার চাই না ? আমরা দেশের প্রচলিত প্রথামত বিচার চাই ? আপনাদের মধ্যে এমন কোন লোককি নেই, যারা দুনিয়ার সামান্য স্বার্থ লাভের জন্য আল্লাহর আইন লংঘন করতে একটুও পরোয়া করে না ? আপনাদের মধ্যে এমন লোক কি নেই, যারা কাফেরদের ক্রোধের ভয়ে ভীত ; কিন্তু আল্লাহর গযবকে মোটেই ভয় করে না ? এমন লোক কি আপনাদের মধ্যে নেই, যারা কাফেরদের কৃপাদৃষ্টি লাভ করার জন্য সবকিছুই করতে প্রস্তুত, কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ দৃষ্টি লাভ করার জন্য কিছুই করতে রাজী নয় ? এমন লোকও কি নেই, যারা কাফেরদের রাজত্বকে 'রাজত্ব' বলে মনে করে, কিন্তু আল্লাহর রাজত্ব যে কোথাও বর্তমান আছে, সেই কথা তাদের একেবারেই মনে পড়ে না ? সত্য করে বলুন, এসব কথা কি সত্য নয় ? যদি বাস্তবিকই সত্য হয়ে থাকে, তবে আপনারা কালেমায়ে তাইয়্যেবাকে স্বীকার করেন এবং তা সত্ত্বেও আপনাদের উন্নতি হয় না একথা কোন মুখে বলতে পারেন ? প্রথমে খাঁটি মনে ঈমান আনুন এবং কালেমায়ে তাইয়্যেবা অনুসারে জীবনকে গঠন করুন। তারপর যদি গভীর মাটির তলে মজবুত শিকড় ও শূন্য আকাশে বিস্তৃত শাখার সেই মহান গাছের জন্ম না হয়, তখন বলতে পারবেন যে, আল্লাহ মিথ্যা ওয়াদা করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। পরন্তু কালেমায়ে খাবীসাহ বিশ্বাসী লোক দুনিয়ায় খুবই উন্নতি লাভ করছে বলে মনে করাও সম্পূর্ণরূপে ভুল। কারণ কালেমায়ে খাবীসাকে যারা মানবে তারা উন্নতি লাভ করতে পারে না ; অতীতে কখনও পারেনি আর এখনও পারছে না। তাদের ধন-দৌলত, সুখ-শান্তি ও স্ফূর্তির জীবন, বিলাসিতা ও আনন্দের সাজ-সরঞ্জাম এবং বাহ্যিক শান-শওকত দেখে আপনারা হয়ত মনে করেছেন যে,

তারা আসলে বুঝি খুবই উন্নতি করছে। কিন্তু আপনারা তাদের মনের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখুন, তাদের মধ্যে কতজন লোক বাস্তবিকই শান্তিতে আছে ? বিলাসিতা ও সুখের সরঞ্জাম তাদের প্রচুর আছে ; কিন্তু মনের মধ্যে আগুনের উলকাপিণ্ড সবসময় দাউ দাউ করে জ্বলছে। এজন্যই তারা এক আল্লাহকে পেতে পারে না। আল্লাহর আইন অমান্য করার কারণে তাদের প্রত্যেকটি পরিবার জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হচ্ছে। খবরের কাগজ খুলে দেখুন, ইউরোপ ও আমেরিকায় আত্মহত্যার হিড়িক পড়ে গেছে। কত অসংখ্য তালাক দিন-রাত সংঘটিত হচ্ছে। সেই দেশের সন্তান কিভাবে নষ্ট করা হচ্ছে এবং ওষুধ ব্যবহার করে জন্মের হার কমিয়ে দেয়া হচ্ছে। নানা প্রকার দূষিত রোগে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন কিভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে খাদ্য নিয়ে কিভাবে টানাটানি ও কাড়াকাড়ি চলছে। হিংসা-দ্বেষ এবং শত্রুতা এক জাতীয় মানুষের মধ্যে কিভাবে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছে। বিলাসিতার লোভ মানুষের জীবনকে কতখানি তিক্ত করে দিয়েছে। দুনিয়ার এসব বড় বড় চাকচিক্যময় শহরে দূর হতে দেখে যাকে আপনারা স্বর্গের সমান মনে করেন—লক্ষ লক্ষ লোক কি দুঃখের জীবন যাপন করছে, তা ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে। ... এটাকে কি কখনও উন্নতি বলে মনে করা যায় ? এ 'স্বর্গ' পাবার জন্যই কি আপনারা লালায়িত ?

মনে রাখবেন, আল্লাহর বাণী কখনও মিথ্যে হতে পারে না। বাস্তবিকই কালেমায়ে তাইয়্যেবা ছাড়া আর কোন 'কালেমা' এমন নেই, যা অনুসরণ করে মানুষ দুনিয়ায় সুখ এবং পরকালে মহাশান্তি লাভ করতে পারে। যে দিকে ইচ্ছে আপনারা চোখ খুলে চেয়ে দেখুন, এ সত্যের বিপরীত আপনারা কোথাও দেখতে পাবেন না।

কালেমায়ে তাইয়্যেবার প্রতি ঈমান আনার উদ্দেশ্য

পূর্বেই দু'টি প্রবন্ধে কালেমায়ে তাইয়্যেবার বিশদ অর্থ আপনাদের সামনে ব্যক্ত করেছি ; বর্তমান প্রবন্ধে আমি কালেমায়ে তাইয়্যেবার প্রতি ঈমান আনার আবশ্যকতা এবং তার উপকারিতা ব্যক্ত করতে চেষ্টা করবো।

আপনারা সকলে জানেন যে, মানুষ দুনিয়ায় যে কাজই করুক না কেন, তার মূলে একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই বর্তমান থাকে এবং কিছু না কিছু উপকার পাবার জন্যই মানুষ সে কাজ করে থাকে। বিনা উদ্দেশ্যে, বিনা গরজে এবং বিনা উপকারিতায় কোন কাজ কেউই করে না। আপনারা পানি পান করেন কেন ? পান করেন এ জন্য যে, তাতে আপনাদের পিপাসা নিবারণ হয়। কিন্তু পানি পান করার পরও যদি আপনাদের পিপাসা না মিটত তবে আপনারা কিছুতেই পানি পান করতেন না। কারণ, এ পানি পান করায় কোন ফল নেই। আপনারা খাদ্যদ্রব্য কেন আহার করেন ? এ উদ্দেশ্যে যে, তাতে আপনাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে এবং আপনাদের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আহার ও অনাহার উভয়েরই ফল যদি একরূপ হয়, তবে খাদ্য ভক্ষণের কাজটাকে আপনারা একটা বাজে কাজ বলে মনে করতেন। রোগ হলে আপনারা ওষুধ সেবন করেন এ জন্য যে, তাতে রোগ দূর হয়ে যাবে এবং আপনারা পূর্ণ স্বাস্থ্যবান হবেন ; কিন্তু ওষুধ সেবন করার পরও যদি রোগ দূর না হয়, বরং পূর্বের মতই অবস্থা বর্তমান থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই বলবেন, এ ওষুধ সেবন করা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। কৃষি কাজে আপনারা এত পরিশ্রম করেন কেন ? করেন এ জন্য যে, আপনারা এর দ্বারা শস্য, ফল ও নানারকমের তরিতরকারী পেতে পারবেন। কিন্তু বীজ বপন করার পরও যদি জমিতে কোন শস্য না হয় তবে আপনারা হাল-চাষ, বীজ বোনা এবং তাতে পানি দেয়ার জন্য এতদূর কষ্ট কিছুতেই স্বীকার করতেন না। মোটকথা দুনিয়ায় আপনারা যে কাজই করেন না কেন, তাতে উদ্দেশ্য সফল হলে কাজ ঠিকমত হয়েছে বলে মনে করা হয়। আর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলে আপনারা বলেন যে, কাজ ঠিকমত করা হয়নি।

এ নিগূঢ় কথাটি মনে রাখুন তারপর আপনারা আমার এক একটা প্রশ্নের জবাব দিতে থাকুন। প্রথম প্রশ্ন এই যে, কালেমা পড়া হয় কেন ? এ প্রশ্নের জবাবে আপনি এছাড়া আর কিছুই বলতে পারেন না যে, কালেমা পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এর দ্বারা কাফের ও মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, কাফের ও মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য করার অর্থ

কি ? এর অর্থ কি এই যে, কাফেরের দু'টি চোখ, কাজেই মুসলমান কালেমা পড়লে তার চারটি চোখ হবে ? অথবা কাফেরের মাথা একটি কাজেই মুসলমানের মাথা দু'টি হবে ?...আপনি নিশ্চয়ই বলবেন যে, না এখানে দৈহিক পার্থক্যের কথা বলা হচ্ছে না। পার্থক্য হওয়ার আসল অর্থ এই যে, কাফেরের পরিণাম ও মুসলমানের পরিণাম পার্থক্য হবে। কাফেরের পরিণাম এই যে, পরকালে সে আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হবে এবং তার জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হয়ে যাবে। আর মুসলমানের পরিণামে এই যে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে এবং পরকালে সে সফল হবে—মহাসুখে কালযাপন করবে।

আপনাদের এ জবাব শুনে আমি বলবো যে, আপনারা ঠিক জবাবই দিয়েছেন। কিন্তু আপনারা আমাকে বলুন ঃ পরকাল কাকে বলে ? পরকাল বিফল ও সার্থক হওয়ার অর্থ কি ? আর সেখানে সফলতা ও কামিয়াবী লাভের তাৎপর্যইবা কি ? একথাগুলো ভাল করে বুঝে নিতে না পারলে পরবর্তী আলোচনা শুরু করা যায় না।

এ প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতে হবে না। পূর্বেই এর জবাব দেয়া হয়েছে? বলা হয়েছে ঃ اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ। "ইহকাল পরকালের কৃষি ক্ষেত।"

দুনিয়া ও আখেরাত দু'টি ভিন্ন জিনিস নয়। উভয়ই মানুষের একই পথের দু'টি মনজিল। দুনিয়া এ পথের প্রথম মনজিল, আর আখেরাত সর্বশেষ মনজিল। জমি চাষ করা এবং তা হতে ফসল পাওয়ার মধ্যে যে সম্পর্ক এ দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে ঠিক সে সম্পর্কই বিদ্যমান। আপনারা জমিতে হাল-চাষ করেন, তার পরে বীজ বপন করেন, দরকার হলে তাতে পানি দেন, তার পরে আপনারা ফসল পেতে পারেন। সেই ফসল ঘরে এনে তা আপনারা সারা বছর নিশ্চিত হয়ে খেতে থাকেন। আপনি জমিতে যে জিনিসেরই চাষ করবেন, ফলও তারই পাবেন। ধান বপন করলে ধান পাবেন, পাট বপন করলে পাট পাবেন, গম বপন করলে গমেরই ফসল পাবেন, কাঁটার গাছ যদি বপন করেন, তবে কাঁটার গাছই আপনার ক্ষেতে জন্মাবে। আর যদি কিছুই বপন না করেন, তবে আপনার ক্ষেতে কিছুই জন্মাবে না। তারপর হাল-চাষ করতে, বীজ বপন করতে, তাতে দরকার মত পানি দিতে এবং ক্ষেতের দেখাশুনা করতে যে ভুল-ক্রটি আপনার দ্বারা হয় তার মন্দ ফল আপনার ফসল কাঁটার সময়ই জানতে পারেন। আর এসব কাজ যদি আপনি খুব ভালভাবে করে থাকেন, তবে ফসল কাঁটার সময়ই আপনি এর বাস্তব ফল দেখতে পাবেন। দুনিয়া ও আখেরাতের অবস্থাও ঠিক এরূপ। দুনিয়াকে মনে করেন একটা ক্ষেত। এখানে নিজের পরিশ্রম ও চেষ্টার দ্বারা নিজের জন্য ফসল উৎপন্ন করার উদ্দেশ্যে মানুষকে পাঠান হয়েছে। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে এ কাজের

জন্য সময় দেয়া হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে মানুষ যে ফসলেরই চাষ করে, সেই ফসলই সে মৃত্যুর পর পরকালের জীবনে পেতে পারবে, আর যে ফসলই সেখানে পাবে তার পরকালীন জীবন একমাত্র তারই ওপর নির্ভর করবে। যদি কেউ দুনিয়ায় জীবন ভরে ভাল ফসলের চাষ করে, তাতে দরকার মত পানি দেয় এবং তার দেখাশুনাও যদি খুব ভালভাবে করে, তবে পরকালের জীবনে সে যখনই পা রাখবে, তখনই তার পরিশ্রমের ফল স্বরূপ একটি ফলেফুলে ভরা শ্যামল বাগিচা দেখতে পাবে। তাকে এ পরকালের জীবনে আর কোন পরিশ্রম করতে হবে না, বরং দুনিয়ার জীবন ভরে শ্রম করে যে বাগান সে তৈরী করেছে, সেই বাগানের অফুরন্ত ফলেই তার জীবন সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হবে। এ জিনিসেরই নাম হচ্ছে জান্নাত। এটা লাভ করতে পারলেই বুঝতে হবে যে, পরকালে সে সফল ও কামিয়াব হয়েছে।

কিন্তু যে ব্যক্তি তার দুনিয়ার জীবনে কেবল কাঁটা, তিক্ত ও বিষাক্ত ফলের বীজ বপন করে, পরকালের জীবনে শুধু তারই ফসল পাবে। সেখানে খারাপ ফসল নষ্ট করে দিয়ে ভাল ফসল তৈরী করার এবং নিজের এ নির্বুদ্ধিতার পরিবর্তে বুদ্ধিমানের মত কাজ করার কোন সুযোগ বা সময় সে আর পাবে না। সেই খারাপ ফসলের দ্বারাই পরকালের সমস্ত জীবন কাটাতে হবে, কারণ দুনিয়ায় সে শুধু এরই চাষ করেছে। যে কাঁটা সে রোপণ করেছিল, পরকালে তাকে সেই কাঁটার শয্যায়ই শায়িত করা হবে। আর যে তিক্ত ও বিষাক্ত ফলের চাষ করেছিল, সেখানে তাঁকে তাই ভোগ করতে হবে। পরকালে ব্যর্থ ও বিফল হওয়ার অর্থ এটাই।

আখেরাতের ব্যাখ্যা এইমাত্র আমি করলাম, কুরআন ও হাদীস হতেও এটাই প্রমাণিত হয়। এ ব্যাখ্যা হতে নিসন্দেহে জানা গেল যে, পরকালের জীবনে মানুষের বিফল কিংবা সফল হওয়া এবং তার পরিণাম ভাল কিংবা মন্দ হওয়া প্রকৃতপক্ষে তার এ দুনিয়ার জীবনের ইলম ও আমল, জ্ঞান ও কাজের ভাল কিংবা মন্দ হওয়ারই একমাত্র ফল এতে কোন সন্দেহ নেই।

একথাটি বুঝে নেয়ার সাথে সাথে একথাটিও অতি সহজেই বুঝতে পারবেন যে, মুসলমান ও কাফেরের পরিণাম ফলের পার্থক্য বিনা কারণে হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে পরিণামের পার্থক্য প্রথম সূচনার পার্থক্যের ফলমাত্র। দুনিয়ায় যদি মুসলমান এবং কাফেরের জ্ঞান ও কাজের পার্থক্য না হয়, তবে পরকালেও তাদের পরিণামের দিক দিয়ে কোনই পার্থক্য হতে পারে না। দুনিয়ায় এক ব্যক্তির জ্ঞান ও কাজ ঠিক একজন কাফেরের জ্ঞান ও কাজের মতই হবে অথচ পরকালে কাফেরের দুঃখময় পরিণাম হতে সে বেঁচে যাবে, এটা কিছুতেই হতে পারে না।

এখন আবার সেই গোড়ার প্রশ্ন জেগে ওঠে যে, কালেমা পড়ার উদ্দেশ্য কি ? প্রথমে আপনি এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে, কাফেরের পরিণাম ও মুসলমানের পরিণামে পার্থক্য হওয়াই কালেমা পড়ার একমাত্র উদ্দেশ্য। তারপরে আপনি পরিণাম ও পরকালের যে ব্যাখ্যা শুনিয়েছেন, সেই অনুসারে আপনার প্রদত্ত জবাব সম্পর্কে আপনাকে আবার একটু ভেবে দেখতে হবে এবং আপনাকে এখন একথাই বলতে হবে যে, কালেমা পড়ার উদ্দেশ্য দুনিয়ার মানুষের ইলম বা জ্ঞান ও কাজকে ঠিক এমনভাবে করা—যেন পরকালে তার পরিণাম ভাল হয়। পরকাল মানুষকে এ দুনিয়ায় সেই ফলের বাগান তৈরি কাজ শিক্ষা দেয়। মানুষ যদি এ কালেমাকেই স্বীকার না করে তবে সেই বাগান লাগাবার নিয়ম সে মোটেই জানতে পারবে না। তাহলে সে বাগানই বা তৈরি করবে কি করে, আর পরকালে সে কিসের ফল ভোগ করবে ? মানুষ যদি কেবল মুখে মুখেই এ কালেমা পড়ে ; কিন্তু তার জ্ঞান যদি কালেমা না পড়া ব্যক্তির মত হয় এবং তার কাজ-কর্ম যদি একজন কাফেরের মত হয়, তাহলে তার বিবেক বলে ওঠবে যে, এভাবে কালেমা পড়ায় কোনই লাভ নেই। এমন ব্যক্তির পরিণাম একজন কাফেরের পরিণামের চেয়ে ভাল হবার কোন কারণ থাকতে পারে না। শুধু মুখ দিয়ে কালেমা পড়ে আল্লাহর ওপর সে কোন অনুগ্রহ করেনি। কাজেই বাগান বানাবার নিয়ম না শিখে, বাগান তৈরি না করে এবং সারা জীবন কেবল কাঁটার চাষ করে কোন মানুষই পরকালের সবুজ-শ্যামল ও ফুলে-ফলে ভরা বাগান লাভ করতে পারে না। সেরূপ ধারণা করাও আকাশকুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। পূর্বে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে প্রকাশ করেছি, যে কাজ করা এবং না করা উভয়েরই ফল এক রকম, সেই কাজের কোন দাম নেই, তা একেবারেই অর্থহীন। যে ওষুধ সেবন করার পরও রুগীর অবস্থা ঠিক সেই রকম থাকে যেমন ছিল ওষুধ পান করার পূর্বে, তা আসলে ওষুধ নয়। ঠিক এ রকমই কালেমা পড়া মানুষের জ্ঞান এবং কাজ যদি ঠিক কালেমা না পড়া লোকদের মতই থাকে তবে এমন কালেমা পড়া একেবারেই অর্থহীন। দুনিয়ায়ই যখন কাফের ও মুসলমানের বাস্তব জীবনধারায় কোনরূপ পার্থক্য হলো না তখন পরকালে তাদের পরিণাম ফল ভিন্ন ভিন্ন হবে কেন ?

এখন কালেমায়ে তাইয়্যেবা মানুষকে কোন্ ধরনের জ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং সেই জ্ঞান শেখার পর মুসলমান ও কাফেরের দৈনন্দিন কাজে কোন্ ধরনের পার্থক্য হওয়া বাঞ্ছনীয় তারই আলোচনা করবো।

দেখুন, এ কালেমা হতে আপনি সর্বপ্রথম জানতে পারেন যে, আপনি আল্লাহর বান্দাহ, আর কারো বান্দাহ আপনি নন। একথা যখন আপনি জানতে

পারলেন তখন আপনা আপনি একথাও আপনার জানা হয়ে গেল যে, আপনি যার বান্দাহ দুনিয়ায় তাঁরই মর্জিমত আপনাকে কাজ করতে হবে। কারণ তাঁর মর্জির খেলাফ যদি আপনি চলেন বা কাজ করেন, তবে আপনার মালিকের বিরুদ্ধে আপনার বিদ্রোহ করা হবে।

অতএব এ কালেমা আপনাকে শিক্ষা দেয় যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল। একথা জেনে নেয়ার সাথে সাথে একথাও আপনি জানতে পারলেন যে, আল্লাহর রাসূল দুনিয়ার ক্ষেতে কাঁটা ও বিষাক্ত ফলের চাষ করার পরিবর্তে ফুল এবং মিষ্ট ফলের বাগান রচনা করার যে নিয়ম দেখিয়ে দিয়েছেন, আপনাকেও ঠিক সেই নিয়মেই কাজ করতে হবে। আপনি যদি সেই নিয়ম অনুসরণ করেন, তাহলেই পরকালে আপনি ভাল ফসল পেতে পারবেন। আর যদি তার বিপরীত পন্থায় কাজ করেন, তবে দুনিয়ায় আপনার কাঁটার চাষ করা হবে এবং পরকালে ঠিক কাঁটাই আপনি ফসলরূপে পাবেন, অন্য কিছু নয়।

এ জ্ঞান লাভের পর আপনার দৈনন্দিন জীবনধরাকেও সেই অনুসারে গঠন করতে হবে। আপনি যদি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, আপনাকে একদিন মরতে হবে, মরার পরে এক ভিন্ন রকমের জীবন যাপন করতে হবে এবং সেই জীবনেও আপনাকে এ দুনিয়ায় অর্জিত ফসলের ওপর নির্ভর করে চলতে হবে, তাহলে হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর উপস্থাপিত নিয়ম ও বিধান অনুসরণ না করে অন্য কোন পন্থা অনুযায়ী চলা আপনার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। দুনিয়ায় আপনি চাষাবাদ করেন কেন ? করেন এ জন্য যে, চাষ না করলে ফসল পাওয়া যাবে না। আর ফসল না হলে না খেয়ে মরতে হবে—একথার প্রতি আপনার খুবই বিশ্বাস আছে। আপনি যদি একথা বিশ্বাস না করতেন এবং যদি মনে করতেন যে, চাষ না করলেও ফসল ফলবে কিংবা ফসল ছাড়াও আপনি বেঁচে থাকতে পারবেন, তাহলে আপনি চাষাবাদের জন্য এত পরিশ্রম কিছুতেই করতেন না। এখন আপনি নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করুন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে নিজের প্রভু ও মুহাম্মাদ (সা)-কে আল্লাহর রাসূল মুখে মুখে স্বীকার করে এবং আখেরাতের ওপর বিশ্বাস আছে বলে দাবী করে কিন্তু তার দৈনন্দিন জীবনে কাজ-কর্ম আল্লাহর কুরআন ও রাসূল (স)-এর হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারায় চলে, তার সম্বন্ধে জেনে রাখুন যে, তার ঈমান প্রকৃতপক্ষে অতিশয় দুর্বল। সে নিজের ক্ষেতের কাজ না করার মন্দ পরিণাম যেরূপ নিশ্চয়তার সাথে বিশ্বাস করে, যদি ততটুকু নিশ্চয়তার সাথে আখেরাতের জন্য ফসল তৈরি না করার দুঃখময় পরিণাম বিশ্বাস করতো, তবে কখনই সে পরকালের কাজে এরূপ অবহেলা প্রদর্শন করতে পারতো না। কেউ জেনে শুনে নিজের ভবিষ্যতের জন্য কাঁটা বীজের চাষ করে না। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে না যে, কাঁটা রোপণ করলে

তা হতে কাঁটাই জন্মাবে, আর সেই কাঁটাই তাকে কষ্ট দেবে একমাত্র সেই ব্যক্তিই কাঁটা চাষ করতে পারে অন্য কেউ নয়। আপনি জেনে শুনে আপনার হাতে জ্বলন্ত অংগার কখনই নিতে পারেন না। কারণ আপনি নিশ্চিত জানেন যে, এতে হাত পুড়ে যাবে। কিন্তু একটি অবুঝ শিশু আগুনে হাত দেয়, কেননা তার পরিণাম যে কত কষ্টদায়ক তা সে আদৌ জানে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের হাকীকত

بسم الله الرحمن الرحيم

মুসলমান কাকে বলে

এখানে আমি মুসলমানের জন্য প্রয়োজনীয় গুণসমূহ উল্লেখ করবো। অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার জন্য কমপক্ষে শর্ত কি আর মানুষের মধ্যে কমপক্ষে কি কি গুণ বর্তমান থাকলে তাকে মুসলমান বলা যেতে পারে, এখানে আমি সে বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করবো।

একথাটি ভাল করে বুঝার জন্য সর্বপ্রথম আপনাকে কুফর ও ইসলাম সম্পর্কে সঠিক এবং সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে। এ সম্পর্কে মোটামুটি আপনারা জেনে রাখুন যে, আল্লাহর হুকুম পালন করতে অস্বীকার করাকেই 'কুফর' বা কাফেরী বলা হয় ; আর কেবলমাত্র আল্লাহর হুকুম পালন করে চলা এবং আল্লাহর দেয়া পবিত্র কুরআনের বিপরীত যে নিয়ম, যে আইন এবং যে আদেশই হোক না কেন তা অমান্য করাকেই বলা হয় ইসলাম। ইসলাম এবং 'কুফরে'র এ পার্থক্য কুরআন মজীদের নিম্নোল্লিখিত আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ۝(المائدة : ٤٥)

"আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে যারা ফায়সালা করে না তারাই কাফের।"

আদালত ও ফৌজদারীতে যেসব মোকদ্দমা উপস্থিত হয় কেবল সেই সবের বিচার-ফায়সালা কুরআন-হাদীস অনুসারে করার কথা এখানে বলা হয়নি। বরং প্রত্যেকটি মানুষ তার জীবনের প্রত্যেকটি কাজের সময় যে ফায়সালা করে সেই ফায়সালার কথাই এখানে বলা হয়েছে। প্রত্যেকটি ব্যাপারেই আপনাদের সামনে এ প্রশ্ন ওঠে যে, এ কাজ করা উচিত কি উচিত নয়, অমুক কাজ এ নিয়মে করবো কি আর কোন নিয়মে করবো ? এ সময় আপনাদের কাছে সাধারণত দু' প্রকারের নিয়ম এসে উপস্থিত হয়। এক প্রকারের নিয়ম আপনাদেরকে দেখায় আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলের হাদীস। আর এক প্রকারের নিয়ম উপস্থিত করে আপনাদের নফস, বাপ-দাদা হতে চলে আসা নিয়ম-প্রথা অথবা মানব রচিত আইন। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া নিয়ম বাদ দিয়ে অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, প্রকৃতপক্ষে সে কুফরির পথই অবলম্বন করে। যদি সে তার সমস্ত জীবন সম্বন্ধেই এ সিদ্ধান্ত করে নেয় এবং কোন কাজেই যদি আল্লাহর দেয়া নিয়ম অনুসরণ না করে তবে সে পুরোপুরিভাবে কাফের। যদি সে কতক কাজে

আল্লাহর হেদায়াত মেনে চলে আর কতকগুলো নিজের নফসের হুকুম মত কিংবা বাপ-দাদার প্রথা মত অথবা মানুষের রচিত আইন অনুযায়ী করে তবে যতখানি আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণ করবে, সে ঠিক ততখানি কুফরির মধ্যে লিপ্ত হবে। এ হিসেবে কেউ অর্ধেক কাফের, কেউ চার ভাগের এক ভাগ কাফের। কারো মধ্যে আছে দশ ভাগের এক ভাগ কুফরী আবার কারো মধ্যে আছে কুড়ি ভাগের এক ভাগ। মোটকথা, আল্লাহর আইনের যতখানি বিরোধিতা করা হবে ততখানি কুফরি করা হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

বস্তুত কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার বান্দাহ হয়ে থাকা এবং নফস, বাপ-দাদা, বংশ-গোত্র, মৌলভী সাহেব, পীর সাহেব, জমিদার, তহশীলদার, জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি কারোও আনুগত্য না করারই নাম হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাস হবে না। আর কারোও দাসত্ব কবুল করবে না —এটাই হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির কাজ। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ○ (ال عمران : ٦٤)

"(হে নবী !) আহলে কিতাবদের বল ঃ আস, আমরা ও তোমরা এমন একটা কথায় একত্রিত হই, যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য (অর্থাৎ তোমাদের নবীরা যা বলেছে, আমিও আল্লাহর নবী হওয়ার কারণে তাই বলছি।) তা এই যে, (১) আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোও বান্দাহ হবো না, (২) আল্লাহর উলুহিয়াতের সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবো না এবং (৩) আমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকেও নিজের অভিভাবক ও মালিক বলে মান্য করবো না। এ তিনটি কথা যদি তারা স্বীকার না করে তবে তোমরা তাদেরকে পরিষ্কার বলে দাও তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলমান —অর্থাৎ আমরা এ তিনটি কথাই পুরাপুরি কবুল করে নিচ্ছি।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ○ (ال عمران : ٨٣)

"তোমরা কি আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করতে চাও? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তাঁরই আনুগত্য করে যাচ্ছে। আর সকলেই তাঁর কাছে ফিরে যাবে।"

এ দু'টি আয়াতে একই কথা বলা হয়েছে। তা এই যে, আসল দ্বীন হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর আদেশ পালন করা। আল্লাহর ইবাদাতের অর্থ কেবল এটাই নয় যে, দিন-রাত পাঁচবার তাঁর সামনে সিজদা করলেই ইবাদাতের যাবতীয় দায়িত্ব প্রতিপালিত হয়ে যাবে। বরং দিন-রাত সর্বক্ষণ একমাত্র আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করে চলাকেই প্রকৃতপক্ষে ইবাদাত বলে। যে কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন, তা হতে ফিরে থাকা এবং তিনি যা করতে আদেশ করেছেন তা পূর্ণরূপে পালন করাই হচ্ছে ইবাদাত। এজন্য প্রত্যেকটি কাজে এবং প্রত্যেকটি হুকুমের ব্যাপারেই কেবলমাত্র আল্লাহর খোঁজ নিতে হবে। নিজের মন ও বিবেক-বুদ্ধি কি বলে, বাপ-দাদারা কি বলে বা করে গেছেন, পরিবার, বংশ ও আত্মীয়গণের মত কি, জনাব মৌলভী সাহেব আর জনাব পীর সাহেব কেবলা কি বলছেন, অমুক সাহেবের হুকুম কি, কিংবা অমুক সাহেবের মত কি—এসব মাত্রই দেখবে না এবং সেই দিকে মাত্রই ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না। আল্লাহর হুকুম ত্যাগ করে এদের কারোও হুকুম পালন করলে আল্লাহর সাথে শিরক করা হবে এবং যার হুকুম মান্য করা হবে তাকে আল্লাহর মত সম্মান দান করা হবে। কারণ হুকুম দেয়ার ক্ষমতা তো কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার ঃ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ "আল্লাহর হুকুম ছাড়া মানুষ অন্য কারো হুকুম মানতে পারে না।" মানুষের ইবাদাত-বন্দেগী তো কেবল তিনিই পেতে পারেন, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার অনুগ্রহে মানুষ বেঁচে আছে। আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসই তাঁর হুকুম পালন করে চলছে। একটি পাথর অন্য পাথরের হুকুম মত কাজ করে না, একটি গাছ আর একটি গাছের আনুগত্য করে না, কোন পশু অন্য পশুর হুকুমবরদারী করে চলে না। কিন্তু মানুষ কি পশু, গাছ ও পাথর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা তো শুধু আল্লাহর আনুগত্য করবে, আর মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে অন্য মানুষের নির্দেশ মত চলতে শুরু করবে? একথাই কুরআনের উল্লেখিত তিনটি আয়াতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে।

এ কুফর ও গোমরাহী কোথা হতে আসে এবং মানুষের মধ্যে এটা কিরূপে প্রবেশ করে, অতপর এ সম্পর্কেই আলোচনা করবো। কুরআন শরীফ এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, মানুষের মধ্যে আল্লাহকে অমান্য করার ভাব তিনটি পথে প্রবেশ করে।

প্রথম পথ হচ্ছে মানুষের নিজের নফসের খাহেশ ঃ

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ (القصص : ٥٠)

"আল্লাহর দেয়া বিধান পরিত্যাগ করে যে ব্যক্তি নিজের নফসের ইচ্ছামত চলে তার অপেক্ষা অধিক গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে ? এ ধরনের যালেম লোকদেরকে আল্লাহ কখনই সৎপথের সন্ধান দেন না।"

এর অর্থ এই যে, মানুষকে গোমরাহ করার মত যত জিনিস আছে তার মধ্যে মানুষের নফসই হচ্ছে তার সর্বপ্রধান পথভ্রষ্টকারী শক্তি। যে ব্যক্তি নিজের খাহেশাতের দাসত্ব করবে, আল্লাহর বান্দাহ হওয়া তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কারণ যে কাজে টাকা পাওয়া যাবে, যে কাজ করলে সুনাম ও সম্মান হবে, যে জিনিসে অধিক স্বাদ ও আনন্দ লাভ করা যাবে, আরাম ও সুখ যে কাজে অধিক মিলবে সে কেবল সেসব কাজেরই সন্ধান করবে এবং যেসব কাজে তা দেখতে পাবে, কেবল সে কাজই করতে সে প্রাণ-পণ চেষ্টা করবে। সেসব কাজ করতে যদি আল্লাহ নিষেধও করে থাকেন, তবুও সে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। আর এসব জিনিস যেসব কাজে পাওয়া যাবে না সেসব কাজ করতে সে কখনও প্রস্তুত হবে না। আল্লাহ তাআলা যদি সেই কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন তবুও সে তার কিছুমাত্র পরোয়া করবে না। এমতাবস্থায় একথা পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে যে, সে আল্লাহ তাআলাকে তার খোদা রূপে স্বীকার করেনি বরং তার নফসকেই সে তার একমাত্র খোদার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। কাজেই এমন ব্যক্তি কোন প্রকারে আল্লাহর হেদায়াত লাভ করতে পারে না। কুরআন শরীফে একথা অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে ঃ

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰـهَهٗ هَوٰىهُ ۗ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ۝ اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ۗ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا (الفرقان : ٤٣-٤٤)

"(হে নবী !) যে ব্যক্তি নিজের নফসের খাহেশাতকে নিজের খোদা বানিয়ে নিয়েছে, তুমি কি তার সম্পর্কে ভেবে দেখেছ ? তুমি কি এ ধরনের মানুষের পাহারাদারী করতে পার ? তুমি কি মনে কর যে, এদের মধ্যে অনেক লোকই (তোমার দাওয়াত) শোনে এবং বুঝে ? কখনও নয়। এরা তো একেবারে জন্তু-জানোয়ারের মত বরং তা অপেক্ষাও এরা নিকৃষ্ট।"

যে ব্যক্তি নফসের দাস, সে যে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট তাতে কোন প্রকার সন্দেহ্ থাকতে পারে না। কোন পশুকে আপনারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করতে দেখবেন না। প্রত্যেক পশু সেই জিনিসই আহার করে যা আল্লাহ তাআলা তার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং ঠিক সেই পরিমাণ খাদ্য খায় যে পরিমাণ তার জন্য নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। আর যে জানোয়ারের জন্য যত কাজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে প্রত্যেক জানোয়ার সে কাজই করে যায়। কিন্তু এই মানুষ এমনই এক শ্রেণীর পশু যে, সে যখন নফসের দাস হয়ে যায়, তখন সে এমন সব কাজ করে যা দেখে শয়তানও ভয় পেয়ে যায়।

মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার এটাই প্রথম কারণ। দ্বিতীয় পথ হচ্ছে এই যে, বাপ-দাদা হতে যেসব রসম-রেওয়াজ, যে আকীদা-বিশ্বাস ও মত এবং যে চাল-চলন ও রীতিনীতি চলে এসেছে তার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকার দরুন মানুষ তার গোলাম হয়ে যায়। আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষাও তাকে বেশী সম্মানের যোগ্য বলে মনে করে। সেই রসম-রেওয়াজের বিপরীত আল্লাহর কোন কোন হুকুম যদি তার সামনে পেশ করা হয়, তবে সে অমনি বলে ওঠে বাপ-দাদারা যা করে গেছে, আমার বংশের যে নিয়ম বহুদিন হতে চলে এসেছে, আমি কি তার বিপরীত কাজ করতে পারি ? পূর্ব-পুরুষের নিয়মের পূজা করার রোগ যার মধ্যে এতখানি, আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হওয়া তার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে তার বাপ-দাদা এবং তার বংশের লোকেরাই তার খোদা হয়ে বসে। সে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করলে তা যে মিথ্যা দাবী হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে বড় কড়াকড়িভাবে সাবধান করে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ○ (البقرة : ١٧٠)

"যখনই তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্ তাআলার হুকুম পালন করে চল, তখন তারা শুধু একথাই বলে উঠেছে যে, আমাদের বাপ-দাদারা যে পথে চলেছে, আমরা কেবল সে পথেই চলবো। কিন্তু তাদের বাপ-দাদারা যদি কোন কথা বুঝতে না পেরে থাকে এবং তারা যদি সৎপথে না চলে থাকে, তবুও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে ?"

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ○ يَا أَيُّهَا

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَايَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○(المائدة : ١٠٤-١٠٥)

"যখনই তাদেরকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ যে বিধান পাঠিয়েছেন তার দিকে আস এবং রাসূলের দিকে আস, তখনই তারা বলেছে যে, আমাদের বাপ-দাদারা যে পথে চলে গেছে, আমাদের পক্ষে তাই যথেষ্ট। কিন্তু তাদের বাপ-দাদারা যদি আসল কথা জানতে না পেরে থাকে এবং তারা যদি সৎপথে না চলে থাকে তবুও কি তারা (অন্ধভাবে) তাদেরই অনুসরণ করে চলবে ? হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের চিন্তা করা উচিত। তোমরা যদি সৎপথে চলতে পার, অন্য লোকের গোমরাহীতে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। তোমাদের সকলকেই শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের কাজের ভাল-মন্দ তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবেন।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ১০৪-১০৫)

সাধারণভাবে প্রত্যেক যুগের জাহেল লোকেরা এ ধরনের গোমরাহীতে ডুবে থাকে এবং আল্লাহর নবীর দাওয়াত কবুল করতে এ জিনিস তাদেরকে বাধা দেয়। হযরত মূসা (আ) যখন সেই যুগের লোকদেরকে আল্লাহর শরীয়াতের প্রতি দাওয়াত দিয়েছিলেন তখনও তারা একথাই বলেছেন ঃ

اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا (يونس : ٧٨)

"আমাদের বাপ-দাদারা যে পথে চলেছে তুমি কি সেই পথ হতে আমাদেরকে ভুলিয়ে নিতে এসেছো ?"–(সূরা ইউনুস ঃ ৭৮)

হযরত ইবরাহীম (আ) যখন তাঁর গোত্রের লোকদেরকে শিরক হতে ফিরে থাকতে বললেন, তখন তারাও একথাটি বলেছিল ঃ

وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ (الانبياء : ٥٣)

"আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এই দেবতারই পূজা করতে দেখেছি।"

মোটকথা প্রত্যেক নবীরই দাওয়াত শুনে সেই যুগের লোকেরা শুধু একথাই বলেছে, "তোমরা যা বলছো তা আমাদের বাপ-দাদার নিয়মের বিপরীত। কাজেই আমরা তা মানতে পারি না।"

কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا ۙ اِنَّا

وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ○قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ط قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ○فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ○ (الزخرف : ٢٣-٢٥)

"এ রকম ঘটনা সবসময়ই ঘটে থাকে যে, যখনই কোন দেশে আমি নবী পাঠিয়েছি, সেই দেশের অর্থশালী ও সচ্ছল অবস্থার লোকেরা তখনই একথা বলেছে যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এক নিয়মে চলতে দেখেছি এবং আমরা ঠিক সেই নিয়মে চলছি। নবী তাদেরকে বললেন, তোমাদের বাপ-দাদার নিয়ম-প্রথা অপেক্ষা অধিক ভাল কথা যদি আমি তোমাদেরকে বলি, তবুও কি তোমরা তাদের নিয়ম অনুসারে চলতে থাকবে ? তারা উত্তরে বললো, আমরা তোমার কথা একেবারেই মানি না। তারা যখন এ জবাব দিল তখন আমিও তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করলাম। আর এখন তোমরা দেখে নাও যে, আমার বিধান অমান্য-কারীদের পরিণাম কতখানি মারাত্মক হয়েছে।"

এসব কথা প্রকাশ করার পর আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা হয় বাপ-দাদারই নিয়ম-প্রথার অনুসরণ কর, না হয় খাঁটিভাবে কেবল আমারই হুকুম মেনে চল ; কিন্তু এ দু'টি জিনিস একত্রে ও এক সাথে কখনও পালন করতে পারবে না। দু'টি পথের মধ্যে মাত্র একটি পথ ধরতে পারবে। মুসলমান হতে চাইলে সবকিছু পরিত্যাগ করে কেবল আমার হুকুম পালন করে চলতে থাক ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ط اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ○ وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ط وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ○ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ط اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ط (لقمن : ٢١-٢٣)

"তাদেরকে যখন বলা হলো যে, তোমরা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসরণ কর ; তখন তারা বলল যে, আমরা তো শুধু সেই পথই অনুসরণ করে চলবো, যে পথে আমাদের বাপ-দাদাকে চলতে দেখেছি। কিন্তু শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকে, তবুও কি ? যে ব্যক্তি নিজেকে

পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিয়েছে এবং নেককার হয়েছে সে তো মযবুত রশি ধারণ করেছে। কারণ সকল কাজের শেষ আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করবে—হে নবী, তার অস্বীকারের জন্য তোমার দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই। তারা সকলেই আমার কাছে ফিরে আসবে। তখন আমি তাদের সকল কাজের পরিণাম ফল দেখিয়ে দেব।"–(সূরা লোকমান ঃ ২১-২৩)

মানুষকে গোমরাহ করার এটা হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ। এরপর তৃতীয় পথ সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে যে, মানুষ যখন আল্লাহর হুকুম ছেড়ে দিয়ে মানুষের হুকুম পালন করতে শুরু করে এবং ধারণা করে যে, অমুক ব্যক্তি খুব বড়লোক তার কথা নিশ্চয়ই সত্য হবে, কিংবা অমুক ব্যক্তির হাতে আমার রিযক, কাজেই তার হুকুম অবশ্যই পালন করা উচিত অথবা অমুক ব্যক্তির শক্তি ও ক্ষমতা অনেক বেশী, এজন্য তার কথা অনুসরণ করা আবশ্যক ; কিংবা অমুক ব্যক্তি বদ দোয়া করে আমাকে ধ্বংস করে দিবে অথবা অমুক ব্যক্তি আমাকে সাথে নিয়ে বেহেশতে যাবে, কাজেই সে যা বলে তা নির্ভুল মনে করা কর্তব্য অথবা অমুক জাতি আজকাল খুব উন্নতি করছে, কাজেই তাদের নিয়ম অনুসরণ করা উচিত, তখন সে কিছুতেই আল্লাহর হেদায়াত অনুযায়ী কাজ করতে পারে না।

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط(الانعام ١١٦)

"তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অনুসরণ করে চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে ভুলিয়ে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাবে।"

অর্থাৎ মানুষ সোজা পথে ঠিক তখনই থাকতে পারে যখন তার আল্লাহ কেবলমাত্র একজনই হবে। যে ব্যক্তি শত শত এবং হাজার হাজার লোককে 'খোদা' বলে স্বীকার করবে এবং যে ব্যক্তি কখনও এক খোদার কথা মত আবার কখনও অন্য আর এক খোদার কথা মত চলবে সে সোজা পথ কখনই পেতে পারে না।

ওপরের আলোচনায় একথা আপনারা ভাল করেই জানতে পেরেছেন যে, মানুষের গোমরাহ হবার তিনটি বড় বড় কারণ বর্তমান ঃ

প্রথম—নফসের দাসত্ব।

দ্বিতীয়—বাপ-দাদা, পরিবার ও বংশের রসম-রেওয়াজের দাসত্ব।

তৃতীয়—সাধারণভাবে দুনিয়ার মানুষের দাসত্ব, ধনী, রাজা, শাসনকর্তা, ভণ্ড নেতা এবং দুনিয়ার পথভ্রষ্ট জাতিগুলোর দাসত্ব এর মধ্যে গণ্য।

এই তিনটি বড় বড় 'দেবতা' মানুষের খোদা হবার দাবী করে বসে আছে। যে ব্যক্তি মুসলমান হতে চায় তাকে সর্বপ্রথম এই তিনটি 'দেবতাকেই' অস্বীকার করতে হবে এবং যখনই সে তা করবে তখনই সে প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে। কিন্তু যে ব্যক্তি এ তিন প্রকারের দেবতাকে, নিজের মনের মধ্যে বসিয়ে রাখবে এবং এদের হুকুম মত কাজ করবে, আল্লাহর প্রকৃত বান্দাহ হওয়া তার পক্ষে বড়ই কঠিন। সে দিনের মধ্যে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায পড়ে, সারাদিন লোক দেখানো রোযা রেখে এবং মুসলমানের মত বেশ ধারণ করে লোককে শুধু ধোঁকাই দিতে পারবে। সে নিজেকেও ধোঁকা দিতে পারবে যে, সে খাঁটি মুসলমান হয়েছে। কিন্তু এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, এরূপ কৌশল করে আল্লাহকে কখনও ধোঁকা দিতে পারবে না।

ওপরে আমি যে তিনটি 'দেবতার' উল্লেখ করেছি, এদের দাসত্ব করাই হচ্ছে আসল শিরক। আপনারা পাথরের দেবতা ভাংগিয়েছেন, ইট ও চুনের সমন্বয়ে গড়া মূর্তি ও মূর্তিঘর আপনারা ধ্বংস করেছেন ; কিন্তু আপনাদের বুকের মধ্যে যে মূর্তিঘর বর্তমান রয়েছে, সেই দিকে আপনারা মোটেই খেয়াল করেননি। অথচ মুসলমান হওয়ার জন্য এ মূর্তিগুলোকে একেবারে চূর্ণ করে দেয়াই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা দরকারী কাজ ও সর্বপ্রথম শর্ত। যদিও আমি দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে লক্ষ্য করেই একথা বলছি এবং আমি জানি যে, দুনিয়ার মুসলমান যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে, এ তিন প্রকারের দেবতার পূজা করাই হচ্ছে তার একমাত্র কারণ। কিন্তু এখানে আমি কেবল এ দেশীয় মুসলমান ভাইগণকে বলছি যে, আপনাদের অধপতন আপনাদের নানা প্রকারের অভাব-অভিযোগ ও বিপদের মূল হচ্ছে উপরোক্ত তিনটি জিনিস। নফসের দাসত্ব, বংশগত ও প্রথার দাসত্ব এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য মানুষের দাসত্ব আপনাদের মধ্যে এখনও খুব বেশী পরিমাণেই আছে। আর এটাই ভিতর হতে আপনাদের শক্তি এবং দ্বীন ও ঈমানকে একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছে। আপনাদের মধ্যে আশরাফ-আতরাফ, কুলীন-গৃহস্ত এবং ছোট লোক বড় লোকের পার্থক্য আছে। আর এরূপে আপনাদের সমাজের লোকদেরকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করে রাখা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম এই সমস্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায়কে এক জাতি ও পরস্পরের ভাই করে একটি মযবুত দেয়ালের মত করতে চেয়েছিল। সেই দেয়ালের প্রত্যেকখানা ইট অন্য ইটের সাথে মযবুত হয়ে গেথে থাকবে, এটাই ছিল আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা। অথচ আপনারা এখনও সেই পুরাতন হিন্দুয়ানী জাতিভেদের ধারণা নিয়ে রয়েছেন। হিন্দুদের এক গোত্র যেমন অন্য গোত্র হতে পৃথক থাকে আর এক জাতি অন্য জাতিকে ঘৃণা করে আপনারাও ঠিক তাই করছেন। বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে আপনারা পরস্পর কোন কাজ করতে পারেন না। সকল মুসলমানকে আপনারা

সমানভাবে ভাই বলে গ্রহণ করতে পারেন না। মুখে মুখে ভাই বলে থাকেন, কিন্তু কাজের বেলায় আপনাদের মধ্যে ঠিক সেরূপ পার্থক্য থেকে যায় যেমন ছিল আরব দেশে ইসলামের পূর্বে। এসব কারণে আপনারা পরস্পর মিলে একটা মযবুত দেয়াল হতে পারেন না। ভাংগা দেয়ালের নানা দিকে ছড়ানো ইটের মত আপনারা এক একজন মানুষ পৃথক হয়ে পড়ে রয়েছেন। এ জন্যই না আপনারা এক ঐকবদ্ধ্য শক্তিতে পরিণত হতে পারছেন, না কোন বিপদ-আপদের মোকাবিলা করতে পারছেন। ইসলামের সুস্পষ্ট শিক্ষা অনুযায়ী আপনাদেরকে যদি বলা যায় যে, এই সমস্ত ভেদাভেদ ও পার্থক্য চূর্ণ করে দিয়ে ও পরস্পর মিলে-মিশে এক হয়ে যান তাহলে আপনারা তখন ঐ এক কথাই বলবেন যে, আমাদের বাপ-দাদার কাল হতে যে প্রথা চলে এসেছে তা আমরা ভেংগে দিতে পারি না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এর উত্তরে কি বলবেন তা কি আপনারা জানেন ? তিনি বলবেন, বেশ তোমরা এ সমস্ত ভেংগ না, আর এ সমস্ত অমুসলমানী আচার ছেড়ো না, ফলে আমিও তোমাদের একেবারে টুকরো টুকরো করে দেব এবং তোমরা দুনিয়ায় বহু লোক হওয়া সত্ত্বেও আমি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত ও অধপতিত করে রাখবো।

আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে আদেশ করেছেন, তোমাদের ছেলে-মেয়েরা সকলেই তোমাদের সম্পত্তির অংশ পাবে। কিন্তু আপনারা এর কি উত্তর দিয়েছেন ? আপনারা বলেছেন, আমাদের বাপ-দাদার আইনে মেয়েরা সম্পত্তির অংশ পেতে পারে না—পেতে পারে একমাত্র ছেলেরাই। কাজেই আমরা বাপ-দাদার আইন মানি আল্লাহর আইন মানতে পারি না। একটু চিন্তা করে দেখুন, এর নাম কি ইসলাম ? আপনাদেরকে বলা হয়েছে যে, বংশগত ও দেশ প্রচলিত আইন পরিত্যাগ কর, উত্তরে আপনাদের প্রত্যেকেই বলে ওঠবেন—সকলে যখন ত্যাগ করবে তখন আমিও করবো। কেননা অন্য লোক যদি তাদের মেয়েকে সম্পত্তির অংশ না দেয়, তাহলে আমার সম্পত্তি তো অন্যের ঘরে চলে যাবে, কিন্তু অন্যের ঘর হতে আমার ঘরে কিছুই আসবে না। ... ভেবে দেখুন, এই উত্তরের অর্থ কি ? অপরে যদি আল্লাহর আইন মানে তবে আপনি মানবেন, এরূপ শর্ত করে কি আপনি আল্লাহর আইনের প্রতি ঈমান এনেছেন ? তাহলে কাল আপনি এটাও বলতে পারেন যে, অপরে ব্যভিচার করলে আমিও ব্যভিচার করবো, অপরে চুরি করলে আমিও চুরি করবো। মোটকথা অপরে যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত গোনাহ না ছাড়বে আমিও ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত গোনাহ করতে থাকবো। আসল কথা এই যে, এ ব্যাপারে আমাদের দ্বারা উল্লেখিত তিনটি দেবতারই পূজা করানো হচ্ছে। নফসের বন্দেগী করছেন, বাপ-দাদার প্রথারও বন্দেগী করছেন, আর দুনিয়ার মুশরিক জাতিগুলোর দাসত্বও আপনারা করছেন। অথচ এ তিনটি দেবতার পূজার সাথে সাথে

ইসলামের দাবীও আপনারা করছেন। এখানে মাত্র দু'টি উদাহরণ আমি উল্লেখ করলাম। নতুবা একটু চোখ খুলে তাকালে এত প্রকারের বড় বড় রোগ আপনাদের মধ্যে দেখা যাবে যে, তা গুণেও শেষ করা যাবে না এবং লক্ষ্য করলে আপনি দেখবেন যে, কোথাও একটি দেবতার পূজা চলছে, কোথাও দু'টি দেবতার পূজা চলছে। অপর কোথাও তিনটি দেবতারই পূজা চলছে। তিনটি দেবতার পূজা করার সাথে সাথে ইসলামেরও দাবী করা একটা হাস্যকর ব্যাপার এবং এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা খাঁটি মুসলমানদের ওপর যে অফুরন্ত রহমত নাযিল করার ওয়াদা করেছেন, ঠিক তাই আমাদের ওপর নাযিল হবে—এরূপ আশা করাও কম হাস্যকর ব্যাপার নয়।

ঈমানের পরীক্ষা

পূর্বের প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, কুরআনের মতে মানুষের গুমরাহ্ হবার আসল কারণ হচ্ছে তিনটি। প্রথম, আল্লাহর আইন ত্যাগ করে নিজের নফসের খাহেশাতের গোলাম হওয়া ; দ্বিতীয়, আল্লাহর আইনের মোকাবিলায় নিজের বংশের রসম-রেওয়াজ ও বাপ-দাদার পথ অনুসরণ করা এবং তৃতীয়, আল্লাহ ও তাঁর নবী (স) যে পথনির্দেশ করেছেন, তাকে দূরে নিক্ষেপ করে দুনিয়ার মানুষের আনুগত্য করা—সেই মানুষ তার নিজের জাতির প্রতিপত্তিশালী লোক হোক, কিংবা ভিন্ন জাতিরই হোক।

মুসলমানের খাঁটি পরিচয় এই যে, সে এ তিন প্রকারের রোগ ও গোমরাহী হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে। মুসলমান শুধু তাকেই বলে, যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাস নয় এবং রাসূল ছাড়া অন্য কারো অনুসরণ করে না। সেই ব্যক্তি মুসলমান, যে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ এবং তাঁর নবীর শিক্ষাই সম্পূর্ণ সত্য, এর বিপরীত যা, তা সবই মিথ্যা। মানুষের দ্বীন-দুনিয়ার মংগল ও উন্নতি কেবলমাত্র আল্লাহ ও রাসূলের মহান শিক্ষার ভেতরেই নিহিত আছে। একথা যে ব্যক্তি নিসন্দেহে বিশ্বাস করতে পারবে, সে তার জীবনের প্রত্যেক কাজেই কেবল অনুসন্ধান করবে আল্লাহর হুকুম কি, রাসূলের বিধান কি ? আর যখনই তা সে জানতে পারবে তখনই সে সোজাসুজি এর সামনে তার মাথা নত করে দেবে। অতপর তার মন যতই অস্থির হোক না কেন, তার বংশের লোক তাকে ফিরাতে যতই চেষ্টা করুক না কেন এবং দুনিয়ার লোক তার যতই বিরোধিতা করুক না কেন, সে তাদের কারো পরোয়া করবে না। কারণ সে প্রত্যেককেই এই একমাত্র জবাব দিবে, 'বাঃ আমি তো একমাত্র আল্লাহ তাআলারই বান্দাহ—তোমাদের কারো বান্দাহ নই আর আমি রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি—তোমার ওপর ঈমান আনিনি।" কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ ও রাসূলের যদি এটা হুকুম হয়ে থাকে তবেই হোক না, আমার অন্তর তা মানে না ; অথবা তাতে আমার ক্ষতি হবার আশংকা আছে ; কাজেই আমি আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম ছেড়ে আমার নিজের মতে চলবো —তাহলে এমন ব্যক্তির মনে ঈমানের নাম গন্ধও অবশিষ্ট থাকবে না। সে মু'মিন নয়—বরং মুনাফিক ; মুখে মুখে যদিও সে কেবল আল্লাহর বান্দাহ ও নবীর অনুসরণকারী হবার দাবী করে ; কিন্তু আসলে সে নিজের নফসের বান্দাহ আর তার নিজের মতেরই অনুসরণকারী ;

অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি বলে যে, আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম যাই হোক না কেন ; কিন্তু অমুক নিয়ম যেহেতু বাপ-দাদার কাল হতে চলে এসেছে,

সুতরাং তাকে কেমন করে ছাড়া যায় ? অথবা অমুক নিয়ম তো আমার বংশ বা গোত্রে আবহমানকাল হতে চলে এসেছে, আজ আমি এর বিপরীত কেমন করে করবো ? তাহলে এমন ব্যক্তিকেও ঐ মুনাফিকের দলে গণ্য করতে হবে। নামায পড়তে পড়তে তার কপালে যতই দাগ পড়ুক না কেন, আর প্রকাশ্যে সে যতই ধার্মিকের বেশ ধারণ করে থাকুক না কেন ; কিন্তু আসলে সে একজন মুনাফিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর কারণ এই যে, ধর্মের মূল তত্ত্ব তার মনে মোটেই স্থান পায়নি—তার মন খাঁটিভাবে ইসলামকে কবুল করে না। শুধু রুকূ'-সিজদাহ বা রোযা ও হজ্জকে 'দ্বীন ইসলাম' বলা হয় না। আর মানুষের বাহ্যিক বেশকে মুসলমানের মত করে নিলে 'দ্বীন' পালন করা হয় না। বরং আসলে 'দ্বীন' বা ধর্ম বলা হয় আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করাকে। যে ব্যক্তি নিজের জীবনের সমস্ত কাজ-কারবারে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে তার মনে প্রকৃতপক্ষে 'দ্বীন'-এর নাম গন্ধও বর্তমান নেই। তার নামায, রোযা এবং তার পরহেযগারী ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অনুরূপভাবে কোন মানুষ যদি আল্লাহ এবং তাঁর নবীর হেদায়াতের প্রতি বেপরোয়া হয়ে বলে যে, যেহেতু ইউরোপীয় বা আমেরিকান জাতির মধ্যে অমুক জিনিসের খুব প্রচলন আছে এবং তারা উন্নতি লাভ করেছে, অতএব তা আমাদেরও গ্রহণ করা উচিত ; কিংবা অমুক জাতি অমুক কাজ করেছে, অমুক বড় লোক একথা বলেছেন, কাজেই তা আমাদেরও পালন করা কর্তব্য, তাহলে এমন ব্যক্তির ঈমান আছে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। ঈমান থাকলে এসব কথা কেউ বলতে পারে না। বাস্তবিকই যদি মুসলমান হয়ে থাকেন এবং মুসলমানই থাকতে চান, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের বিপরীত যে কথাই হবে তাই দূরে নিক্ষেপ করতে হবে। এরূপ করতে না পারলে ইসলামের দাবী করা কারো পক্ষে শোভা পায় না। 'আল্লাহ ও রাসূলকে স্বীকার করি' বলে মুখে দাবী করা আর জীবনের সমস্ত কাজ-কারবারে সবসময়ই আল্লাহ ও রাসূলের কথাকে বাদ দিয়ে দুনিয়ার লোকদেরকে অনুসরণ করা—এটা না ঈমান না ইসলাম, এর নাম মুনাফিকী ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

পবিত্র কুরআনের ১৮শ পারায় আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

لَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ط وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ط وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ○ وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ

بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○ وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ○ اَفِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ط بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○ (النور : ٤٦-٥٢)

"আমি হক ও বাতিলের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যকারী আয়াতসমূহ নাযিল করে দিয়েছি। আল্লাহ যাকে চান এ আয়াতের সাহায্যে তাকে সোজা পথ দেখিয়ে দেন। লোকেরা বলে আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা (তাঁদের) আনুগত্য স্বীকার করছি ; কিন্তু পরে তাদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক আনুগত্য করা ছেড়ে দেয়। এ শ্রেণীর লোকেরা ঈমানদার নয়। তাদের কাজ-কারবারের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার আইন অনুসারে ফায়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে ডাকা হয় তখন কিছু লোক অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। কিন্তু আল্লাহর আইনের ফায়সালা যদি তাদের মনের মত হয় তবে অবশ্য তা স্বীকার করে নেয়। তাদের মনের মধ্যে কি রোগ আছে ? না তারা শুধু অকারণ সন্দেহের মধ্যে ডুবে রয়েছে ? অথবা তাদের এই ভয় আছে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তাদের 'হক' নষ্ট করবেন ? কারণ যাই হোক, তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করছে। প্রত্যেক ঈমানদার লোকের নিয়ম এই যে, আল্লাহর আইন অনুসারে বিচার করার জন্য যখন তাদেরকে ডাকা হয় তখন তারা 'আমরা শুনেছি এবং তা অনুসরণ করি' বলে মাথা নত করে দেয়। বাস্তবিক পক্ষে এ শ্রেণীর লোকেরাই মুক্তি ও উন্নতি লাভ করতে পারে। আর যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম পালন করবে, আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাঁর নাফরমানী হতে ফিরে থাকবে কেবল তারাই সফলকাম হবে এবং মুক্তি পাবে।"–(সূরা আন নূর ঃ ৪৬-৫২)

এ আয়াতসমূহে ঈমানের যে পরিচয় দেয়া হয়েছে আপনারা তা একটু বিশেষভাবে বুঝতে চেষ্টা করুন। বস্তুত নিজেকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হেদায়াতের সামনে সোপর্দ করে দেয়ার নামই হচ্ছে ঈমান। সেখান হতে যে হুকুম আসে তার সামনে মাথা নত করে দাও। এর বিরোধী কোন কথা শুনবে

না—না নিজের মনের কথা, না বংশ ও পরিবারের কথা আর না দুনিয়ার লোকদের কথা। যে ব্যক্তির মনের মধ্যে এ গুণ বর্তমান থাকবে প্রকৃতপক্ষে সেই হবে মু'মিন ও মুসলমান। আর যার মধ্যে এ গুণ থাকবে না তাকে মুনাফিক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

আপনারা হয়তো শুনেছেন যে, আরব দেশে মদ পান করার প্রথা খুব বেশী প্রচলিত ছিল। নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই মদের জন্য একেবারে পাগল প্রায় ছিল। আসলে মদের প্রতি তাদের অন্তরে গভীর আকর্ষণ বর্তমান ছিল। এর প্রশংসা করে কত যে গযল-গীত তারা রচনা করেছিল, তার হিসেব নেই। মদের জন্য প্রাণ দিতেও তারা প্রস্তুত হতো। একথাও আপনারা জানেন যে, একবার মদের নেশা লাগলে তা দূর হওয়া বড়ই মুশকিল। মদখোর ব্যক্তিরা মদের জন্য প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু মদ ত্যাগ করতে পারে না। কোন মদখোর যদি মদ না পায় তবে তার অবস্থা কঠিন রোগীর অপেক্ষাও খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু যখন মদ নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাযিল হয়েছিল তখন কি অবস্থা হয়েছিল তা কি আপনারা কখনও শুনেছেন ? মদের জন্য পাগল জান দিতে প্রস্তুত সেই আরবরাই এ হুকুম পাওয়ার সাথে সাথে নিজেদের হাতেই মদের বড় বড় পাত্র ভেংগে ফেলেছিল। মদীনার অলিতে-গলিতে বৃষ্টির পানির মত মদ বয়ে গিয়েছিল। একটি মজলিসে কয়েকজন লোক একত্রে বসে মদ পান করছিল। হযরতের ঘোষণাকারী যখন তাদের কাছাকাছি গিয়ে বললো যে, মদ নিষিদ্ধ হয়েছে, তখন যার হাত যেখানে ছিল তা সেখানেই থেমে গেল আর একটুও কেউ অগ্রসর হলো না। যার হাতের পেয়ালা মুখের সাথে লেগেছিল, সে তখনই তা সরিয়ে নিলো। তারপর আর এক বিন্দু মদ তার উদরে প্রবেশ করতে পারেনি। এটাই হচ্ছে সত্যিকার ঈমানের পরিচয়। আর এটাকেই বলা হয় আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য।

ইসলামে ব্যভিচারের শাস্তি কত কঠিন তা তো আপনাদের অজানা নয়। তা হচ্ছে পিঠে একশত চাবুক। বস্তুত এর কল্পনা করলেও মানুষের শরীর শিহরে ওঠে। আর ব্যভিচারী বিবাহিত হলে তো তাকে একেবারে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। এ কঠিন শাস্তির নাম শুনলেই মানুষ ভয়ে কেঁপে ওঠে। কিন্তু যেসব লোকের খাঁটি ঈমান ছিল, অথচ ভুলবশত তাদের দ্বারা কোন ব্যভিচারের কাজ হয়ে গিয়েছিল, তাদের অবস্থা কিরূপ ছিল, তা কি আপনারা জানেন ? একজন লোক শয়তানের প্রতারণায় পড়ে ব্যভিচার করে বসলো। তার সাক্ষী কেউ ছিল না, আদালতে ধরে নিয়ে যাবারও কেউ ছিল না, পুলিশকে খবর দেয়ার মত লোকও কেউ ছিল না। কিন্তু তার মনের মধ্যে ছিল খাঁটি ঈমান। আর সেই ঈমান তাকে বললো—আল্লাহর আইনকে ভয় না করে যখন তুমি

নফসের খাহেশ পূর্ণ করেছ তখন তাঁর নির্দিষ্ট আইন মতে শাস্তি নিবার জন্য প্রস্তুত হও। কাজেই সে নিজেই হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর খেদমতে এসে হাযির হলো এবং নিবেদন করলো ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল ! আমি ব্যভিচার করেছি, আমাকে এর শাস্তি দিন।' হযরত (স) তখন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সেই ব্যক্তি আবার সেই দিকে গিয়ে শাস্তি দেয়ার জন্য অনুরোধ করলো এবং বললো, আমি যে পাপ করেছি আমাকে তার উপযুক্ত শাস্তি দিন। এটাকেই বলে ঈমান। এই ঈমান যার মধ্যে বর্তমান থাকবে, খোলা পিঠে একশত চাবুকের ঘা নেয়া এমন কি পাথরের আঘাত খেয়ে মরে যাওয়াও তার পক্ষে সহজ ; কিন্তু আল্লাহর নাফরমানী করে আল্লাহর সামনে হাযির হওয়া তার পক্ষে বড়ই কঠিন ব্যাপার।

আপনারা এটাও জানেন যে, দুনিয়ার মানুষের কাছে তার আত্মীয়-স্বজনই অতিশয় প্রিয়পাত্র হয়ে থাকে। বিশেষ করে পিতা-পুত্র-ভাই মানুষের এত প্রিয় যে, তাদের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতেও মানুষ প্রস্তুত হয়। কিন্তু আপনি একবার বদর ও ওহোদের যুদ্ধের কথা চিন্তা করে দেখুন যে, তাতে কে কার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। বাপ মুসলমানদের দলে, ছেলে কাফেরদের দলে, ছেলে একদিকে, পিতা অন্যদিকে, এক ভাই ইসলামের পক্ষে অন্য ভাই দুশমনের পক্ষে। একেবারে নিকটতম আত্মীয়গণ দু' দলে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আর এমনভাবে যুদ্ধ করেছে, যেন তারা কেউ কাউকে চিনেই না। কোন টাকা পয়সা কিংবা জায়গা জমি অথবা কোন ব্যক্তিগত শত্রুতার জন্য তারা যুদ্ধ করেনি। তারা নিজেদের রক্ত দান করে আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে শুধু আল্লাহ ও রাসূলের খাতিরেই যুদ্ধ করেছে। আর আল্লাহ ও রাসূলের জন্য বাপ-ভাই-ছেলে এবং বংশের সকলকেই অকাতরে কুরবান করার মত প্রচণ্ড মনোবল তাদের মধ্যে বর্তমান ছিল।

আপনাদের একথাও জানা আছে যে, ইসলাম আরব দেশের প্রায় প্রাচীন রসম-রেওয়াজকে একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিল। তখনকার যুগে সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান ছিল মূর্তি পূজা। এ প্রথা শত শত বছর ধরে চলে আসছিল। কিন্তু ইসলাম সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলো, এ মূর্তিগুলো পরিত্যাগ কর। মদ পান, ব্যভিচার, জুয়া, চুরি, ডাকাতি আরব দেশের নিত্যকার ঘটনা ছিল। ইসলাম বললো এসব ছাড়তে হবে। আরব দেশের নারীরা একেবারে খোলাখুলিভাবে চলাফিরা করতো। ইসলাম আদেশ করলো, এরূপ চলতে পারবে না পর্দার ব্যবস্থা কর। মেয়েদেরকে সেখানে সম্পত্তির অংশ দেয়া হতো না। ইসলাম ঘোষণা করলো, পুরুষদের মত মেয়েরাও সম্পত্তির অংশ পাবে। পালিত পুত্রকে সেখানে ঠিক আপন ঔরষজাত পুত্রের মত মনে করা হতো। ইসলাম বললো

এটা হতে পারে না। পরের ছেলে পালন করলেই একেবারে নিজের ঔরষজাত সন্তানের মত হয়ে যায় না। এমনকি পালিত পুত্র তার স্ত্রীকে তালাক দিলে তাকে বিয়েও করা যেতে পারে। মোটকথা, এ সমস্ত পুরাতন রসমকে সেখানে একটি একটি করে চুরমার করে দেয়া হয়েছিল।

যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছিল, তখন তারা কিভাবে কাজ করেছিল তা কি আপনারা জানেন ? শত শত বছর ধরে যেসব মূর্তিকে তারা এবং তাদের বাপ-দাদারা পূজা করেছে, যেসবের সামনে নানা প্রকারের ভেট ও ভোগ হাযির করেছে এবং যেগুলোর সামনে মাথা ঠেকিয়ে সিজদা করেছে, ঈমানদার ব্যক্তিগণ তা নিজেদেরই হাতে এক একটা করে চূর্ণ করে ফেলেছে। শত শত বছর ধরে যেসব বংশীয় রীতি-নীতি ও রসম-রেওয়ায চলে আসছিল তা সবই তারা পরিত্যাগ করেছিল ; যেসব জিনিসকে তারা মহান ও পবিত্র বলে ধারণা করতো, আল্লাহর হুকুম পেয়েই তারা তাকে পায়ের তলে দলিত করলো। যেসব জিনিস তারা ঘৃণা করতো আল্লাহর হুকুম পাওয়া মাত্রই তাকে ভাল মনে করে গ্রহণ করতে লাগলো। চিরকাল যেসব জিনিসকে পাক ও পবিত্র মনে করা হতো, আল্লাহর বিধান মত সেই সবকে অপবিত্র মনে করতে শুরু করলো। আর যেসব জিনিসকে অপবিত্র মনে করতো, সহসা তা পবিত্র হয়ে গেল। যেসব কাফেরী চালচলনে তারা আরাম ও সুখ মনে করতো, আল্লাহর হুকুম পাওয়া মাত্রই তা সবই ছেড়ে দিয়েছিল এবং ইসলামের যেসব হুকুম পালন করা মানুষের পক্ষে কষ্টকর বলে মনে হতো তারা সেইসবকে সানন্দে কবুল করে নিলো। এরই নাম ঈমান এবং একেই বলা হয় ইসলাম। কিন্তু ভেবে দেখুন আরব দেশের লোকেরা যদি তখন তাদের বাপ-দাদাদের মত বলতো, অমুক অমুক আমরা মানব না, কারণ এতে আমাদের ক্ষতি হবে— অমুক কাজ আমরা নিশ্চয় করবো কারণ বাপ-দাদার কাল হতেই এটা চলে এসেছে এবং রোম দেশের লোকদের কিংবা ইরান দেশের লোকদের অমুক কাজ আমাদের খুব ভাল লাগে বলে তা আমরা ছাড়তে পারবো না। এরূপে ইসলামের এক একটা হুকুম বাতিল করে দিত তাহলে দুনিয়ায় এখন একজন মুসলমানও থাকতো কি ?

কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ (ال عمران : ٩٢)

"তোমাদের প্রিয় জিনিসগুলোকে যদি তোমরা আল্লাহর জন্য কুরবানী না কর তাহলে তোমরা প্রকৃত কল্যাণ কিছুতেই লাভ করতে পারবে না।"

–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২)

এ আয়াতটিই ইসলাম ও ঈমানের মূল কথা। ইসলামের আসল দাবী হচ্ছে, তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দাও। জীবনের সব রকমের কাজ-কারবারেই আপনারা দেখতে পাবেন যে, আল্লাহর হুকুম একদিকে আপনাকে ডাকে, আর আপনাদের নফস ডাকে এর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। আল্লাহ এক কাজের হুকুম করেন অথচ আপনার নফস সে কাজে আপনার ভয়ানক কষ্ট কিংবা ক্ষতি হবে বলে প্ররোচিত করে। আল্লাহ এক কাজ করতে নিষেধ করেন, কিন্তু আপনার নফস তাকে অত্যন্ত মজাদার উপকারী জিনিস মনে করে তা ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয় না। প্রত্যেক কাজেই আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকে একদিকে আর সারা দুনিয়ার সুখ-সুবিধার আকর্ষণ আপনাকে ডাকতে থাকে সম্পূর্ণ অন্যদিকে। মোটকথা জীবনের প্রত্যেক পদেই মানুষের সামনে দু'টি পথ এসে পড়ে ; একটি ইসলামের পথ, অপরটি কুফর ও মুনাফিকীর পথ। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রত্যেক জিনিসকে পদাঘাত করে একমাত্র আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা নত করে দেবে, মনে করতে হবে যে, কেবল সেই ব্যক্তিই ইসলামের পথ ধরেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমের ওপর পদাঘাত করে নিজের মনের বা দুনিয়ার খুশী চরিতার্থ করবে, বুঝতে হবে যে, সে কাফেরী এবং মুনাফিকীর পথ গ্রহণ করেছে।

বর্তমান কালের মানুষ সম্পূর্ণ সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করেছে। তারা ইসলামের সরল নিয়মগুলো তো অত্যন্ত আনন্দের সাথে স্বীকার করে, কিন্তু কুফর ও ইসলামের প্রকৃত মোকাবিলার সময় নিজেদের গতি পরিবর্তন করে ফেলে। ইসলামের বড় বড় দাবীদার লোকদের মধ্যেও এ রকম দুর্বলতা রয়েছে। ইসলাম ! ইসলাম ! করে তারা চীৎকার তো খুবই করে, ইসলামের তা'রীফ করতে গিয়েও তাদের মুখে খৈ ফোটে আর সে জন্য লোক দেখানো কাজও তারা যথেষ্ট করে, কিন্তু যে ইসলামের তারা এত তা'রীফ করে থাকে, সকলে মিলিত হয়ে সেই ইসলামের পরিপূর্ণ বিধানকে নিজেদের ওপর জারী করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানালে তারা অমনি বলে উঠে ঃ ঐ কাজ সহজ নয়, এতে নানা প্রকারের কষ্ট আছে কিংবা এখন তা হতে পারে না। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইসলাম একটা সুন্দর খেলনা মাত্র। তাকে তাকের ওপর উঠিয়ে রেখে দিলে এর সৌন্দর্য দেখা যায়। মুখে এর খুবই তা'রীফ করা যেতে পারে, কিন্তু নিজের ও পরিবারের লোকজনের ওপর, আত্মীয়-স্বজনের ওপর, নিজেদের কাজ-কারবারের ওপর তাকে একটা পরিপূর্ণ আইন হিসেবে জারী করার নাম নেয়া তাদের মতে একটা অপরাধ। আমাদের আজকালকার ধার্মিক বলে পরিচিত ব্যক্তিদের অবস্থা হয়েছে এই---তারপর দুনিয়ার অন্য লোকদের কথা আর কি বলা যায় ? মনে রাখবেন, ঠিক এ কারণেই আজ আমাদের নামায,

রোযা, কুরআন তেলাওয়াত ও শরীয়াতের প্রকাশ্য অনুসরণের মধ্যে পূর্বের সেই প্রভাব আর বর্তমান নেই এবং সে জন্যই তাতে আমরা বাস্তব জীবনে কোন ফলই লাভ করতে পারছি না। কারণ প্রাণটাই যখন না থাকে, তখন প্রাণহীন দেহটা আর কি সুফল দেখাতে পারে ?

ইসলামের নির্ভুল মানদণ্ড

আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কিতাবে বলেছেন ঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ○ (الانعام : ١٦٢-١٦٣)

"(হে মুহাম্মাদ !) বল, আমার নামায, আমার যাবতীয় ইবাদাত অনুষ্ঠান এবং আমার জীবন ও মৃত্যু—সবকিছুই আল্লাহর জন্য ; যিনি সারা-জাহানের মালিক ও প্রভু। তাঁর কেউ শরীক নেই। এরূপ বলার জন্যই আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর সর্বপ্রথম আমি তাঁরই সামনে আনুগত্যের মস্তক নত করে দিচ্ছি।"—(সূরা আল আনআম ঃ ১৬২-১৬৩)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ -

"আল্লাহর জন্য যে ভালবাসলো, আল্লাহরই জন্য যে দুশমনী করলো, আল্লাহরই জন্য যে দান করলো এবং আল্লাহরই জন্য দেয়া বন্ধ করলো, সে তার ঈমানকে পূর্ণ করলো। অর্থাৎ সে কামিল ঈমানদার হলো।

প্রথমে আমি যে আয়াতের উল্লেখ করেছি তা হতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম মানুষকে তার সমস্ত দাসত্ব-আনুগত্যের এবং নিজের জীবন ও মৃত্যুকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিষ্ঠা সহকারে উৎসর্গ করার এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার নির্দেশ দিচ্ছে। অন্য কথায় মানুষ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব ও আনুগত্য করবে না। তার জীবন-মৃত্যুও আল্লাহ ছাড়া আর কারো উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হবে না।

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবী করীম (স)-এর ভাষায় যা পেশ করা হয়েছে তাতে জানতে পারা যায় যে, মানুষের ভালবাসা, শত্রুতা এবং নিজের বৈষয়িক জীবনের সমস্ত কাজ-কারবার ও লেন-দেন একান্তভাবে আল্লাহরই জন্য উৎসর্গীকৃত হওয়া মূল ঈমানের ঐকান্তিক দাবী। তা না হলে উচ্চমর্যাদা লাভ তো দূরের কথা ঈমানই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এ ব্যাপারে যতটুকু অপূর্ণতা থাকবে মানুষের ঈমানের ঠিক ততটুকুই অপূর্ণতা থেকে যাবে। পক্ষান্তরে এদিক দিয়ে মানুষ যত পূর্ণতা সহকারে আল্লাহর কাছে সমর্পিত চিত্ত হতে পারবে তার ঈমানও ততটুকুই পূর্ণ হবে।

অধিকাংশ লোকের ধারণা এই যে, নিজেকে সর্বোতভাবে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দেয়া শুধু উচ্চ মরতবা বা মর্যাদা লাভের জন্যই প্রয়োজন, শুধু ঈমান ও ইসলামের জন্য কারোও মধ্যে এতদূর উন্নতভাবের সৃষ্টি হওয়া কোন জরুরী শর্ত নয়। অন্য কথায় তাদের ধারণা এই যে, উক্ত রূপ ভাবধারার সৃষ্টি না হলেও মানুষ ঈমানদার মুসলমান হতে পারে। কিন্তু এরূপ ধারণা মূলের দিক দিয়েই ভুল আর সাধারণ মানুষ আইনগত ইসলাম ও আল্লাহর কাছে গণ্য প্রকৃত ইসলামের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না বলেই এরূপ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

ফিকাহ সম্মত ও আইনগত ইসলামে মানুষের মনের প্রকৃত অবস্থা দেখা হয় না—আর তা দেখা সম্ভবও নয়। বরং মানুষের মৌখিক স্বীকৃতির বাস্তব প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি জরুরী বাহ্যিক নিদর্শন বর্তমান থাকার ওপরই লক্ষ্য আরোপ করা হয়। কেউ যদি মুখে আল্লাহ, রাসূল, কুরআন, পরকাল ও অন্যান্য জরুরী বিষয়ে ঈমান রয়েছে বলে স্বীকার করে অতপর এ মৌখিক স্বীকারোক্তির বাস্তব প্রমাণের জরুরী শর্তগুলো পূরণ করে তবে তাকে ইসলামের সীমার মধ্যে গণ্য করা,হবে। তাকে মুসলমান মনে করেই তার সাথে সকল কাজ-কর্ম করা হবে। কিন্তু মূলত এসব বিষয়ই শুধু এই দুনিয়ার জন্য সীমাবদ্ধ এবং এটাতে শুধু বৈষয়িক দৃষ্টিতে মুসলিম সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ও তমুদ্দুনিক ভিত্তিই লাভ হয়ে থাকে। এরূপ স্বীকারোক্তির সাহায্যে যারা মুসলিম সমাজে প্রবেশ করবে তারা সকলেই মুসলিম বলে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে কাউকে কাফের বলা যাবে না। তারা পরস্পরের কাছ হতে শরীয়াত সম্মত নৈতিক ও সামাজিক অধিকার লাভ করবে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারবে, মীরাস বন্টন হবে এবং অন্যান্য সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

কিন্তু পরকালে মানুষের মুক্তি লাভ, তার মুসলিম ও মু'মিন রূপে গণ্য হওয়া এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের মধ্যে শামিল হওয়া কেবলমাত্র উক্ত রূপ আইনগত ও মৌখিক স্বীকৃতি দ্বারা সম্ভব নয়, বরং মানুষের মনে স্বীকৃতি আল্লাহর দিকে অন্তরকে সমাহিত করা এবং ঐকান্তিক আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে নিজেকে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেয়াই এর জন্য অপরিহার্য শর্ত। পৃথিবীতে মৌখিক স্বীকৃতির মূল্য হয় শুধু কাযীর দরবারে ও সাধারণ মানুষ বা মুসলমানদের মধ্যে ; কেননা তারা কেবল বাহিরকেই দেখতে পারে। কিন্তু আল্লাহ দেখেন মানুষের মন বা অন্তরকে—তার ভিতরকার আসল অবস্থা ও ভাবধারাকে। আল্লাহ মানুষের ঈমানের পরিমাপ করেন। মানুষ তার জীবন ও মৃত্যুকে তার যাবতীয় কৃতজ্ঞতা, বন্ধুত্ব, আনুগত্য, দাসত্ব ও গোটা

জীবনের কর্মধারাকে আল্লাহরই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেছে, না অপর কারোও জন্য, আল্লাহর দরবারে ঠিক এ মাপকাঠিতেই মানুষকে যাচাই করা হবে। এ যাচাইয়ের ফলে যদি প্রমাণিত হয় যে, সে এসব কিছু একমাত্র আল্লাহরই জন্য উৎসর্গ করেছিল তবে সে মুসলিম এবং মু'মিন বলে গণ্য হবে, আর অন্য কারোও জন্য উৎসর্গ করে থাকলে সে না মুসলিমরূপে গণ্য হবে, না মু'মিনরূপে। এ দৃষ্টিতে যে যতদূর কাঁচা ও অপরিপক্ক প্রমাণিত হবে তার ঈমান এবং ইসলামও ঠিক ততদূরই অপরিপক্ক হবে। .... দুনিয়ায় সে অতিবড় মুসলিমরূপে গণ্য হলেও এবং সেখানে তাকে অতুল্য মর্যাদা দান করা হলেও আল্লাহর দরবারে তার কোনই গুরুত্ব হবে না। আল্লাহ যা কিছু আপনাকে দিয়েছেন, আপনি তার সবকিছুই আল্লাহর জন্য—আল্লাহরই নির্দেশিত পথে প্রয়োগ করলেন কি না শুধু এ দিক দিয়েই আল্লাহর কাছে মানুষের মূল্য স্থির হবে। আপনি এরূপ করে থাকলে আপনাকে ঠিক অনুগত ও বন্ধুত্বের প্রাপ্য মর্যাদা দেয়া হবে। আর কোন জিনিস যদি আপনি আল্লাহর বন্দেগী হতে দূরে রাখেন, আল্লাহর নির্দেশিত পথে প্রয়োগ না করেন তবে আপনার মুসলিম দাবী করার—অর্থাৎ নিজেকে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত করার মৌখিক উক্তি একেবারেই মিথ্যা প্রমাণিত হবে এবং এই মিথ্যা উক্তি দ্বারা দুনিয়ার লোকদেরকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব হলেও হতে পারে ; তারা আপনার এ মৌখিক উক্তি দ্বারা প্রতারিত হয়ে মুসলিম সমাজের মধ্যে আপনাকে স্থান দিতে এবং মুসলিম হিসেবে সকল সুযোগ-সুবিধা দান করতেও পারে। কিন্তু আল্লাহ কখনও তাতে প্রতারিত হবেন না এবং আপনাকে তাঁর বিশ্বস্ত ও অনুগত বন্ধুদের মধ্যে গণ্য করবেন না।

আইনগত ইসলাম ও প্রকৃত ইসলামের এ পার্থক্যের যে ব্যাখ্যা দান করা হলো, তা গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যায় যে, এর ফলাফল কেবল পরকালেই ভিন্ন ভিন্ন হবে না ; বরং দুনিয়ায়ও এ পার্থক্যের বাস্তব ফল ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য। এজন্য দুনিয়ায় যত মুসলমান এসেছে এবং যত মুসলমান এখন দুনিয়ায় রয়েছে তাদের সকলকে উপরোক্ত দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

এক ধরনের মুসলমান দেখা যায় যারা আল্লাহ ও রাসূলকে স্বীকার করে ইসলামকে শুধু একটি ধর্ম হিসেবে মেনে নেয় ; কিন্তু এ ধর্ম নিজেদের সামগ্রিক জীবনের শুধু একটি অংশ বা একটি বিভাগের মর্যাদাই দেয়—তার অধিক নয়। ফলে এই বিশেষ অংশ ও বিভাগে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস পূর্ণ মাত্রায় স্থাপন করা হয়। ইবাদাত-বন্দেগীর অনুষ্ঠানসমূহ যথারীতি পালন করা হয়। তাসবীহ পাঠ ও যিকির-আযকার করা হয়। পানাহার ও কোন কোন সামাজিক ব্যাপারে পরহেযগারীও অবলম্বন করা হয় ; ধর্ম পালন বলতে যা

করণীয় তা প্রায় সবই করা হয়। কিন্তু এ অংশ ও বিভাগ ছাড়া জীবনের অন্যান্য দিকে ও বিভাগে মুসলমানী কাজসমূহ করার কোন সুযোগই দেয়া হয় না ; সেখানে ভালবাসা হলে তা হয় নিজের প্রতি, নিজ স্বার্থের প্রতি, দেশ ও জাতি কিংবা অন্য কোন জিনিসের প্রতি আর দুশমনী বা যুদ্ধ করলেও তা করা হয় অনুরূপ কোন বৈষয়িক স্বার্থের জন্য। তাদের লেন-দেন, তাদের কাজ-কারবার, সম্পর্ক-সম্বন্ধ, তাদের সন্তান-সন্ততি, বংশ-পরিবার, দেশ ও সমাজ এবং অন্যান্য লোকের সাথে ব্যবহার ইত্যাদি সবই হয়ে থাকে দ্বীন ইসলামকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে নিছক বৈষয়িক দৃষ্টিতে। জমিদার, ব্যবসায়ী, শাসনকর্তা, সৈনিক যে যাই হোক না কেন, প্রত্যেকেই একজন স্বাধীন পেশাদার হিসেবে কাজ করে, মুসলমান হিসেবে নয়। এ দিক দিয়ে মুসলমানীকে বিন্দুমাত্র স্থান দেয় না। তারা মিলিত ও সমষ্টিগতভাবে যে তমুদ্দুনিক, শিক্ষামূলক ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় অংশ গ্রহণ করে তার ওপর তাদের মুসলমানীর আংশিক প্রভাব পড়লেও তার সাথে ইসলামের কোনই সম্পর্ক স্থাপিত হয় না।

দ্বিতীয় প্রকার মুসলমান দেখা যায়, যারা নিজেদের পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে, নিজেদের সমগ্র সত্তাকে ইসলামের কাছে সোপর্দ করে দেয়। তাদের জীবনের সমগ্র দিকেই তারা মুসলিমরূপে কর্তব্য সম্পাদন করে। তারা হয় মুসলিম পিতা, মুসলিম সন্তান, মুসলিম স্ত্রী, ব্যবসায়ী, জমির মালিক, মজুর, চাকর—যাই হোক না কেন, সর্বত্র মুসলিম হিসেবেই তাদের জীবন চালিত হয়, তাদের মনের ভাবধারা, আশা-আকাংখা, চিন্তা ও মতবাদ, তাদের রায় ও সিদ্ধান্ত, তাদের ঘৃণা ও ভালবাসা তাদের পসন্দ অপসন্দ সবকিছুই ইসলামী আদর্শের অনুসারেই হবে। তাদের মন ও মগযের ওপর তাদের চোখ ও কানের ওপর, তাদের উদর ও লজ্জাস্থানের ওপর, তাদের হাত-পা ও দেহের যাবতীয় অংগ-প্রত্যংগের ওপর সম্পূর্ণ রূপে ইসলামের আধিপত্য বিরাজ করবে। তাদের স্নেহ ভালবাসা বা শত্রুতা ইসলামের সীমালংঘন করবে না। কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে ইসলামের জন্যই করবে, কারো সাথে লড়াই করলে ইস-লামেরই জন্য লড়াই করবে, কাউকে কিছু দান করলে শুধু এ জন্যই দান করবে যে, এরূপ দান করা ইসলামের নির্দেশ। পক্ষান্তরে কাউকে কিছু দেয়া বন্ধ করলে তা ঠিক ইসলামের নির্দেশ অনুসারে বন্ধ করবে। তাদের এরূপ কর্মনীতি ব্যক্তিগত জীবনেই কার্যকর হবে না, তাদের সামগ্রিক জীবনেও সর্বতোভাবে ও সম্পূর্ণরূপে ইসলামেরই ভিত্তিতে স্থাপিত হবে। সমষ্টিগতভাবে তাদের সম্পূর্ণ সত্তাই হবে ইসলামের জন্য নিয়োজিত—ইসলামের জন্য উৎসর্গীকৃত। তাদের গোটা জাতীয় চরিত্র ও ভূমিকা ও তাদের কর্মতৎপরতা ইসলামের মূলনীতির বুনিয়াদে স্থাপিত ও পরিচালিত হবে।

এ দু' প্রকারের মুসলমান মূলত সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিরোধী। আইনের দৃষ্টিতে উভয় শ্রেণী একই উম্মাত তথা একই জাতির মধ্যে গণ্য হলেও এবং 'মুসলিম' শব্দটি উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হলেও প্রকৃত ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রথম প্রকারের মুসলমানের কোন কীর্তিই ইসলামের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য বা গৌরবের বস্তুরূপে পরিগণিত হয়নি। তারা এমন কোন কাজই করেনি, যা পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলামের কোন গৌরবময় প্রভাব বিস্তার করতে পারে। পৃথিবী এ ধরনের মুসলমানের কোন গুরুত্বই কোন দিন অনুভব করেনি। বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইসলামের পশ্চাদমুখী গতি এ ধরনের মুসলমানের দ্বারা এবং এদের কারণেই সম্ভব হয়েছে। মুসলিম সমাজে এই ধরনের মুসলমানদের সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণেই মানব জীবনের ওপর কুফরির কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়া এবং তার অধিক সীমাবদ্ধ ধর্মীয় জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করেই মুসলমানদের তুষ্ট হওয়া সম্ভব হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ কখনই এ ধরনের মুসলমান চাননি। এ ধরনের মুসলমান তৈরি করার জন্য তিনি নবীগণকে পৃথিবীতে পাঠাননি, এ ধরনের মুসলমান বানাবার জন্য তিনি কিতাব নাযিল করেননি। বস্তুত এ ধরনের মুসলমান দুনিয়ায় না থাকলেও বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ অভাব অনুভূত হতো না। আর তা পূরণের জন্য অহী নাযিল করার এ দীর্ঘস্থায়ী ধারা পরিচালনারও প্রয়োজন দেখা দিত না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যে ধরনের মুসলমান তৈরি করার জন্য নবী পাঠিয়েছেন ও কিতাব নাযিল করেছেন, আর যারা ইসলামের দৃষ্টিতে কোন মূল্যবান ও উল্লেখযোগ্য কার্যসম্পাদন করেছে এবং এখনও করতে সমর্থ তারা হচ্ছে শুধু দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলমান।

কেবল ইসলামের ব্যাপারেই একথা সত্য নয়। যারা নিজেদের নীতি ও আদর্শকে শুধু মৌখিক স্বীকৃতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখে ও তাকে জীবনের একটি পরিশিষ্টরূপে গণ্য করে এবং নিজেদের জীবন ও মৃত্যু অন্য কোন জিনিসের জন্য উৎসর্গ করে তাদের দ্বারা দুনিয়ার কোন আদর্শেরই পতাকা উন্নীত হতে পারে না। বর্তমান সময়েও একথার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। একটি আদর্শের প্রকৃত নিষ্ঠাবান অনুসারী কেবল তারাই হতে পারে যারা মন ও প্রাণ দিয়ে তার অনুসরণ ও তার খেদমতের কাজে আত্মসমর্পণ করে—যারা নিজেদের পূর্ণ ব্যক্তিসত্তাকে এরই জন্য উৎসর্গ করে এবং যারা নিজেদের অধিকারভুক্ত কোন জিনিসকে—নিজের প্রাণ ও সন্তানকে পর্যন্ত তা অপেক্ষা বেশী ভাল না বাসে। বস্তুত দুনিয়ায় এ ধরনের লোকদের দ্বারাই কোন বিশেষ আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করতে পারে। এজন্যই প্রত্যেকটি আদর্শ এ ধরনের লোকের প্রতীক্ষা করে।

অবশ্য একটি ব্যাপারে ইসলাম ও অন্যান্য আদর্শের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য আদর্শও মানুষের কাছে উল্লেখিত রূপ আত্মসমর্পণ, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও

আনুগত্যের দাবী করে বটে, কিন্তু মূলত দাবী করার তাদের কোনই অধিকার নেই। এটা বরং মানুষের ওপর তাদের একটি অন্যায় আবদার মাত্র। পক্ষান্তরে মানুষের প্রতি ইসলামের দাবী অত্যন্ত শাশ্বত ও স্বাভাবিক। একটি আদর্শ যেসব কারণে অন্যান্য মানুষের কাছে তার নিজের সমগ্র জীবন পূর্ণ ব্যক্তি সত্তাকে উৎসর্গ করার দাবী জানায়, মূলত সেসবের মধ্যে একটি জিনিসের জন্য মানুষ তার নিজের কোন জিনিসকে কুরবান করতে পারে না। কিন্তু ইসলাম যে আল্লাহর জন্য মানুষের কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার দাবী করে প্রকৃতপক্ষে সে জন্যই মানুষের উৎসর্গিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা সবই আল্লাহর। মানুষ নিজেই আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষের কাছে এবং মানুষের মধ্যে যা আছে, সবকিছুই আল্লাহর মালিকানা। মানুষ এ দুনিয়ায় যেসব জিনিস দ্বারা কাজ করে তাও আল্লাহর। কাজেই জ্ঞান-বুদ্ধি ও সুবিচারের দৃষ্টিতে এটাই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে যে, যা আল্লাহর তা আল্লাহরই পথে উৎসর্গ করতে হবে। অপরের জন্য কিংবা নিজ স্বার্থ ও ইপ্সিত বস্তুর জন্য মানুষ যে কুরবানী করে তা মূলত খিয়ানত - অন্যায় ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কিছু করলে তা নিশ্চয়ই খিয়ানত হবে না। কেননা আল্লাহর জন্য যা কিছুই উৎসর্গ করা হয়, তা দ্বারা মূলত আল্লাহরই হক আদায় করা হয়।

কিন্তু যারা বাতিল মতবাদ ও আদর্শ এবং নিজেদের মনগড়া ইলাহ ও প্রভুদের জন্য নিজেদের সবকিছু কুরবান করে এবং সে জন্য অবিচল ও দৃঢ়তা সহকারে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাদের কর্মতৎপরতা হতে মুসলমানদের শিক্ষাগ্রহণ করা আবশ্যক। বাতিলের জন্য যখন মানুষ এত নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করতে পারে তখন সত্যের জন্য যদি তার এক সহস্রাংশ ত্যাগ স্বীকার করা না হয় তবে তা কত পরিতাপের বিষয়।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস হতে ঈমান ও ইসলামের যে সঠিক মাপকাঠির সন্ধান পাওয়া যায়, তদনুযায়ী আমাদের প্রত্যেককেই আত্মপরীক্ষা করা কর্তব্য। আপনি যদি ইসলাম কবুল করার ও ঈমান আনার দাবী করেন তবে আপনার জীবন ও মৃত্যু একমাত্র আল্লাহর জন্য উৎসর্গীকৃত কিনা, তা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যাচাই করে দেখা বাঞ্ছনীয়। আপনি একমাত্র আল্লাহরই জন্য জীবিত কিনা, আপনার মন ও মস্তিষ্কের সমগ্র যোগ্যতা-ক্ষমতা, আপনার দেহ ও প্রাণের শক্তি, আপনার সময় ও শ্রম একমাত্র আল্লাহর মর্জী পূরণের জন্য এবং মুসলিম উম্মাতের দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োজিত কিনা তা বিশেষভাবে যাচাই করে দেখা কর্তব্য। আপনার বন্দেগী ও আনুগত্য আল্লাহরই জন্য কিনা, অন্যদিকে নফসের দাসত্ব এবং পরিবার, গোত্র, বন্ধু-বান্ধব ও সমাজ তথা সরকারের

বন্দেগী হতে আপনার জীবন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত কিনা, তাও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। আপনার পসন্দ-অপসন্দ আল্লাহর মর্জী অনুযায়ী নির্ধারিত কিনা তাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। আরও বিচার করে দেখুন, আপনি যাকে ভালবাসেন, স্নেহ করেন, তা কি একমাত্র আল্লাহর জন্য করেন ? .... যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন, তাও কি আল্লাহর জন্য করেন ? এ ঘৃণা ও ভালবাসায় আপনার নিজের কোন স্বার্থ কাজ করে না তো ? দেয়া না দেয়াও কি আল্লাহরই জন্য হচ্ছে ? নিজের উদর ও মন সহ দুনিয়ায় যাকে যা কিছু আপনি দেন, তা দিয়ে কি আপনি একমাত্র আল্লাহরই সন্তোষ পেতে চান ? পক্ষান্তরে আপনার না দেয়াও কি ঠিক আল্লাহরই জন্য হচ্ছে ? আপনি কি এজন্য দিচ্ছেন না যে, আল্লাহ তাআলা দিতে নিষেধ করেছেন ? এবং না দিয়ে কি আপনি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করছেন ? ... এরূপে সবকিছুই আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করার ভাবধারা যদি আপনি আপনার নিজের মধ্যে বর্তমান দেখতে পান তবে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করুন। কেননা আল্লাহ সত্যই আপনার ঈমানকে পূর্ণতা দান করেছেন। কিন্তু এদিক দিয়ে যদি আপনি আপনার মধ্যে কোন প্রকার অভাব অনুভব করেন, তবে তা দূর করার জন্য এখনই যত্নবান হোন, সকল চেষ্টা ও তৎপরতা এদিকে নিবদ্ধ করুন। কেননা এ অভাব পূরণের ওপরই আপনার ইহকালীন সাফল্য ও পরকালীন মুক্তি নির্ভর করে। দুনিয়ায় আপনি কোন মহাসম্পদ লাভ করলেও তা দ্বারা এ অভাব পূরণ হতে পারে না। কিন্তু এ অভাব যদি আপনি পূরণ করে নিতে পারেন, তবে দুনিয়ায় আপনি কিছু না পেলেও প্রকৃতপক্ষে আপনি কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না।

স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআন হাদীসের এ মাপকাঠিতে অপরকে যাচাই করার জন্য এবং তাকে মু'মিন কিংবা মুনাফিক অথবা মুসলিম কিংবা কাফের বলে ঘোষণা করার জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে নিজেকে বাঁচাবার জন্য এবং পরকালের বিচারালয়ের কাঠগড়ায় দাঁড়াবার পূর্বে এ দুনিয়ায় নিজের ত্রুটি জেনে তা সংশোধন করার জন্যই এ মাপকাঠি নির্ধারিত হয়েছে। দুনিয়ার মুফতি ও কাজী আপনাকে কি মনে করছেন সেই চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই, মহাবিচারক—গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুর একমাত্র জ্ঞাতা—আল্লাহ আপনাকে কি স্থান দেন তাই আপনাকে চিন্তা করতে হবে। দুনিয়ার আদমশুমারীর খাতায় আপনি মুসলিম রূপে গণ্য হয়েছেন দেখেই আপনার নিশ্চিত হয়ে বসে থাকা উচিত নয়। আল্লাহর দফতরে আপনার কি মর্যাদা দেয়া হচ্ছে সেই সম্পর্কে সতর্ক হওয়া আপনার কর্তব্য। সমগ্র পৃথিবী আপনাকে ঈমান ও ইসলামের সার্টিফিকেট দিলেও প্রকৃতপক্ষে আপনার কোন লাভ নেই। মূল বিচার যে আল্লাহর হাতে তাঁরই কাছে মুনাফিকের পরিবর্তে মু'মিন—অবাধ্যের পরিবর্তে অনুগত বান্দাহ রূপে গণ্য হওয়াই আপনার জীবনের প্রকৃত সাফল্য।

আল্লাহর হুকুম পালন করা দরকার কেন ?

পূর্বেই কয়েকটি প্রবন্ধে আপনাদেরকে আমি বার বার একথাই বলেছি যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মেনে চলার নামই ইসলাম এবং মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের খাহেশ, বাপ-দাদার কুসংস্কার, দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও লোকদের আদেশ অনুযায়ী চলা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউই মুসলমান হতে পারবে না।

কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম পালন করার ওপর এত জোর কেন দেয়া হয়, এখানে আমি সেই কথারই বিস্তারিত আলোচনা করবো। একজন মানুষ জিজ্ঞেস করতে পারে যে, আল্লাহর আনুগত্য করার দরকারটা কি, তিনি কি আমাদের আনুগত্য পাবার মুখাপেক্ষী ? আর সে জন্যই কি আল্লাহ আমাদের কাছে তাঁর নিজের এবং তাঁর রাসূলের হুকুম পালন করে চলার দাবী করছেন ? দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা যে রকম নিজেদের হুকুমাত চালাবার জন্য লালায়িত, আল্লাহ কি তেমন লালায়িত ?—দুনিয়ার জনগণ যেমন বলে যে, আমার প্রভুত্ব স্বীকার কর আল্লাহও কি তেমনি বলেন ? এখন একথারই আমি জবাব দিতে চাই।

আসল কথা এই যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের কাছে তার আনুগত্য দাবী করেন তাঁর নিজের স্বার্থের জন্য নয়। বরং এ মানুষেরই কল্যাণের জন্য তিনি তা চাচ্ছেন। আল্লাহ দুনিয়ার রাজা-বাদশাহর মত নন, দুনিয়ার রাজা ও রাজ-কর্মচারীগণ তো শুধু নিজেদেরই স্বার্থের জন্য লোকদের ওপর তাদের হুকুমাত চালায়—লোকদেরকে নিজেদের মর্জীর গোলাম বানাতে চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কোন স্বার্থ নেই, তিনি সকল রকম স্বার্থের নীচতা হতে পবিত্র। আপনার কাছ থেকে টাকা আদায় করার কোন দরকার আল্লাহর নেই। প্রাসাদ তৈরি করা, মোটর গাড়ী ক্রয় করা কিংবা আপনাদের টাকা-পয়সা, বিলাস-ব্যসন বা আরাম-আয়েশের সামগ্রী সংগ্রহ করার কোন প্রয়োজনই তাঁর নেই। তিনি পাক তিনি কারো মোহতাজ বা মুখাপেক্ষী নন। দুনিয়ার সবকিছুই তাঁর, সমস্ত ধন-সম্পদের তিনিই একমাত্র মালিক। তিনি আপনাদেরকে তাঁর হুকুম মেনে চলতে এবং তাঁর আনুগত্য করতে বলেন, শুধু আপনাদেরই মংগলের জন্য—আপনাদেরই কল্যাণ করতে চান তিনি। তিনি মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' করে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর এ শ্রেষ্ঠ মাখলুক বা বিরাট সৃষ্টি মানুষেরা শয়তানের গোলামী করুক, কিংবা অন্য মানুষের দাস হোক অথবা দুনিয়ার সামান্য ও হীন জিনিসের সামনে মাথা নত করুক এটা তিনি

মাত্রই পসন্দ করেন না। তিনি যে মানুষকে দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি বানিয়েছেন, তারা মূর্খতার অন্ধকারে ঘুরে মরুক এবং পশুর মত নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী চলে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাণীতে পরিণত হোক — এটাও তাঁর মনপূত নয়। এজন্যই তিনি মানুষকে বলেছেন ঃ "হে মানুষ ! তোমরা আমারই হুকুম মেনে চল— কেবল আমারই নির্দেশ মত চল—কেবল আমারই আনুগত্য কর। আমি আমার নবীর মারফতে তোমাদের কাছে যে জ্ঞানের আলো পাঠিয়েছি, তা গ্রহণ কর; তবে তোমরা সরল ও সোজা পথের সন্ধান পেতে পারবে। আর এ সোজা পথে চলে তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বত্রই সম্মান লাভ করতে পারবে।"

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَاانْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۗ اُولٰٓـئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○(البقرة : ٢٥٦-٢٥٧)

"দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে কোন জোর-যবরদস্তি নেই। হেদায়াতের সোজা পথ গোমরাহীর বাঁকা পথ হতে ভিন্ন করে একেবারে পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে। এখন তোমাদের মধ্যে যারাই মিথ্যা খোদা এবং ভ্রান্ত পথে চালনাকারীদেরকে ত্যাগ করে কেবল এক আল্লাহর প্রতিই ঈমান আনবে, তারা এত মযবুত রজ্জু ধারণ করতে পারবে, যা কখনই ছিঁড়ে যাবার নয়। আল্লাহ সবকিছুই শুনতে পান এবং সবকিছুই তিনি অবগত আছেন। যারা ঈমান আনলো তাদের রক্ষাকারী হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা, তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে মুক্তি দান করে আলোকের উজ্জ্বলতম পথে নিয়ে যান। আর যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদেরকে রক্ষা করার ভার তাদের মিথ্যা খোদা ও গোমরাহকারী নেতাদের ওপর অর্পিত হয়। তারা তাদেরকে আলো হতে পথভ্রষ্ট অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। তারা দোযখে যাবে ও সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।"-(সূরা বাকারা ঃ ২৫৬-২৫৭)

আল্লাহকে ছেড়ে অন্যান্য মিথ্যা খোদার হুকুম মানলে ও তাদের আনুগত্য করলে মানুষ কেন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়, আর কেবল আল্লাহর আনুগত্য করলেই কেন আলোকোজ্জ্বল পথ লাভ করা যাবে তা আপনাদের বিচার করে দেখা আবশ্যক।

আপনারা দেখছেন, দুনিয়ায় আপনাদের জীবন অসংখ্য রকম সম্পর্কের সাথে জড়িত। আপনাদের প্রথম সম্পর্ক আপনাদের দেহের সাথে। হাত, পা, কান, চোখ, জিহ্বা, মন, মগয এবং পেট সমস্তই আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে দান করেছেন আপনাদের খেদমত করার জন্য। কিন্তু এগুলো দ্বারা আপনারা কিভাবে খেদমত নিবেন, তা আপনাদেরই বিচার করতে হবে। পেটকে কি খেতে দেবেন এবং কি খেতে দিবেন না ; হাত দ্বারা কি করবেন, কি করবেন না ; পা দু'খানিকে কোন পথে চালাবেন কোন পথে চালাবেন না ; চোখ ও কান দ্বারা কি কাজ করাবেন আর কি কাজ করাবেন না ; মনে কোন কথার খেয়াল রাখবেন আর কোন কথার রাখবেন না ; মন-মগয দিয়ে কোন কথার চিন্তা করবেন আর কোন কথার চিন্তা করবেন না—এসবই আপনাকে সর্বদিক চিন্তা করে ঠিক করতে হবে। এরা সবাই আপনার চাকর এদের দ্বারা আপনি ভাল কাজও করাতে পারেন, আর পাপের কাজও করাতে পারেন। এরা আপনার কাজ করে আপনাকে উচ্চতম মর্যাদার মানুষেও পরিণত করতে পারে আবার এরা আপনাকে জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট ও নীচ জীবও বানিয়ে দিতে পারে।

অতপর আপনার নিকটতম সম্বন্ধ আপনার ঘরের লোকদের সাথে—বাপ-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সকলের সাথে—আপনাকে রাত-দিন সকল সময়ের জন্য সম্বন্ধ রেখে চলতে হয়। কিন্তু এদের সাথে আপনি কিরূপ ব্যবহার করবেন, তা আপনাকে বিশেষভাবে চিন্তা করেই ঠিক করতে হবে। এদের ওপর আপনার কি 'হক' (অধিকার) আছে এবং আপনার ওপরই বা এদের কি অধিকার আছে, তা আপনার ভাল করে জেনে নেয়া দরকার। মনে রাখবেন, এদের সাথে আপনার ব্যবহার সুষ্ঠু হওয়ার ওপরই আপনার দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-শান্তি ও সফলতা নির্ভর করে। যদি এদের সাথে আপনি ভুল ব্যবহার করেন তবে দুনিয়াকেই আপনি নিজের জন্য জাহান্নামে পরিণত করবেন। আর শুধু দুনিয়াই নয়, পরকালেও আপনাকে আল্লাহর কাছে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে।

এরপর আসে দুনিয়ার অন্যান্য অগণিত লোকের সাথে আপনার সম্পর্কের কথা। অনেক লোক আপনার পাড়া-পড়শী, বহুলোক আপনার বন্ধু, কতগুলো লোক আপনার দুশমন। বহুলোক আপনার খেদমত করে এবং আপনি বহুলোকের খেদমত করেন। আপনি কারোও কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেন এবং কাউকে আপনি কিছু দেন। কেউ আপনার ওপর ভরসা করে তার কাজের ভার আপনাকে দেয়, আবার আপনি কারোও ওপর ভরসা করে আপনার কাজের ভার তার ওপর অর্পণ করেন। কেউ আপনার বিচারক আর আপনি অন্য কারো বিচারক। আপনি কাউকে হুকুম দেন আবার আপনাকে কেউ হুকুম দেয়। ফলকথা, কত সংখ্যক লোকের সাথে আপনার রাত-দিন কোন না কোন

সম্পর্ক রেখেই চলতে হয়, যার হিসেব করে আপনি শেষ করতে পারেন না। এ সম্পর্কগুলো আপনাকে খুব ভালভাবেই রক্ষা করতে হয়। দুনিয়ায় আপনার সুখ-শান্তি, পসন্দ-অপসন্দ, স্ফূর্তি, সফলতা, মান-সম্মান ও সুনাম অর্জন একান্তভাবে এরই ওপর নির্ভর করে। সেগুলোকে খুব ভালভাবে রক্ষা করতে পারলে আপনি দুনিয়ায় সুখ-শান্তি এবং আনন্দ ও গৌরব লাভ করতে পারেন, নতুবা পারেন না। অনরূপভাবে যদি পরকালে আপনি আল্লাহর কাছে কারোও অধিকার হরণকারী সাব্যস্ত না হয়ে হাজির হতে পারেন, তাহলে আপনি তার কাছে সম্মান লাভ করতে পারেন এবং সেজন্য আপনাকে এমনভাবে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে হবে যেন আপনি কারো হক নষ্ট করেননি, কারোও ওপর যুলুম করেননি, কেউ আপনার বিরুদ্ধে কোন নালিশ করে না, কারোও জীবন নষ্ট করার দায়িত্ব আপনার ওপর নেই এবং কারো জান-মাল ও সম্মান আপনি অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেননি। কাজেই এখন আপনাকে এই ফায়সালা করতে হবে যে, এই অগণিত লোকের সাথে সঠিকভাবে সম্পর্ক কিভাবে রাখা যাবে এবং যেসব কারণে এসব সম্পর্ক ছিন্ন, নষ্ট বা তিক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা আছে তা জেনে নিয়ে তা থেকে আপনাকে ফিরে থাকতে হবে।

এখন আপনারা চিন্তা করুন যে, আপনাদের দেহের সাথে, আপনাদের পরিবারের লোকদের সাথে এবং দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত লোকের সাথে সঠিক সম্পর্ক রাখার জন্য জীবনের প্রতি ধাপে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলো লাভ করা আপনাদের কতখানি আবশ্যক। প্রতি ধাপে আপনার জানা চাই যে, কোনটা মিথ্যা ? সুবিচার কি এবং যুলুম কি ? আপনার ওপর কার কি পরিমাণ অধিকার আছে এবং আপনারই বা কার ওপর কি পরিমাণ অধিকার আছে ? জীবনের কোন কাজে প্রকৃত উপকার পাওয়া যাবে আর কিসে আসল ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে ?... কিন্তু এসব কিছুর জ্ঞান আপনি কোথায় পেতে পারেন ? এটা যদি আপনি আপনার মনের কাছে জানতে চান, তবে সেখানে তা পাবেন না। কারণ আপনার মন নিজেই অজ্ঞ ও মূর্খ, নিজের স্বার্থ ও অসৎ কামনা ছাড়া আর কিছুই জানা নেই। সে তো বলবে ঃ মদ খাও, যেনা কর, হারাম উপায়ে টাকা রোযগার কর। কারণ এসব কাজে খুবই আনন্দ আছে। সে বলবে, সকলেরই হক মেরে খাও, কাউকে হক দিও না। কারণ তাতে লাভও আছে, আরামও আছে। এমন একটা অজ্ঞ-মূর্খের হাতে যদি আপনি আপনার জীবনের রজ্জু ছেড়ে দেন—মন যা চায়, যদি কেবল তাই করেন, তবে এটা আপনাকে একেবারে অধপতনের চরম সীমায় নিয়ে যাবে। এমনকি, পরিণামে আপনি একজন নিকৃষ্ট স্বার্থপর, হীনচেতা ও পাপিষ্ঠে পরিণত হবেন। এতে আপনার দ্বীন-দুনিয়া সবকিছুই নষ্ট হবে।

দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে এই যে, আপনি আপনার মনের খাহেশের কথা না শুনে আপনারই মত অন্য মানুষের ওপর একান্তভাবে নির্ভর করবেন এবং প্রত্যেক কাজেই আপনি সেই লোকদের কথামত কাজ করবেন। তারা যেদিকে চালায়, আপনি অন্ধভাবে সেদিকেই চলবেন। এ পথ যদি অবলম্বন করেন, তবে কোন স্বার্থপর লোক এসে আপনাকে তার নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত এবং নিজের স্বার্থোদ্ধারের জন্য ব্যবহার করতে পারে, এর খুবই আশংকা আছে। কিংবা কোন মূর্খ ও পথভ্রষ্ট লোক এসে আপনাকেও বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যেতে পারে। অথবা কোন যালেম ব্যক্তি আপনাকে হাতিয়ার স্বরূপ গ্রহণ করে আপনার দ্বারা অন্যের ওপর যুলুম করাতে পারে। মোটকথা, অন্য লোকের অনুসরণ করলেও আপনি জ্ঞানের সেই জরুরী আলো লাভ করতে পারেন না, যা আপনাকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝাতে, ন্যায় ও অন্যায় বলে দিতে পারে এবং আপনার জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে।

এরপর একটি মাত্র উৎসই থেকে যায় যেখান থেকে আপনি আপনার এ অত্যাবশ্যক জ্ঞানের আলো লাভ করতে পারেন। সেই উপায়টি হচ্ছে আপনার ও নিখিল জাহানের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলা সবকিছুই অবগত আছেন, সবকিছুই দেখতে পান, প্রত্যেকটি জিনিসের প্রকৃতি তিনি ভাল করেই জানেন ও বুঝেন। একমাত্র তিনিই বলে দিতে পারেন যে, কোন জিনিসে আপনার প্রকৃত উপকার, আর কোন জিনিসে আপনার আসল ক্ষতি হতে পারে, কোন্ কাজ আপনার করা উচিত, কোন্ কাজ করা উচিত নয়—তা একমাত্র তিনিই বলে দিতে পারেন। আল্লাহ তাআলার কোন কিছুর অভাব নেই, তাঁর কোন স্বার্থ নেই, তিনি কারোও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। তিনি ধোঁকা দিয়ে (নাউযুবিল্লাহ) আপনার কাছ থেকে তাঁর নিজের কোন স্বার্থ আদায় করবেন না। কারণ তিনি পাক পবিত্র, তিনি সবকিছুরই মালিক, তিনি যা কিছু পরামর্শ দিবেন তার মধ্যে তাঁর নিজের স্বার্থের কোন গন্ধ নেই এবং তা কেবল আপনারই উপকারের জন্য। এছাড়া আল্লাহ তাআলা ন্যায় বিচারক, তিনি কখনই কারো ওপর অবিচার করেন না। কাজেই তাঁর সকল পরামর্শ নিশ্চয়ই নিরপেক্ষ, ন্যায় ও ফলপ্রসূ হবে। তাঁর আদেশ অনুযায়ী চললে আপনার নিজের ওপর বা অন্য কারো ওপর কোন যুলুম হবার আশংকা নেই।

আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে যে আলো পাওয়া যায়, তা থেকে কল্যাণ লাভ করা দু'টি জিনিসের ওপর একান্তভাবে নির্ভর করে। প্রথম জিনিস এই যে, আল্লাহ তাআলা এবং তিনি যে নবীর সাহায্যে এ আলো পাঠিয়েছেন সেই নবীর প্রতি আপনাকে প্রকৃত ঈমান আনতে হবে, আপনাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস

করতে হবে যে, আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর রাসূল যে বিধান ও উপদেশ নিয়ে এসেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য ; তার সত্যিকার উপকারিতা যদি আপনি অনুভব করতে না-ও পারেন তবুও আপনাকে একথা বিশ্বাস করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ঈমান আনার পর আপনি আপনার জীবনের প্রত্যেকটি কাজেই আল্লাহর সেই বিধান অনুসরণ করে চলবেন। কারণ তার প্রতি ঈমান আনার পর কার্যত তাঁর অনুসরণ না করলে সেই আলো হতে কিছুমাত্র ফল পাওয়া যেতে পারে না। মনে করুন, কোন ব্যক্তি আপনাকে বললো, অমুক জিনিসটি বিষ, তা প্রাণীর প্রাণ নাশ করে ; কাজেই তা খেও না। আপনি বললেন, হাঁ ভাই, তুমি যা বলেছ তা খুবই সত্য, তা যে বিষ এবং তা প্রাণ ধ্বংস করে, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এ সত্য জেনে-শুনে বিশ্বাস করে এবং মুখে স্বীকার করেও আপনি তা খেলেন। এখন বিষের যা আসল ক্রিয়া তা তো হবেই। জেনে খেলেও হবে, না জেনে খেলেও হবে। আপনি তা না জেনে খেলেও জেনে খাওয়ার মত একই ফল হতো। এরূপ জানা ও না জানার মধ্যে কার্যত কোন পার্থক্য নেই। আর এরূপ জানা এবং স্বীকার করার প্রকৃত ফল ও উপকারিতা আপনি ঠিক তখনই পেতে পারেন যখন আপনি কোন সত্য জানার ও স্বীকার করার সাথে সাথে সেই অনুসারে কাজ করবেন। আপনাকে যে কাজের হুকুম দেয়া হয়েছে, কেবল মুখে মুখে তাকে সত্য বলে স্বীকার করেই বসে থাকবেন না বরং তাকে কাজে পরিণত করবেন। আর যে কাজ করতে আপনাকে নিষেধ করা হয়েছে, শুধু মুখে মুখে তা থেকে ফিরে থাকার কথা মেনে নিলে চলবে না, বরং আপনার জীবনের সমস্ত কাজ-কারবারেই সেই নিষিদ্ধ কাজ হতে ফিরে থাকতে হবে। এজন্য আল্লাহ তাআলা বার বার বলেছেন ঃ

أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ـ(النساء : ٥٩)

"আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মেনে চল।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৫৯)

وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ـ (النور ٥٩)

"যদি তোমরা রাসূলের অনুসরণ কর, তবেই তোমরা সৎপথের সন্ধান পাবে।"–(সূরা আন নূর ঃ ৫৯)

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ ـ(النور : ٦٣)

"যারা আমার রাসূলের হুকুমের বিরোধিতা করছে, তাদের ভয় করা উচিত যে, তাদের ওপর বিপদ আসতে পারে।"–(সূরা আন নূর ঃ ৬৩)

আমি আপনাদেরকে বারবার বলছি যে, কেবল আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলেরই আনুগত্য করা উচিত ; এর অর্থ এই নয় যে, কোন মানুষের হুকুম আদৌ মানতে হবে না। আসলে এর অর্থ এই যে, আপনারা অন্ধ হয়ে কারো পিছনে চলবেন না। সবসময়ই আপনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কেবল এটাই দেখবেন যে, যে ব্যক্তি আপনাকে কোন কাজ করতে বলে, তা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমের অনুরূপ, না তার বিপরীত। যদি তার অনুরূপ হয়, তবে তা মেনে নেয়া অবশ্যই কর্তব্য। কারণ, সেই হুকুম মত কাজ করলে তাতে আসলে সেই ব্যক্তির নিজের হুকুম পালন করা হয় না, তা করলে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলেরই আনুগত্য করা হবে। আর সে যদি আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমের বিপরীত হুকুম দেয়, তবে তা তার মুখের ওপর নিক্ষেপ করুন, সে যে ব্যক্তি হোক না কেন। কারণ, আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম ছাড়া অন্য কারো হুকুম পালন করা একেবারেই জায়েয নয়।

আপনারা একথা সহজেই বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ তাআলা নিজে মানুষের সামনে এসে হুকুম দেন না, তাঁর যা কিছু হুকুম-আহকাম দেয়ার ছিল, তা সবই তাঁর রাসূলের মারফতে পাঠিয়েছেন। আমাদের সেই প্রিয় নবীও প্রায় চৌদ্দ শত বছর পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। তাঁর কাছে আল্লাহ তাআলা যা কিছু হুকুম-আহকাম দিয়েছিলেন, তা সবই এখন পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মধ্যে নিহিত আছে। কিন্তু এ কুরআন শরীফ এমন কোন জিনিস নয়, যা নিজেই আপনাদের সামনে এসে আপনাদেরকে আল্লাহর কথা বলতে ও হুকুম দান করতে পারে এবং আপনাদেরকে আল্লাহর নিষিদ্ধ পথ হতে বিরত রাখতে পারে। মানুষই আপনাদেরকে কুরআন ও হাদীস অনুসারে পরিচালিত করবে। কাজেই মানুষের অনুসরণ না করে তো কোন উপায় নেই। অবশ্য অপরিহার্য কর্তব্য এই যে, আপনারা কোন মানুষের পিছনে অন্ধভাবে চলবেন না। আপনারা সতর্কভাবে শুধু এতটুকুই দেখবেন যে, সেই লোকেরা আপনাদেরকে পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুসারে পরিচালিত করে কিনা। যদি কুরআন ও হাদীস অনুসারে চালায় তবে তাদের অনুসরণ করা আপনাদের কর্তব্য এবং তার বিপরীত পথে চালালে তাদের অনুসরণ করা পরিষ্কার হারাম।

দ্বীন ও শরীয়াত

ধর্ম সম্বন্ধে কথাবার্তা বলার সময় আপনারা দু'টি শব্দ প্রায়ই শুনে থাকেন এবং আপনারা নিজেরাও প্রায়ই বলে থাকেন। সেই দু'টি শব্দের একটি হচ্ছে দ্বীন ; দ্বিতীয়টি হচ্ছে শরীয়াত। কিন্তু অনেক কম লোকই এ শব্দ দু'টির অর্থ ও তাৎপর্য ভাল করে জানে। যারা লেখা-পড়া জানে না, তারা এর অর্থ না জানলে তা কোন অপরাধের কথা নয় ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভাল ভাল শিক্ষিত লোকেরা— এমন কি বহু মৌলভী সাহেব পর্যন্ত শব্দ দু'টির সঠিক অর্থ এবং এ দু'টির পারস্পরিক পার্থক্য সম্পর্কে আদৌ ওআকিবহাল নন। এ দু'টির অর্থ ভাল করে না জানায় অনেক সময় 'দ্বীন'কে শরীয়াতের সাথে এবং শরীয়াতকে দ্বীনের সাথে একেবারে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দেয়া হয়। এতে অনেক প্রকার ভুল বুঝাবুঝি হয়ে থাকে। এ প্রবন্ধে আমি খুব সহজ কথায় এ শব্দ দু'টির অর্থ আপনাদের কাছে প্রকাশ করবো।

দ্বীন (دين) শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। প্রথম ঃ শক্তি, কর্তৃত্ব, হুকুমাত, রাজত্ব-আধিপত্য এবং শাসন ক্ষমতা। দ্বিতীয় ঃ এর সম্পূর্ণ বিপরীত যথা—নীচতা, আনুগত্য, গোলামি, অধীনতা এবং দাসত্ব। তৃতীয়, হিসেব করা ফায়সালা করা ও যাবতীয় কাজের প্রতিফল দেয়া। কুরআন শরীফে 'দ্বীন' (دين) শব্দটি এ তিন প্রকারের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ـ (ال عمران : ١٩)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে তাই হচ্ছে একমাত্র 'দ্বীন' যাতে মানুষ শুধু আল্লাহ তাআলাকেই শক্তিমান মনে করে এবং তাকে ছাড়া আর কারো সামনে নিজেকে নত মনে করে না। কেবল আল্লাহকেই মনিব, মালিক, বাদশাহ ও রাজাধিরাজ বলে মানবে এবং তিনি ছাড়া আর কারো দাস, গোলাম, হুকুম বরদার, অধীন ও তাবেদার হবে না। শুধু আল্লাহকেই হিসেব গ্রহণকারী ও সকল কাজের উপযুক্ত প্রতিফলদাতা মনে করবে এবং তিনি ছাড়া আর কারো কাছে হিসেব দেয়ার পরোয়া করবে না ; অন্য কারো কাছে প্রতিফল পাবার আশা করবে না এবং কারো শাস্তির ভয় করবে না। এ 'দ্বীনের'ই নাম হচ্ছে 'ইসলাম'। কোন মানুষ যদি এ আকীদা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আসল শক্তিমান, আইন রচয়িতা, আসল বাদশাহ ও মালিক, প্রকৃত প্রতিফলদাতা মনে করে এবং তার সামনে বিনয়ের সাথে মাথা নত করে, যদি তাঁর বন্দেগী ও গোলামী করে, তাঁর আদেশ মত কাজ করে এবং তার প্রতিফলের আশা ও তার শাস্তির ভয় করে, তাহলে তাকে মিথ্যা 'দ্বীন' মনে করতে হবে। আল্লাহ এমন 'দ্বীন'

কখনও কবুল করবেন না। কারণ এটা প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ খেলাপ। এ নিখিল পৃথিবীতে আসল শক্তিমান ও সম্মানিত সত্তা আল্লাহ ছাড়া কেউ নয়। এখানে আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন আধিপত্য নেই, বাদশাহী নেই। আর মানুষকে আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী ও গোলামী করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। সেই আসল মালিক ছাড়া কাজের প্রতিফল দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। একথাই অন্য এক আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج (ال عمران : ٨٥)

অর্থাৎ আল্লাহর আধিপত্য ও প্রভুত্ব ছেড়ে যে ব্যক্তি অন্য কাউকে নিজের মালিক এবং আইন রচয়িতা বলে স্বীকার করে, তার বন্দেগী ও গোলামী কবুল করে এবং তাকে কাজের প্রতিফলদাতা মনে করে, তার এ 'দ্বীন'কে আল্লাহ তাআলা কখনই কবুল করবেন না। কারণ ঃ

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لا حُنَفَاءَ - (البينة : ٥)

"মানুষকে আল্লাহ তাঁর নিজের বান্দাহ করে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করার আদেশ মানুষকে দেয়া হয়নি। তাদের একমাত্র অবশ্য কর্তব্য ফরয এই যে, সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধু আল্লাহর জন্যই নিজের দ্বীন—অর্থাৎ আনুগত্য ও গোলামীকে নিযুক্ত করবে, একমুখী হয়ে তাঁরই বন্দেগী করবে এবং শুধু তাঁরই হিসেব করার ক্ষমতাকে ভয় করবে।"–(সূরা আল বাইয়্যেনা ঃ ৫)

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○ (ال عمران : ٨٣)

"মানুষ কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো গোলামী ও হুকুম পালন করতে চায়? অথচ প্রকৃতপক্ষে আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলারই একান্ত গোলাম ও হুকুম পালনকারী এবং এসব জিনিসকে তাদের নিজেদের হিসাব-কিতাবের জন্য আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে যেতে হবে না। তবুও মানুষ কি আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের বিরুদ্ধে আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া আর অন্য কোন পথ অবলম্বন করতে চায়?"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৩)

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○ (الصف : ٩)

"আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে ইসলামী জীবনব্যবস্থা ও সত্যের আনুগত্যের ব্যবস্থা সহকারে এ জন্য পাঠিয়েছেন যে, তিনি দুনিয়ার সকল 'মিথ্যা খোদার' খোদায়ী ও প্রভুত্ব ধ্বংস করে দিবেন এবং মানুষকে এমনভাবে আযাদ করবেন যে, তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো বান্দাহ হবে না, কাফের আর মুশরিকগণ নিজেদের মূর্খতার দরুন যতই চীৎকার করুক না কেন এবং একে ঘৃণা করুক না কেন।"–(সূরা আস সফ ঃ ৯)

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ج (الانفال : ٣٩)

"তোমরা যুদ্ধ কর যেন দুনিয়া হতে গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব চিরতরে দূর হয় এবং দুনিয়ায় যেন শুধু আল্লাহরই আইন প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহর বাদশাহী যেন সকলেই স্বীকার করে এবং মানুষ যেন শুধু আল্লাহরই বন্দেগী করে।"–(সূরা আল আনফাল ঃ ৩৯)

ওপরের এ ব্যাখ্যা দ্বারা 'দ্বীন' শব্দের অর্থ পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে আশা করি। সংক্ষেপে বলতে গেলে তা এই —আল্লাহকে মালিক মনিব এবং আইন রচনাকারী স্বীকার করা—আল্লাহরই গোলামী বন্দেগী ও তাবেদারী করা, আল্লাহর হিসাব গ্রহণের ও তাঁর শাস্তি বিধানের ভয় করা এবং একমাত্র তাঁরই কাছে প্রতিফল লাভের আশা করা।

তারপরও যেহেতু আল্লাহর হুকুম তাঁর কিতাব ও রাসূলের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে থাকে, এজন্য রাসূলকে আল্লাহর রাসূল এবং কিতাবকে আল্লাহর কিতাব বলে মান্য করা আর কার্যক্ষেত্রে তার অনুসরণ করাও 'দ্বীন'-এর মধ্যে গণ্য। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ لا فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○(الاعراف : ٣٥)

"হে আদম সন্তান ! আমার নবী যখন তোমাদের কাছে বিধান নিয়ে আসবে তখন যারা সেই বিধানকে মেনে আদর্শবাদী জীবনযাপন করবে এবং সেই অনুসারে নিজেদের কাজ-কারবার সমাপন করবে, তাদের কোন ভয়ের কারণ নেই।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ৩৫)

এর দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ সোজাসুজি প্রত্যেক মানুষের কাছে তাঁর বিধান পাঠান না, বরং তার নবীদের মাধ্যমেই পাঠিয়ে থাকেন। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহকে আইন রচনাকারী বলে স্বীকার করবে সেই ব্যক্তি কেবল নবীদের হুকুম পালন করে এবং তাঁদের প্রচারিত বিধানের আনুগত্য করেই আল্লাহর হুকুম পালন করতে পারে একে বলা হয় 'দ্বীন'।

অতপর শরীয়াতের সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করবো। শরীয়াত শব্দের অর্থ ঃ পথ ও নিয়ম। একজন মানুষ যখন আল্লাহকে আইন রচনাকারী বলে তার বন্দেগী স্বীকার করে এবং একথাও স্বীকার করে নেয় যে, রাসূল আল্লাহর তরফ হতেই অনুমতি প্রাপ্ত আইনদাতা হিসেবে এসেছেন এবং কিতাব তাঁরই তরফ হতেই নাযিল হয়েছে, ঠিক তখনই সে দ্বীন-এর মধ্যে দাখিল হয়। এরপরে যে নিয়ম অনুযায়ী তাকে আল্লাহর বন্দেগী করতে হয় এবং তাঁর আনুগত্য করার জন্য যে পথে চলতে হয় তারই নাম হচ্ছে শরীয়াত। এ পথ ও কর্মপদ্ধতি আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের মারফতে পাঠিয়েছেন। মালিকের ইবাদাত কোন্ নিয়মে করতে হবে, পাক-পবিত্র হওয়ার নিয়ম কি, নেকী ও তাকওয়ার পথ কোন্‌টি, অন্য মানুষের হক কিভাবে আদায় করতে হবে, কাজ-কারবার কিভাবে করতে হবে, জীবন কিভাবে যাপন করতে হবে, এসব কথা নবীই বলেছেন। দ্বীন ও শরীয়াতের মধ্যে পার্থক্য এই যে, দ্বীন চিরকালই এক ছিল এক আছে এবং চিরকাল একই থাকবে ; কিন্তু শরীয়াত দুনিয়ায় বহু এসেছে, বহু বদলিয়ে গেছে। অবশ্য শরীয়াতের এ পরিবর্তনের কারণে দ্বীনের কোন দিনই পরিবর্তন হয়নি। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দ্বীন যা ছিল হযরত নূহ (আ)-এর দ্বীনও তাই ছিল, হযরত মূসা (আ)-এর দ্বীনও তাই ছিল। হযরত শোয়াইব (আ), হযরত সালেহ (আ) এবং হযরত হুদ (আ)-এর দ্বীনও তাই ছিল এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর দ্বীনও ঠিক তাই। কিন্তু এই নবীগণের প্রত্যেকেরই শরীয়াতে কিছু না কিছু পার্থক্য বর্তমান ছিল। নামায এবং রোযার নিয়ম এক এক শরীয়াতে এক এক রকমের ছিল। হারাম ও হালালের হুকুম, পাক-পবিত্রতার নিয়ম, বিয়ে ও তালাক এবং সম্পত্তি বন্টনের আইন এক এক শরীয়াতের এক এক রকম ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই মুসলমান ছিলেন। হযরত নূহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত মূসা (আ)-এর উম্মতগণও মুসলমান ছিলেন, আর আমরাও মুসলমান কেননা সকলের দ্বীন এক। এর দ্বারা জানা গেল যে, শরীয়াতের হুকুম বিভিন্ন হলেও দ্বীন এক থাকে, তাতে কোন পার্থক্য হয় না—দ্বীন অনুসারে কাজ করার নিয়ম-পন্থা যতই বিভিন্ন হোক না কেন।

এই পার্থক্য বুঝার জন্য একটা উদাহরণ দেয়া যাচ্ছে। মনে করুন, একজন মনিবের বহু সংখ্যক চাকর আছে। যে ব্যক্তি সেই মনিবকে মনিব বলে স্বীকার করে না এবং তার হুকুম মান্য করা দরকার বলে মনেই করে না, সে তো পরিষ্কার নাফরমান এবং সে চাকরের মধ্যে গণ্যই নয়। আর যারা তাকে মনিব বলে স্বীকার করে, তার হুকুম পালন করা কর্তব্য বলে বিশ্বাস করে এবং তার হুকুমের অবাধ্য হতে ভয় করে, তারা সকলেই চাকরের মধ্যে গণ্য। চাকুরী করা এবং খেদমত করার নিয়ম বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু মূলত তারা সকলেই সমানভাবে সেই একই মনিবের চাকর, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। মালিক

বা মনিব যদি একজন চাকরকে চাকুরীর এক নিয়ম বলে দেয় আর অন্যজনকে বলে আর এক নিয়ম তবে এদের কেউই একথা বলতে পারে না যে, আমি মনিবের চাকর কিন্তু ঐ ব্যক্তি চাকর নয়। এভাবে মনিবের হুকুমের অর্থ ও উদ্দেশ্য যদি এক একজন চাকর এক এক রকম বুঝে থাকে এবং উভয়েই নিজের নিজের বুদ্ধি মত সেই হুকুম পালন করে, তবে চাকুরীর বেলায় উভয়ই সমান। অবশ্য হতে পারে যে, একজন চাকর মনিবের হুকুমের অর্থ ভুল বুঝেছে, আর অন্যজন এর অর্থ ঠিকমত বুঝেছে। কিন্তু হুকুম মত কাজ উভয়েই যখন করেছে, তখন একজন অন্যজনকে নাফরমান অথবা মনিবের চাকুরী হতে বিচ্যুত বলে অভিযুক্ত করতে পারে না।

এ উদাহরণ হতে আপনারা দ্বীন ও শরীয়াতের পারস্পরিক পার্থক্য খুব ভাল করে বুঝতে পারেন। নবী মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্বে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন নবীর মারফতে বিভিন্ন শরীয়াত পাঠিয়েছিলেন। এদের একজনকে চাকরীর এক রকমের নিয়ম বলেছেন, আর অন্যজনকে বলেছেন অন্যবিধ নিয়ম। এ সমস্ত নিয়ম অনুসরণ করে আল্লাহর হুকুম মত যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁরা সকলেই মুসলমান ছিলেন—যদিও তাদের চাকুরির নিয়ম ছিল বিভিন্ন রকমের। তারপর যখন নবী মুহাম্মাদ (স) দুনিয়ায় তাশরীফ আনলেন, তখন সকলের মনিব আল্লাহ তাআলা হুকুম করলেন যে, এখন পূর্বের সমস্ত নিয়মকে আমি বাতিল করে দিলাম। ভবিষ্যতে যে আমার চাকুরি করতে চায় তাকে ঠিক সেই নিয়ম অনুসারেই কাজ করতে হবে, যে নিয়ম আমার শেষ নবীর মাধ্যমে আমি প্রচার করবো। এরপর পূর্বের কোন নিয়ম অনুসারে চাকুরি করার কারো অধিকার নেই। কারণ যদি কেউ এ নূতন নিয়মকে স্বীকার না করে এবং এখনও সেই পুরাতন নিয়ম মত চলতে থাকে, তবে বলতে হবে যে, সে আসলে মনিবের হুকুম মানছে না, সে তার নিজের মনের কথাই মানছে। কাজেই এখন সে চাকুরি হতে বরখাস্ত হয়েছে।—অর্থাৎ ধর্মের পরিভাষায় সে কাফের হয়ে গেছে।

প্রাচীন নবীগণকে যারা এখনও মেনে চলতে চায় তাদের সম্বন্ধে একথাই প্রযোজ্য। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অনুগামী যারা তাদের সম্পর্কে উল্লেখিত উদাহরণের দ্বিতীয় অংশ বেশ খেটে যায়। আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে যে শরীয়াত পাঠিয়েছেন, তাকে যারা আল্লাহর শরীয়াত বলে স্বীকার করে এবং তা পালন করা কর্তব্য বলে মনে করে, তারা সকলেই মুসলমান। এখন এই শরীয়াতকে একজন যদি একভাবে বুঝে থাকে আর একজন অন্যভাবে এবং উভয়ই নিজ নিজ বুদ্ধিমত সেই অনুসারে কাজ করে তবে তাদের বাহ্যিক কাজে পরস্পরের মধ্যে যতই পার্থক্য হোক না কেন, তাদের কেউই চাকুরি হতে বিচ্যুত হবে না। কারণ এই যে

তাদের প্রত্যেকেই যে নিয়মে কাজ করছে সে একান্তভাবে মনে করে যে, তা আল্লাহর দেয়া নিয়ম এবং এটা বুঝেই সে সেই নিয়ম অনুসরণ করছে। কাজেই একজন চাকর কেমন করে বলতে পারে যে, আমিই খাঁটি চাকর আর অমুক খাঁটি চাকর নয়। সে বেশী কিছু বললেও শুধু এতটুকু বলতে পারে যে, আমি মনিবের হুকুমের ঠিক অর্থ বুঝেছি, আর অমুক লোক ঠিক অর্থ বুঝতে পারেনি। কিন্তু তাই বলে অন্যজনকে চাকুরি হতে খারিজ করে দেয়ার বা খারিজ মনে করার তার কোন অধিকার নেই ; তবুও যদি কেউ এতখানি দুঃসাহস করে তবে আসল মনিবের পদকে সে নিজের বিনা অধিকারে দখল করছে। তার কথার অর্থ এই হয় যে, তুমি তোমার মনিবের হুকুম মানতে যেরূপ বাধ্য, আমার হুকুম মানতেও তুমি অনুরূপভাবে বাধ্য। আমার হুকুম যদি তুমি না মান তাহলে আমি আমার ক্ষমতা দ্বারা মনিবের চাকুরি হতে তোমাকে খারিজ করে দিব। একটু ভেবে দেখুন, এটা কত বড় স্পর্ধার কথা। এ কারণেই নবী মুহাম্মাদ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে অকারণে কাফের বলবে, তাঁর কথা স্বয়ং তার নিজের ওপরই বর্তিবে। কারণ মুসলমানকে আল্লাহ তাআলা নিজের হুকুমের গোলাম বানিয়েছেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি বলে---না, তুমি আমার বুদ্ধি ও আমার মতের গোলামী কর। অর্থাৎ শুধু আল্লাহই তোমার ইলাহ নন, আমিও তোমার একজন ছোট ইলাহ এবং আমার হুকুম না মানলে আমার নিজের ক্ষমতার দ্বারা তোমাকে আল্লাহর বন্দেগী হতে খারিজ করে দেব—আল্লাহ তাআলা তাকে খারিজ করুন আর না-ই করুন। আর এ ধরনের কথা যারা বলে তাদের কথায় অন্য মুসলমান কাফের হোক বা না হোক কিন্তু সে নিজেকে কাফেরীর বিপদে জড়িয়ে ফেলে।

দ্বীন ও শরীয়াতের পার্থক্য আপনারা ভাল করে বুঝতে পেরেছেন আশা করি। সেই সাথে একথাও আপনারা জানতে পেরেছেন যে, বন্দেগীর বাহ্যিক নিয়মের পার্থক্য হলেও আসল দ্বীনে কোন পার্থক্য হয় না। অবশ্য তার জন্য শর্ত এই যে, মানুষ যে পন্থায়ই কাজ করুক না কেন, নেক নিয়তের সাথে করা কর্তব্য এবং একথা মনে রেখে করতে হবে যে, যে নিয়মে সে কাজ করছে, তা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলেরই নিয়ম।

এখন আমি বলবো যে, দ্বীন ও শরীয়াতের এ পার্থক্য না বুঝতে পেরে আমাদের মুসলমান জামায়াতের কতই না অনিষ্ট হচ্ছে। মুসলমানদের মধ্যে নামায পড়ার নানা রকম নিয়ম আছে। একদল বুকের ওপর হাত বেঁধে থাকে, অন্যদল নাভির ওপর হাত বাঁধে। একদল ইমামের পিছনে মোকতাদী হয়ে আলহামদু সূরা পড়ে, আর একদল তা পড়ে না ; একদল শব্দ করে 'আমীন' বলে, আর একদল বলে মনে মনে। এদের প্রত্যেকেই যে নিয়মে চলছে একথা মনে করেই চলছে যে, এটা নবী মুহাম্মাদ (স)-এরই নিয়ম। কাজেই নামাযের

বাহ্যিক নিয়ম বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এরা সকলেই সমভাবে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর অনুগামী। কিন্তু যেসব যালেম লোক শরীয়াতের এসব খুঁটিনাটি মাসয়ালার বিভিন্নতাকে আসল দ্বীনের বিভিন্নতা বলে মনে করে নিয়েছে এজন্যই তারা নিজেদের আলাদা দল গঠন করে নিয়েছে, মসজিদ ভিন্ন করে তৈরি করেছে। একদল অন্যদলকে গালাগালি করে, মসজিদ হতে মেরে বের করে দেয়, মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করে এবং এভাবে নবী মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মাতকে টুকরো টুকরো করে দেয়।

এতেও এ শয়তানদের দিল ঠাণ্ডা হয় না বলে ছোট ছোট ও সামান্য ব্যাপারে একজন অপরজনকে কাফের, ফাসেক ও গোমরাহ বলে আখ্যা দিতে থাকে। এক ব্যক্তি কুরআন ও হাদীস হতে নিজ নিজ বুদ্ধি মত আল্লাহর হুকুম বের করে। এখন সে যা বুঝেছে সেই অনুসারে নিজের কাজ করাকেই সে যথেষ্ট বলে মনে করে না ; বরং সে নিজের এ মতকে অন্যের ওপরও যবরদস্তি করে চাপিয়ে দিতে চায়। আর অন্য লোক যদি তা মানতে রাজী না হয় তাহলে তাকে কাফের ও আল্লাহর দ্বীন হতে খারিজ মনে করতে শুরু করে।

মুসলমানদের মধ্যে আপনারা এই যে হানাফী, শাফেয়ী, আহলে হাদীস ইত্যাদি নানা দলের নাম শুনতে পান এরা সকলে পবিত্র কুরআন ও হাদীসকে সর্বশেষ কিতাব বলে বিশ্বাস করে এবং নিজের নিজের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী তা থেকে আইন ও বিধান জেনে নেয়। হতে পারে একজনের সিদ্ধান্ত ঠিক ও বিশুদ্ধ, আর অন্যজনের সিদ্ধান্ত ভুল। আমিও একটা নিয়ম অনুসরণ করে চলি এবং তাকে শুদ্ধ বলে মনে করি। আর এর বিরোধী লোকদের সাথে আলাপ-আলোচনাও করি—আমি যাকে শুদ্ধ বলে বুঝেছি, তা তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করি, আর যাকে আমি ভুল মনে করি, তার দোষ-ত্রুটিও তাদের বুঝাতে চাই। কিন্তু কারো সিদ্ধান্ত ভুল হওয়া এক কথা আর দ্বীন হতে খারিজ হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। নিজ নিজ বিবেক অনুসারে শরীয়াতের কাজ করার অধিকার প্রত্যেক মুসলমানেরই আছে। দশজন মুসলমান যদি দশটি বিভিন্ন নিয়মে কাজ করে, তবু যতক্ষণ তাঁরা শরীয়াত মানবে ততক্ষণ তাঁরা সকলেই মুসলমান, একই উম্মাতের মধ্যে গণ্য ; তাদের ভিন্ন ভিন্ন দল-গোষ্ঠী গঠন করার কোনই কারণ নেই। কিন্তু এ নিগূঢ় কথা যারা বুঝতে পারে না, তারা অতি ছোট ছোট ও সামান্য সামান্য কারণে দলাদলি করে। একদল অন্যদলের সাথে ঝগড়া বাঁধায়, নামায ও মসজিদ আলাদা করে, একদল অন্যদলের সাথে বিয়ে-শাদী, মিলা-মিশা এবং সম্পর্ক স্থাপন চিরতরে বন্ধ করে দেয় আর নিজ মতের লোকদেরকে নিয়ে একটা আলাদা দল গঠন করে। মনে হয় তারা আলাদা নবীর উম্মাত।

আপনারা ধারণা করতে পারেন যে, এরূপ দলাদলির ফলে মুসলমানের কি বিরাট ক্ষতি হয়েছে। কথায় বলা হয় যে, মুসলমান একদল— এক উম্মাত। এ উপমহাদেশে মুসলমানের সংখ্যা ৮ কোটি।[১] এতবড় একটা দল যদি বাস্তবিকই সংঘবদ্ধ হতো এবং পরিপূর্ণ একতার সাথে আল্লাহর কালামকে বুলন্দ করার জন্য কাজ করতো, তাহলে দুনিয়ার কোন শক্তিই তাদেরকে দুর্বল মনে করতে পারতো না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ দলাদলির কারণেই এ উম্মাতটি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের একজনের মন অন্যজনের প্রতি বিষাক্ত ও শ্রদ্ধাহীন। বড় বড় বিপদের সময়ও তারা একত্রিত হয়ে বিপদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে না। একদলের মুসলমান অন্যদলের মুসলমানকে ঠিক ততখানিই শত্রু বলে মনে করেন, যতখানিই এক ইহুদী একজন খৃষ্টানকে শত্রু বলে মনে করে, বরং তা থেকেও অধিক। এমনও দেখা দিয়েছে যে, একদল মুসলমানকে পরাজিত করার জন্য আর একদল মুসলমান কাফেরদের সাথে যোগ দিয়ে ষড়যন্ত্র করে। এমতাবস্থায় দুনিয়ার মুসলমান যদি দুর্বল হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এটা তাদের নিজেদেরই কর্মফল। তাদের ওপর সেই আযাবই নাযিল হয়েছে যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআন মজিদে বলেছেন ঃ

اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ط (الانعام : ٦٥)

"মানুষের প্রতি আল্লাহর এমন আযাবও আসতে পারে, যার ফলে তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়া হবে, তোমরা পরস্পর কাটাকাটি করে মরবে।"–(সূরা আল আনআম ঃ ৬৫)

ওপরে যে আযাবের কথা বলা হলো, এতদাঞ্চলে তা খুব বেশী পরিমাণেই দেখা যায়। এখানে মুসলমানের নানা দল ; এমনকি আলেমদের দলেরও কোন হিসেব নেই। এজন্যই এখানকার মুসলমান এবং আলেমদের কোন শক্তি নেই। আপনারা যদি বাস্তবিকই মঙ্গল চান, তবে আপনাদের ও আলেমদের এ বিভিন্ন দল ভেংগে দিন। আপনারা পরস্পর পরস্পরের ভাই হিসেবে এক উম্মাতরূপে গঠিত হোন। ইসলামী শরীয়াতে এরূপ হানাফী, শাফেয়ী, আহলে হাদীস প্রভৃতি আলাদা আলাদা দল গঠন করার কোন অবকাশ নেই। এরূপ দলাদলি মূর্খতার কারণেই হয়ে থাকে। নতুবা আল্লাহ তাআলা তো একটি মাত্র দল তৈরি করেছেন এবং সেই একটি মাত্র দলই হচ্ছে মুসলমান।

---

১. এই বক্তৃতা ১৯৩৭-৩৮ সালে পাঠান কোটে (দূরুল ইসলামে) প্রদত্ত হয়েছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

নামায রোযার হাকীকত

بسم الله الرحمن الرحيم

ইবাদাত

'ইসলামের হাকীকত' গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধে 'দ্বীন' ও 'শরীয়াত' এ শব্দ দু'টির প্রকৃত অর্থ এবং ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আমি 'ইবাদাত' শব্দটির বিস্তারিত অর্থ আপনাদের সামনে পেশ করবো। এ শব্দটি সর্বসাধারণ মুসলমান প্রায়ই বলে থাকে ; কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ অনেকেই জানে না। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন শরীফে বলেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ (الذريت : ٥٦)

"আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবল আমারই ইবাদাত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।"–(সূরা আয যারিয়াত ঃ ৫৬)

এ থেকে নিসন্দেহে বুঝা গেল যে, মানুষের জন্ম, জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আল্লাহ্ তাআলার ইবাদাত এবং বন্দেগী ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন আপনারা সহজেই বুঝতে পারেন যে, 'ইবাদাত' শব্দটির প্রকৃত অর্থ জেনে নেয়া আমাদের পক্ষে কতখানি জরুরী। এ শব্দটির অর্থ না জানলে যে মহান উদ্দেশ্যে আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা আপনি কিছুতে লাভ করতে পারেন না। আর যে বস্তু তার উদ্দেশ্য লাভ করতে পারে না তা ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে থাকে।

চিকিৎসক রোগীকে নিরাময় করতে না পারলে বলা হয় যে, সে চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়েছে, কৃষক ভাল ফসল জন্মাতে না পারলে কৃষিকার্যে তার ব্যর্থতা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। তেমনি আপনারা যদি আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য লাভ অর্থাৎ ইবাদাত করতে না পারেন তবে বলতে হবে যে, আপনাদের জীবন ব্যর্থ হয়েছে। এজন্যই আমি আশা করি আপনারা এ 'ইবাদাত' শব্দটির প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য জানার জন্য বিশেষ মনোযোগী হবেন এবং তা আপনাদের হৃদয়-মগযে বদ্ধমূল করে নিবেন। কারণ মানব জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা এরই ওপর একান্তভাবে নির্ভর করে।

ইবাদাত শব্দটি আরবী 'আবদ' (عبد) হতে উদ্ভূত হয়েছে। 'আবদ' অর্থ দাস ও গোলাম। অতএব 'ইবাদাত' শব্দের অর্থ হবে বন্দেগী ও গোলামী করা। যে ব্যক্তি অন্যের দাস সে যদি তার বাস্তবিকই মনিবের সমীপে একান্ত অনুগত হয়ে থাকে এবং তার সাথে ঠিক ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করে, তবে একে বলা হয় বন্দেগী ও ইবাদাত। পক্ষান্তরে কেউ যদি কারো চাকর হয় এবং মনিবের

কাছ থেকে পুরোপুরি বেতন আদায় করে, কিন্তু তবুও সে যদি ঠিক চাকরের ন্যায় কাজ না করে তবে বলতে হবে যে, সে নাফরমানী ও বিদ্রোহ করছে। আসলে একে অকৃতজ্ঞতা বলাই বাঞ্ছনীয়। তাই সর্বপ্রথম আপনাকে জানতে হবে, মনিবের সামনে 'চাকরের' ন্যায় কাজ করা এবং তার সমীপে আনুগত্য প্রকাশ করার উপায় কি হতে পারে।

বান্দাহ বা চাকরকে প্রথমত মনিবকে 'প্রভু' বলে স্বীকার করতে হবে এবং মনে করতে হবে যে, যিনি আমার মালিক, যিনি আমাকে দৈনন্দিন রুজী দান করেন এবং যিনি আমার হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন তাঁরই অনুগত হওয়া আমার কর্তব্য। তিনি ছাড়া অন্য কেউই আমার আনুগত্য লাভের অধিকারী নয়। সকল সময় মনিবের আনুগত্য করা, তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর অনুবর্তিতা মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ না করা, মনিবের বিরুদ্ধে মনে কোন কথার স্থান না দেয়া এবং অন্য কারো কথা পালন না করাই বান্দাহর দ্বিতীয় কর্তব্য। গোলাম সবসময়ই গোলাম ; তার একথা বলার কোন অধিকার নেই যে, আমি মনিবের এ আদেশ মানবো আর অমুক আদেশ মানবো না। কিংবা আমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মনিবের গোলাম আর অন্যান্য সময় আমি তার গোলামী হতে সম্পূর্ণ আযাদ ও মুক্ত।

মনিবের প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন এবং তার সমীপে আদব রক্ষা করে চলা বান্দার তৃতীয় কাজ। আদব ও সম্মান প্রকাশের যে পন্থা মনিব নির্দিষ্ট করে দেবেন তাই অনুসরণ করা, সালাম দেয়ার জন্য মনিব যে সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সেই সময়ে নিশ্চিতরূপে উপস্থিত হওয়া এবং মনিবের আনুগত্য ও দাসত্ব স্বীকারে নিজের প্রতিজ্ঞা ও আন্তরিক নিষ্ঠা প্রমাণ করা একান্ত আবশ্যক।

এ তিনটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে যে কার্যটি সম্পন্ন হয় আরবী পরিভাষায় তাকেই বলে 'ইবাদাত'। প্রথমত, মনিবের দাসত্ব স্বীকার, দ্বিতীয়ত, মনিবের আনুগত্য এবং তৃতীয়ত, মনিবের সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করা।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ -(الذريت : ٥٦)

এর প্রকৃত মর্ম হচ্ছে ঃ আল্লাহ তাআলা জ্বিন ও মানব জাতিকে একমাত্র এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যে, তারা কেবল আল্লাহ তাআলারই দাসত্ব করবে, অন্য কারো নয়, কেবল আল্লাহর হুকুম পালন করবে, এছাড়া অন্য কারো হুকুম অনুসরণ করবে না এবং কেবল তাঁরই সামনে সম্মান ও সম্ভ্রম প্রকাশের জন্য মাথা নত করবে, অন্য কারো সামনে নয়। এ তিনটি জিনিসকে আল্লাহ তাআলা বুঝিয়েছেন এ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 'ইবাদাত' দ্বারা। যেসব আয়াতে

আল্লাহ তাআলা ইবাদাতের নির্দেশ দিয়েছেন তার অর্থ এটাই। আমাদের শেষ নবী এবং তাঁর পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের যাবতীয় শিক্ষার সারকথা হচ্ছে ঃ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ "আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করো না" অর্থাৎ দাসত্ব ও আনুগত্য লাভের যোগ্য সারা জাহানে একজনই মাত্র বাদশাহ আছেন—তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা ; অনুসরণযোগ্য মাত্র একটি বিধান বা আইন আছে--তাহলো আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা এবং একটি মাত্র সত্তাই আছে, যার পূজা-উপাসনা, আরাধনা করা যেতে পারে। আর সেই সত্তাই হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ।

ইবাদাত শব্দের এ অর্থ আপনি স্মরণ রাখুন এবং আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে থাকুন। একটি চাকর যদি মনিবের নির্ধারিত কর্তব্য পালন না করে বরং তাঁর সামনে কেবল হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, লক্ষ বার কেবল তার নাম জপে, তবে এ চাকরটি সম্পর্কে আপনি কি বলবেন ? মনিব তাকে অন্যান্য মানুষের প্রাপ্য আদায় করতে বলেন। কিন্তু সে কেবল সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে মনিবের সামনে মাথা নত করে দশবার সালাম করে এবং আবার হাত বেঁধে দাঁড়ায়। মনিব তাকে অনিষ্টকর কাজগুলো বন্ধ করতে আদেশ করেন। কিন্তু সে সেখান থেকে একটুও নড়ে না। বরং সে কেবল সিজদাহ করতে থাকে। মনিব তাকে চোরের হাত কাটতে বলেন। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে থেকে সুললিত কণ্ঠে বিশবার পড়তে বা উচ্চারণ করতে থাকে -- 'চোরের হাত কাট' কিন্তু সে একবারও এমন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে না যার অধীন চোরের হাত কাটা সম্ভব হবে। এমন চাকর সম্পর্কে কি মন্তব্য করবেন ? আপনি কি বলতে পারেন যে, সে প্রকৃতপক্ষে মনিবের বন্দেগী ও ইবাদাত করছে ? আপনার কোন চাকর এরূপ করলে আপনি তাকে কি বলবেন তা আমি জানি না, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আল্লাহর যে চাকর এরূপ আচরণ করে তাকে আপনি 'বড় আবেদ' (ইবাদাতকারী, বুযর্গ ইত্যাদি) নামে অভিহিত করেন। এরা সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলার কত শত হুকুম পাঠ করে, কিন্তু সেগুলো পালন করার এবং কাজে পরিণত করার জন্য একটু চেষ্টাও করে না। বরং কেবল নফলের পর নফল পড়তে থাকে, আল্লাহর নামে হাজার দানা তাসবীহ জপতে থাকে এবং মধুর কণ্ঠে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করতে থাকে। আপনি তার এ ধরনের কার্যাবলী দেখেন, আর বিস্মিত হয়ে বলেন ঃ 'ওহে ! লোকটা কত বড় আবেদ আর কত বড় পরহেযগার।' আপনাদের এ ভুল ধারণার মূল কারণ এই যে, আপনারা 'ইবাদাত' শব্দটির প্রকৃত অর্থ মোটেই জানেন না।

আর একজন চাকরের কথা ধরুন। সে রাত-দিন কেবল পরের কাজ করে, অন্যের আদেশ শুনে এবং পালন করে, অন্যের আইন মেনে চলে এবং তার প্রকৃত মনিবের যত আদেশ ও ফরমানই হোক না কেন, তার বিরোধিতা করে। কিন্তু 'সালাম' দেয়ার সময় সে তার প্রকৃত মনিবের সামনে উপস্থিত হয় এবং মুখে কেবল তার নাম জপতে থাকে। আপনাদের কারো কোন চাকর এরূপ করলে আপনারা কি করবেন? তার 'সালাম' কি তার মুখের ওপর নিক্ষেপ করবেন না? মুখে মুখে সে যখন আপনাকে মনিব আর মালিক বলে ডাকবে তখন আপনি কি তাকে একথা বলবেন না যে, তুই ডাহা মিথ্যাবাদী ও বেঈমান ; তুই আমার বেতন খেয়ে অন্যের তাবেদারী করিস, মুখে আমাকে মনিব বলে ডাকিস, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেবল অন্যেরই কাজ করে বেড়াস? এটা নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধির কথা এটা কারো বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্যের কথা ! যারা রাত-দিন আল্লাহর আইন ভঙ্গ করে, কাফের ও মুশরিকদের আদেশ অনুযায়ী কাজ করে এবং নিজেদের বাস্তব কর্মজীবনে আল্লাহর বিধানের কোন পরোয়া করে না ; তাদের নামায-রোযা, তাসবীহ পাঠ, কুরআন তেলাওয়াত, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদিকে আপনি ইবাদাত বলে মনে করেন। এ ভুল ধারণারও মূল কারণ ইবাদাত শব্দের প্রকৃত অর্থ না জানা।

আর একটি চাকরের উদাহরণ নিন। মনিব তার চাকরদের জন্য যে ধরনের পোশাক নির্দিষ্ট করেছেন, মাপ-জোখ ঠিক রেখে সে ঠিক সেই ধরনের পোশাক পরিধান করে, বড় আদব ও যত্ন সহকারে সে মনিবের সামনে হাজির হয়, প্রত্যেকটি হুকুম শুনামাত্রই মাথা নত করে শিরোধার্য করে নেয় যেন তার তুলনায় বেশী অনুগত চাকর আর কেউই নয়। 'সালাম' দেয়ার সময় সে একেবারে সকলের সামনে এসে দাঁড়ায় এবং মনিবের নাম জপবার ব্যাপারে সমস্ত চাকরের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিষ্ঠা প্রমাণ করে ; কিন্তু অন্যদিকে এ ব্যক্তি মনিবের দুশমন এবং বিদ্রোহীদের খেদমত করে, মনিবের বিরুদ্ধে তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে এবং মনিবের নাম পর্যন্ত দুনিয়া হতে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে তারা যে চেষ্টাই করে, এ হতভাগা তার সহযোগিতা করে। রাতের অন্ধকারে সে মনিবের ঘরে সিঁদ কাটে এবং ভোর হলে বড় অনুগত চাকরটির ন্যায় হাত বেঁধে মনিবের সামনে হাজির হয়। এ চাকরটি সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? আপনি নিশ্চয়ই তাকে মুনাফিক, বিদ্রোহী ও নিমকহারাম প্রভৃতি নামে অভিহিত করতে একটুও কুণ্ঠিত হবেন না। কিন্তু আল্লাহর কোন চাকর যখন এ ধরনের হাস্যকর আচরণ করতে থাকে তখন তাকে আপনারা কি বলতে থাকেন? তখন আপনারা কাউকে 'পীর সাহেব', কাউকে 'হযরত মাওলানা', কাউকে 'বড় কামেল', 'পরহেযগার' প্রভৃতি নামে ভূষিত করেন। এর কারণ এই যে, আপনারা তাদের মুখে মাপ মত লম্বা দাড়ি

দেখে, তাদের পায়জামা পায়ের গিরার দু' ইঞ্চি ওপরে দেখে, তাদের কপালে নামাযের কালো দাগ দেখে এবং তাদের লম্বা লম্বা নামায ও মোটা মোটা দানার তাসবীহ দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন ; এদেরকে বড় দ্বীনদার ও ইবাদাতকারী বলে মনে করেন। এ ভুল শুধু এজন্য যে, 'ইবাদাত' ও দ্বীনদারীর ভুল অর্থই আপনাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে।

আপনি হয়তো মনে করেন, হাত বেঁধে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো, হাটুর ওপর হাত রেখে মাথা নত করা, মাটিতে মাথা রেখে সিজদা করা এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করা— শুধু এ কয়টি কাজই প্রকৃত ইবাদাত। হয়ত আপনি মনে করেন, রমযানের প্রথম দিন হতে শাওয়ালের চাঁদ উঠা পর্যন্ত প্রত্যেক দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার বন্ধ রাখার নাম ইবাদাত। আপনি হয়তো এটাও মনে করেন যে, কুরআন শরীফের কয়েক রুকূ' পাঠ করার নামই ইবাদাত, আপনি বুঝে থাকেন মক্কা শরীফে গিয়ে কা'বা ঘরের চারদিকে তাওয়াফ করার নামই ইবাদাত। মোটকথা, এ ধরনের বাহ্যিক রূপকে আপনারা 'ইবাদাত' মনে করে নিয়েছেন এবং এ ধরনের বাহ্যিক রূপ বজায় রেখে উপরোক্ত কাজগুলো কেউ সমাধা করলেই আপনারা মনে করেন যে, ইবাদাত সুসম্পন্ন করেছে এবং وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ (الذريت · ٥٦)- এর উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছে। তাই জীবনের অন্যান্য ব্যাপারে সে একেবারে আযাদ---নিজের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী কাজ করে যেতে পারে।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তাআলা যে ইবাদাতের জন্য আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যে 'ইবাদাত' করার আদেশ আপনাকে দেয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। সেই ইবাদাত এই যে, আপনি আপনার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তেই আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে চলবেন এবং আল্লাহর আইনের বিরোধী এ দুনিয়ায় যা কিছু প্রচলিত আছে তা অনুসরণ করতে আপনি একেবারে অস্বীকার করবেন। আপনার প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি গতিবিধি আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে হতে হবে। এ পন্থায় যে জীবনযাপন করবেন তার সবটুকুই ইবাদাত বলে গণ্য হবে। এ ধরনের জীবনে আপনার শয়ন-জাগরণ, পানাহার, চলা-ফিরা, কথা বলা, আলোচনা করাও ইবাদাত বিবেচিত হবে। এমন কি নিজ স্ত্রীর কাছে যাওয়া এবং নিজের সন্তানদেরকে স্নেহ করাও ইবাদাতের শামীল হবে। যেসব কাজকে আপনরা 'দুনিয়াদারী' বলে থাকেন তাও 'ইবাদাত' এবং 'দ্বীনদারী' হতে পারে—যদি সকল বিষয় আপনি আল্লাহ নির্ধারিত সীমার মধ্য থেকে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে সমাধা করেন ; আর পদে পদে এদিকে লক্ষ্য রাখেন যে, আল্লাহর কাছে কোন্‌টা জায়েয আর

কোন্‌টা নাজায়েয, কি হালাল আর কি হারাম, কি ফরয আর কি নিষেধ, কোন কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট আর কোন্ কাজে হন অসন্তুষ্ট। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আপনি রুজি ও অর্থোপার্জনের জন্য বের হন। এ পথে হারাম উপার্জনের অসংখ্য সহজ উপায় আপনার সামনে আসবে। এখন আপনি যদি আল্লাহকে ভয় করে সেই সুযোগ গ্রহণ না করেন এবং কেবল হালাল রুজি ও অর্থ উপার্জন করেন তবে এ কাজে আপনার যে সময় লেগেছে তা সবই ইবাদাত এবং এ হালাল উপায়ে অর্জিত অর্থ ঘরে এনে আপনি নিজে খান আর পরিবার-পরিজনের খাদ্যের ব্যবস্থা করেন, সেই সাথে যদি আল্লাহর নির্ধারিত অন্যান্য হকদারের হকও আদায় করেন, তাহলে এসব কাজেও আপনি অসীম সওয়াব পাবেন। পথ চলার সময় আপনি পথের কাঁটা দূর করেন এ ধারণায় যে, এটা দ্বারা আল্লাহর কোন বান্দাহ কষ্ট পেতে পারে তবে এটাও আপনার ইবাদাত বলে গণ্য হবে। আপনি কোন রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষা করলেন, কোন ব্যক্তিকে পথ চলতে সাহায্য করলেন, কিংবা কোন বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করলেন তবে এটাও ইবাদাত হবে। কথাবার্তা বলতে আপনি মিথ্যা, গীবত, কুৎসা রটনা, অশ্লীল কথা বলে পরের মনে আঘাত দেয়া ইত্যাদি পরিহার করেন এবং আল্লাহর ভয়ে কেবল সত্য কথাই বলেন তবে যতক্ষণ সময় আপনার এ কাজে ব্যয় হবে, তা সবই ইবাদাতে অতিবাহিত হবে।

অতএব চেতনা লাভের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর আইন অনুযায়ী চলা এবং তাঁরই নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করার নামই হচ্ছে আল্লাহর ইবাদাত। এ ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। এ ইবাদাত সবসময়ই হওয়া চাই, এ ইবাদাতের জন্য কোন নির্দিষ্ট প্রকাশ্য রূপ নেই, কেবল প্রতিটি রূপের প্রত্যেক কাজেই আল্লাহর ইবাদাত হতে হবে। আপনি একথা বলতে পারেন না যে, আমি অমুক সময় আল্লাহর বান্দাহ আর অমুক সময় আল্লাহর বান্দাহ নই। আপনি একথাও বলতে পারেন না যে, অমুক সময় আল্লাহর ইবাদাতের জন্য, আর অমুক সময় আল্লাহর কোন ইবাদাত করতে হয় না। এ আলোচনা দ্বারা আপনারা ইবাদাত শব্দের অর্থ ভালরূপে জানলেন একথা বুঝতে পারলেন যে, প্রত্যেক মুহূর্তে সকল অবস্থায় আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করে চলার নামই ইবাদাত। এখানে আপনি এ প্রশ্ন করতে পারেন যে, তাহলে এ নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদিকে কি বলা যায়? উত্তরে আমি বলবো যে, এসব ইবাদাত বটে, এ ইবাদাতগুলোকে আপনার ওপর ফরয করে দেয়া হয়েছে শুধু এজন্য যে, আপনার জীবনের প্রধান ও বৃহত্তম উদ্দেশ্য যে, প্রতি মুহূর্তে ও প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহর ইবাদাত করা, সেই বিরাট উদ্দেশ্য আপনি এসবের মাধ্যমে লাভ করবেন। নামায আপনাকে দৈনিক পাঁচবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তুমি আল্লাহ তাআলার দাস--তাঁরই বন্দেগী

করা তোমার কর্তব্য ; রোযা বছরে একবার পূর্ণ একটি মাস আপনাকে এ বন্দেগী করার জন্যই প্রস্তুত করে, যাকাত আপনাকে বার বার মনে করিয়ে দেয় যে, তুমি যে অর্থ উপার্জন করেছো তা আল্লাহর দান, তা কেবল তোমার খেয়াল-খুশী মত ব্যয় করতে পার না। বরং তা দ্বারা তোমার মালিকের হক আদায় করতে হবে। হজ্জ মানব মনে আল্লাহর প্রেম ও ভালবাসা এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির এমন চিত্র অঙ্কিত করে যে, একবার তা মুদ্রিত হলে সমগ্র জীবনেও মন হতে তা মুছে যেতে পারে না। এসব বিভিন্ন ইবাদাত আদায় করার পর আপনার সমগ্র জীবন যদি আল্লাহর ইবাদাতে পরিণত হবার উপযুক্ত হয়, তবেই আপনার নামায প্রকৃত নামায হবে, রোযা খাঁটি রোযা হবে, যাকাত সত্যিকার যাকাত এবং হজ্জ আসল হজ্জ হবে এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ উদ্দেশ্য হাসিল না হলে কেবল রুকূ'-সিজদাহ, অনাহার-উপবাস, হজ্জের অনুষ্ঠান পালন করা এবং যাকাতের নামে টাকা ব্যয় করলে আপনার কিছুই লাভ হবে না। বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক ইবাদাতগুলোকে মানুষের একটি দেহের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এতে প্রাণ থাকলে এবং চলাফিরা বা কাজ-কর্ম করতে পারলে নিসন্দেহে তা জীবিত মানুষের দেহ, অন্যথায় তা একটি প্রাণহীন দেহ মাত্র। লাশের চোখ, কান, হাত, পা সবকিছুই বর্তমান থাকে ; কিন্তু প্রাণ থাকে না বলেই তাকে আপনারা মাটির গর্তে পুতে রাখেন। তদ্রূপ নামাযের আরকান-আহকাম যদি ঠিকভাবে আদায় করা হয় কিংবা রোযার শর্তাবলীও যদি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়, কিন্তু হৃদয় মনে আল্লাহর ভয়, আল্লাহর প্রেম-ভালবাসা এবং তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য করার ভাবধারা বর্তমান না থাকে —ঠিক যে জন্য এসব আপনার ওপর ফরয করা হয়েছিল, তবে তাও একটি প্রাণহীন ও অর্থহীন জিনিস হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আপনাদের ওপর এই যে, বিভিন্ন ইবাদাত ফরয করা হয়েছে, এসব কিভাবে এবং কি উপায়ে আপনাকে সেই আসল ও বৃহত্তম ইবাদাতের জন্য প্রস্তুত করে, সেই ইবাদাতগুলোকে যদি আপনি বুঝে শুনে আদায় করেন, তবে তা থেকে আপনার জীবনে কি প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে পরবর্তী প্রবন্ধে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো—ইনশাআল্লাহ।

নামায

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আমি ইবাদাতের প্রকৃত অর্থ বর্ণনা করেছি। এ 'ইবাদাতের' উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে আল্লাহ তাআলার খাঁটি বান্দাহ হিসেবে প্রস্তুত করার জন্য ইসলামে কয়েকটি নির্দিষ্ট ইবাদাত ফরয করা হয়েছে। সুতরাং এবারে কেবল 'নামায' সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করতে চাই।

আপনারা পূর্বের প্রবন্ধে জানতে পেরেছেন যে, 'ইবাদাত'-এর আসল অর্থ বন্দেগী বা দাসত্ব করা। তাই আপনাকে যখন শুধু দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তখন আপনি কখনো এবং কোন অবস্থাতেই আল্লাহর দাসত্ব হতে মুক্ত হতে পারেন না। 'এত মিনিট কিংবা এত ঘন্টার জন্য আমি আল্লাহর দাস, অন্য সকল সময় তা নই'—একথা আপনি যেমন বলতে পারেন না, তদ্রূপ আপনি একথাও বলতে পারেন না যে, 'আমি এতক্ষণ আল্লাহর ইবাদাতে অতিবাহিত করবো এবং অন্য সময়ে আমার পূর্ণ আযাদী—তখন যা ইচ্ছা তাই করবো। যেহেতু আল্লাহর গোলাম—আল্লাহর দাস হিসেবেই আপনার জন্ম হয়েছে। কেবল তাঁর গোলামী ও দাসত্ব করার জন্য আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব আপনার সমগ্র জীবনই তাঁর গোলামী ও দাসত্বে অতিবাহিত হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়, জীবনের কোন একটি মুহূর্তও আপনি তাঁর 'ইবাদাত' ও দাসত্ব হতে মুক্ত হতে পারেন না।

পূর্বে একথাও আপনাকে বলেছি যে, দুনিয়ার কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে এক কোণায় বসে যাওয়া এবং 'আল্লাহু' 'আল্লাহু' করার নাম ইবাদাত নয়। বরং এ দুনিয়ায় আপনি যে কাজই করুন না কেন তা ঠিক আল্লাহর আইন ও বিধান অনুসারে করার অর্থই হচ্ছে ইবাদাত। আপনার শয়ন-নিদ্রা, আপনার জাগরণ ও বিশ্রাম, পানাহার, চলা-ফেরা—মোটকথা সবকিছুই আল্লাহর আইন ও বিধান অনুযায়ী আপনাকে করতে হবে। আপনার স্ত্রী-পুত্র, ভাই-ভগ্নি এবং আত্মীয়গণের সাথে ঠিক আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করবেন। বন্ধু-বান্ধবের সাথে হাসি-তামাশা ও কথাবার্তা বলার সময়ও আপনার স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা আল্লাহর দাসত্ব-শৃঙ্খল হতে মুক্ত নই। কামাই রোযগারের টাকা-পয়সা আদান-প্রদানের সময়ও আপনাকে প্রত্যেকটি কাজে ও কথায় আল্লাহর বিধি-নিষেধ লক্ষ্য রাখতে হবে এবং কখনো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করতে পারেন না। রাতের অন্ধকারে কোন পাপের কাজ করা যদি খুবই সহজ হয়ে পড়ে এবং তা করলে কেউ দেখতে পাবে না বলে আপনি মনে

করেন, ঠিক তখনো আপনি স্মরণ রাখবেন যে, আর কেউ দেখুক আর না-ই দেখুক, আল্লাহ তাআলা সবকিছু দেখছেন এবং আপনার মনে আল্লাহর ভয় বদ্ধমূল হওয়া উচিত, মানুষের ভয় নয়। গভীর জঙ্গলে বসেও যদি কোন পাপের কাজ করতে ইচ্ছা করেন এবং যদি মনে করেন পুলিশ বা অন্য কোন লোক তা দেখতে পাবে না, তখনো আপনি কেবল আল্লাহকে ভয় করে পাপ পরিহার করবেন। যখন মিথ্যা কথা, দুর্নীতি, বেঈমানী, যুলুম ও শোষণ করে বহু স্বার্থ লাভ করতে পারেন এবং আপনাকে বাধা দেয়ার কেউ না থাকে, তখনো আপনি আল্লাহকে ভয় করবেন এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির আশংকায় এ স্বার্থের কাজ থেকে বিরত থাকবেন। পক্ষান্তরে সততা ও ন্যায়-নীতি রক্ষা করে চলায় আপনাকে যদি ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্তও হতে হয়, তথাপি আপনি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়ই এ ক্ষতি স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবেন না। অতএব দুনিয়ার বিপুল কর্মজীবন পরিত্যাগ করে (ঘর বা মসজিদের) কোণে বসে তাসবীহ পড়াকে 'ইবাদাত' বলা যায় না। বস্তুত দুনিয়ার এ গোলক ধাঁধায় জড়িত হয়ে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করার নামই 'ইবাদাত'। মুখে কেবল 'আল্লাহু' 'আল্লাহু' শব্দ উচ্চারণ করাকেই আল্লাহর 'যিকর' বলা যায় না। দুনিয়ার কাজ-কর্ম ও ঝামেলার কঠিন জালে জড়িত হয়েও আল্লাহকে বিস্মৃত না হওয়াই আসল আল্লাহর যিকর। যেসব জিনিস মানুষকে আল্লাহর কথা ভুলিয়ে দেয় তাতে জড়িত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে বিস্মৃত না হওয়া, বড় বড় স্বার্থ হাসিলের লোভ এবং বিরাট ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর আইন লংঘন করার যখন সুযোগ এসে যায় তখনও আল্লাহকে স্মরণ করা এবং দৃঢ়তার সাথে তাঁর আইন অনুসরণ করে চলাই সত্যিকার 'যিকরুল্লাহ' বা আল্লাহর যিকর। এ যিকরের দিকে ইংগিত করা হয়েছে কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ(الجمعة : ١٠)

"নামায পূর্ণরূপে আদায় হয়ে গেলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় ; আল্লাহর দান জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা কর এবং এ প্রচেষ্টা ব্যাপদেশে আল্লাহকে খুব বেশী করে স্মরণ কর। তবেই সম্ভবত তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।"–(আল জুমআ ঃ ১০)

'ইবাদাতের' এ অর্থ মনে জাগরুক রাখুন এবং গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, এ বিরাট ও বৃহত্তম 'ইবাদাত' যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্য কি কি জিনিস অপরিহার্য এবং নামায সেসব জিনিসকে মানুষের মধ্যে কিভাবে সৃষ্টি করে। আল্লাহর খাঁটি 'বান্দাহ' হওয়ার জন্য বার বার একথা স্মরণ করা

আবশ্যক যে, আপনি আল্লাহর বান্দাহ এবং প্রত্যেক সময় ও প্রত্যেকটি ব্যাপারেই সেই আল্লাহর বন্দেগী করাই হচ্ছে আপনার কাজ। একথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া এজন্য আবশ্যক যে, মানুষের মনে একটি 'শয়তান' সবসময়ই উপস্থিত থাকে ; সে সবসময়ই মানুষকে নিজের 'দাস' বানাতে চেষ্টা করে। শয়তানের এ প্ররোচনা ও গোলক ধাঁধার জাল ছিন্ন করার জন্য মানুষকে প্রত্যহ বার বার একথা স্মরণ করিয়ে দেয়া একান্ত আবশ্যক যে, "তুমি কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার দাস, তিনি ছাড়া তুমি আর কারো দাস নও—না শয়তানের, না কোন মানুষের।" একথারই অনুভূতি মানুষের মনে জাগরুক করে দেয় নামায। সকাল বেলা ঘুম ভাংতেই তা সর্বপ্রথম এবং সকল কাজের আগে আপনাকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং দিনের বেলা যখন নানা প্রকার কাজে আপনি মশগুল থাকেন তখনো তিন-তিনবার আপনার মনে একথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং রাত্রিকালে যখন নিদ্রার সময় উপস্থিত হয়, তখন শেষবারের মত এরই পুনরাবৃত্তি করে। এরূপে আল্লাহর 'দাস' হওয়ার কথা মানুষকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া নামাযের প্রথম উপকার। এজন্যই কুরআন মজীদে নামাযকে 'যিকর' নামে অভিহিত করা হয়েছে, অর্থাৎ এর দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করা হয়।

তারপর আপনাকে এ জীবনের পদে পদে আল্লাহর বিধি-নিষেধ পালন করে চলতে হবে, কাজেই কর্তব্য জ্ঞান ও দায়িত্ববোধ আপনার মনে সদা জাগ্রত থাকা বাঞ্ছনীয় এবং তা পালন করার অভ্যাসও আপনার থাকা দরকার। 'কর্তব্য' কাকে বলে এটা যে জানে না সে কখনও আল্লাহর বিধান পালন করতে পারে না। পক্ষান্তরে কর্তব্যের অর্থ যে জানে ; কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে সেই কর্তব্য পালন করার কোন আগ্রহ উদ্যোগ তার না থাকে তবে রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টার জন্য তাকে যে শত সহস্র আইন বিধান দেয়া হবে তা যে সে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে পালন করবে, এমন ভরসা কিছুতেই করা যায় না।

যারা পুলিশ কিংবা সৈন্য বিভাগে কাজ করছেন তারা জানেন যে, এ দু'টি বিভাগে কর্তব্যানুভূতি এবং যথাযথভাবে কর্তব্য পালনের ট্রেনিং কত কঠোরতার সাথে দেয়া হয়। রাত-দিনের মধ্যে একাধিকবার বিউগল বাজানো হয়। সৈনিকদেরকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয় এবং তাদের দ্বারা কুচকাওয়ায করানো হয়। এসব কেবলমাত্র কর্তব্য পালনে অভ্যস্ত করার জন্যই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাই এ সমস্ত ব্যাপারে যারা অক্ষম, নিষ্কর্মা ও অযোগ্য প্রমাণিত হয়, যারা 'বিউগলের' আওয়ায শুনেও ঘরে বসে থাকে কিংবা যারা কুচকাওয়াযের সময় নির্দেশ অনুসারে সাড়া না দেয় তাদেরকে প্রথমেই

বরখাস্ত করা হয়। তদ্রূপ নামাযও দিন-রাত পাঁচবার 'বিউগল' বাজায় ; সেই 'বিউগল' শুনা মাত্র আল্লাহর সৈনিকগণ দৌড়িয়ে আসবে এবং প্রমাণ করবে যে, তারা সকল অবস্থাতেই আল্লাহর আইন পালন করতে প্রস্তুত। এ 'বিউগল' শুনেও যারা বসে থাকে, নিজ স্থান হতে একটুও নড়তে যারা প্রস্তুত না হয়, তারা 'কর্তব্যের' অর্থই জানে না, কিংবা কর্তব্যের অর্থ বুঝা সত্ত্বেও আল্লাহর সৈন্য বাহিনীর মধ্যে শামিল হওয়ার যোগ্যতাই তাদের নেই।

এ কারণেই হযরত (সা) বলেছেন ঃ "যারা আযানের আওয়ায শুনেও নিজেদের ঘর হতে বের হয় না তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে আমার ইচ্ছা হয়।" এবং এজন্যই হাদীস শরীফে নামায পড়াকেই কুফর ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্যের প্রধান চিহ্ন বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। নামায পড়ার জন্য যে ব্যক্তি জামায়াতে হাজির না হতো হযরত (সা) এবং সাহাবাদের যুগে তাকে মুসলমানই বলা হতো না। এমনকি যেসব মুনাফিকের মুসলমান হিসেবে পরিণত হওয়ার প্রয়োজন ছিল তারাও নামাযের জামায়াতে শামিল হতে বাধ্য হতো। এজন্যই কুরআন শরীফে মুনাফিকদেরকে এরূপে তিরস্কার করা হয়নি যে, তারা নামায পড়ে না বরং বলা হয়েছে যে, তারা মনের ঐকান্তিক আগ্রহ ও নিষ্ঠা সহকারে নামাযে দাঁড়ায় না, দাঁড়ায় নেহায়েত অবহেলা, অনিচ্ছা ও উপেক্ষা সহকারে।

وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى -

এসব কথা দ্বারা নিসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে যে, বে-নামাযীকে 'মুসলমান' মনে করার কোনই অবকাশ নেই। কারণ, ইসলাম এক নিছক বিশ্বাসমূলক ধর্ম নয় যে, 'কতগুলো কথা' মনে মনে বিশ্বাস করলেই কর্তব্য পালন হয়ে যাবে। বরং এটা সম্পূর্ণ কর্মময় বাস্তব ধর্ম। এমন বাস্তব যে, প্রত্যেকটি মুহূর্তে ইসলাম অনুযায়ী কাজ করা এবং কুফরী ও ফাসেকীর বিরুদ্ধে অনবরত লড়াই করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। এরূপ বিরাট কর্মময় জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে আল্লাহর বিধান পালনের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকা অপরিহার্য। যে ব্যক্তি সেরূপ প্রস্তুত থাকে না, সে ইসলামের জন্য একেবারে নিষ্কর্মা। ঠিক এ কারণেই দিন-রাতের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করে দেয়া হয়েছে। মুসলমানগণ প্রকৃতপক্ষে মুসলমান কিনা এবং বাস্তব কর্মজীবনে সে আল্লাহর হুকুম পালন করতে প্রস্তুত কিনা, এর বাস্তব পরীক্ষা এবং প্রমাণ নেবার জন্যই এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যবস্থা। আল্লাহর প্যারেডের 'বিউগল' শুনে কোন মুসলমান যদি বিন্দুমাত্র সাড়া না দেয়, তবে পরিষ্কার প্রমাণিত হবে যে, সে ইসলামের বিধান মত কর্মজীবন যাপন করতে প্রস্তুত নয়। এরপর যদি

সে আল্লাহকে ও রাসূলকে বিশ্বাস করে তবে তা একেবারেই অর্থহীন। এ জন্যই কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِيْنَ (البقرة : ٤٥)

অর্থাৎ যারা আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করতে প্রস্তুত নয় কেবল সেই শ্রেণীর লোকদের পক্ষেই নামায কঠিন কাজ হয়ে পড়ে। আর যাদের কাছে নামায পড়া কঠিন কাজ বলে বিবেচিত হয়, তারা আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করে জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুত নয় এটাই প্রমাণিত হয়।

তৃতীয়ত, আল্লাহর ভয়। প্রত্যেকটি মুসলমানের মনে এ ভয় সদা-সর্বদা জাগ্রত থাকা একান্ত আবশ্যক। মুসলমান ইসলাম অনুসারে কখনই কাজ করতে পারে না, যদি না তার মনে একই দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে, আল্লাহ তাআলা তাকে সবসময়ই এবং সকল স্থানেই দেখছেন, তার গতিবিধি সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে অবহিত। আল্লাহ অন্ধকারেও তাকে দেখছেন, নিতান্ত সংগীহীন অবস্থায়ও আল্লাহ তার সাথী, সমগ্র দুনিয়া হতে আত্মগোপন করা সম্ভব, কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টি হতে লুকিয়ে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। সমগ্র দুনিয়ার সর্বপ্রকার শাস্তি ও শাসন হতে মানুষ বেঁচে যেতে পারে ; কিন্তু আল্লাহর শাস্তি ও শাসন হতে রেহাই পাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ দৃঢ় বিশ্বাসই মানুষকে আল্লাহর বিধান লংঘন করা হতে বিরত রাখে। এ বিশ্বাসের কারণেই জীবনের যাবতীয় কার্যে আল্লাহর নির্ধারিত হালাল-হারামের সীমা রক্ষা করে চলতে মানুষ বাধ্য হয়। এ বিশ্বাস যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে মুসলমান কিছুতেই খাঁটি মুসলিম জীবনযাপন করতে পারে না। এ বিশ্বাসকে বার বার স্মরণ করার জন্য এবং ক্রমাগত স্মরণের মাধ্যমে মানব মনে এ বিশ্বাস খুব দৃঢ়তার সাথে বদ্ধমূল করার জন্যই আল্লাহ তাআলা পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছেন। কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা নিজেই নামাযের এ স্বার্থকতা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ -

"নামায মানুষকে পাপ, অন্যায় ও অশ্লীলতা এবং লজ্জাহীনতার কাজ হতে বিরত রাখে।" একথার সত্যতা আপনি নিজে চিন্তা করলেই বুঝতে পারেন ঃ আপনি যখন নামায পড়তে যান, তখন পবিত্র হয়ে এবং অযু করে যান, আপনার শরীর যদি নাপাক হয় এবং গোসল না করেই নামাযে হাজির হন, কিংবা আপনি যদি নাপাক কাপড় পরে নামায পড়তে যান, অথবা অযু না থাকা সত্ত্বেও যদি আপনি বলেন যে, আমি অযু করে এসেছি, তাহলে দুনিয়ার কোন লোকই আপনাকে ধরতে পারে না। তবুও তা কখনই করেন না। কিন্তু কেন ?

এজন্য যে, আল্লাহর দৃষ্টি হতে কোন গোনাহ লুকানো সম্ভব নয়, একথা আপনি নিসন্দেহে বিশ্বাস করেন। এমনকি নামাযে যেসব দোআ সূরা নিশব্দে পড়তে হয়, আপনি যদি তা না পড়েন তবে তাও কেউ জানতে পারে না। কিন্তু এরূপ কাজ আপনি এজন্য করেন না যে, আল্লাহ সবকিছুই শুনতে পান, তিনি আপনার একান্ত কাছে অবস্থিত। তদ্রূপ নিবিড় জঙ্গলে গিয়েও আপনি নামায পড়েন, রাতের অন্ধকারেও নামায পড়েন, নিজের ঘরে যখন একেবারে একাকী থাকেন তখনও আপনি নামায পড়েন। অথচ এসব সময় আপনাকে কেউ দেখতে পায় না এবং কেউ জানতে পারে না যে, আপনি নামায পড়েছেন, কি পড়েননি। এর কারণ কি? কারণ এই যে, গোপনে-সমস্ত লোক চক্ষুর আড়ালেও আল্লাহর হুকুম লংঘন করতে আপনি ভয় পান এবং আপনি নিসন্দেহে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর দৃষ্টি হতে কোন অপরাধ গোপন করা সম্ভব নয়। এর দ্বারাই আপনি অনুমান করতে পারেন যে, নামায মানব মনে আল্লাহর ভয় কিভাবে জাগ্রত রাখে এবং আল্লাহ যে হাযের-নাযের, সর্বজ্ঞ ও অন্তর্যামী, এ বিশ্বাস কিভাবে খুবই দৃঢ়তার সাথে মানব মনে বদ্ধমূল করে দেয়। বস্তুত এ ভয় এবং এ দৃঢ় বিশ্বাস আপনার মনে বদ্ধমূল ও সদাজাগ্রত না থাকলে রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টা আপনি আল্লাহর ইবাদাত ও বন্দেগী কিরূপে করতে পারেন? আপনার মনে এ ভয় যদি না থাকে তবে রাত-দিনের অসংখ্য কাজ-কর্মে আল্লাহকে ভয় করে ন্যায় ও পুণ্যের পথে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা এবং সকল প্রকার পাপ ও নাফরমানী হতে দূরে থাকা আপনার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হতে পারে?

চতুর্থত, ইবাদাত করার জন্য আল্লাহর আইন পূর্ণরূপে জেনে নেয়া আপনার পক্ষে অপরিহার্য। কারণ আইন না জানলে আপনি তা অনুসরণ করবেন কিরূপে? নামাযই আপনার এ প্রয়োজন পূর্ণ করে। নামাযের মধ্যে কুরআন শরীফের আয়াত পাঠ করার বিধান এজন্যই দেয়া হয়েছে। এর সাহায্যে দিন-রাত আপনি আল্লাহর আইন ও বিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। জুমআর নামাযের পূর্বে 'খোতবা'র নিয়মও এ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, এর দ্বারা আপনি ইসলামের বিধান জানতে পারেন। জামায়াতের সাথে নামায ও জুমআর নামায পড়ার আর একটি উপকারিতা এই যে, এ উদ্দেশ্যে আলেম ও অশিক্ষিত লোকদের এক স্থানে বারবার একত্র হতে হয় এবং সকলের পক্ষেই আল্লাহর বিধান জানার অপূর্ব সুযোগ ঘটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনারা নামাযে যা কিছু পড়েন তা থেকে আল্লাহর হুকুম জানতে চেষ্টা করেন না, জুমআর খোতবা এমনভাবে দেয়া হয় যে, বারবার শোনার পরও ইসলাম সম্পর্কে আপনাদের কোন জ্ঞান হয় না এবং জামায়াতের সাথে নামায পড়ার জন্য একত্র হওয়া সত্ত্বেও না আলেমগণ অশিক্ষিতগণকে কিছু শিক্ষা দেন, না অশিক্ষিত লোকেরা আলেমদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করেন, একে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যেতে

পারে ? নামায আপনাদেরকে এ বিষয়ে অবাধ সুযোগ করে দেয়। আপনারা যদি তা থেকে এ উপকার লাভ না করেন, তবে নামাযের অপরাধ কি ?

পঞ্চমত, জীবনের এ বিরাট কর্মক্ষেত্রে মুসলমান নিসঙ্গ থাকতে পারে না। বরং সমস্ত মুসলমানদের একত্রে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকা, মিলিতভাবে আল্লাহর বিধান পালন করা তাঁর বিধান অনুযায়ী নিজেদের জীবন গঠন করা এবং দুনিয়ায় আল্লাহর আইন জারী করার জন্য একে অপরের সহযোগিতা করা তাদের অবশ্য কর্তব্য। আপনি জানেন যে, এ জীবন ক্ষেত্রে একদিকে মুসলমান —আল্লাহর আদেশানুগত বান্দাহ এবং অন্যদিকে আল্লাহদ্রোহী ও কাফের লোকদের দল রয়েছে। রাত-দিন আল্লাহর আদেশ পালন এবং আল্লাহদ্রোহিতার মধ্যে অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম চলছে। কাফেরগণ আল্লাহর আইন লংঘন করতে এবং এর বিরুদ্ধে দুনিয়ায় শয়তানের আইন জারী করছে, এদের মোকাবিলায় এক একটি 'মুসলমান' বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলে কখনও জয়লাভ করতে পারে না। তাই আল্লাহর বান্দাহদের পক্ষে একত্র হয়ে একটি মিলিত ঐক্য শক্তির বলে আল্লাহর দুশমনদের সাথে মোকাবিলা করা এবং দুনিয়ায় আল্লাহর আইন জারীর চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু নামায ভিন্ন আর কিছুই এ বিরাট ঐক্য শক্তি গঠন করতে পারে না। দিন রাত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামায়াত, সাপ্তাহিক জুমআর নামাযের বড় জামায়াত, তারপর বছরে দু' ঈদের নামাযের বিরাট সম্মেলন -- এসব কিছু মিলে মুসলমানদেরকে একটি সুদৃঢ় দেয়ালের মত গড়ে তোলে এবং তাদের মধ্যে চিন্তা, ভাব, মত ও কর্মের সেই ঐক্য জাগিয়ে তোলে যা মুসলমানদেরকে নিত্য নৈমত্তিক কাজে পরস্পরের সাহায্যকারী রূপে গড়ে তোলার জন্য একান্ত অপরিহার্য।

নামাযে কি পড়েন

নামায মানুষকে আল্লাহর ইবাতাদ, দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করে চলার জন্য কিভাবে প্রস্তুত করে, তা পূর্বে বিস্ত্রারিতরূপে আলোচনা করেছি। এ প্রসঙ্গে যা কিছু লেখা হয়েছে তা পাঠ করে আপনি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছেন যে, একজন মানুষ যদি আল্লাহর হুকুম এবং ফরয মনে করে রীতিমতো নামায আদায় করে, তবে সে নামাযের দোআ ও সূরাগুলোর কোন অর্থ বুঝতে না পারলেও এ নামায তার মনে আল্লাহর ভয়, আল্লাহর হাযের-নাযের হওয়ার কথা এবং তাঁর আদালতে একদিন উপস্থিত হওয়ার বিশ্বাস নিসন্দেহে সবসময়ই জাগরুক রাখবে। সবসময় সে মনে করবে যে, সে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো দাস নয়—আল্লাহই তার প্রকৃত বাদশাহ এবং প্রভু। এরই ফলে তার মধ্যে কর্তব্য পালনের অভ্যাস হবে এবং সকল অবস্থায়ই সে আল্লাহর বিধান পালন করে চলার জন্য প্রস্তুত থাকবে। মানুষের সমগ্র জীবনকে আল্লাহর বন্দেগীর অধীনে যাপন করতে এবং গোটা জীবনকে ইবাদাতে পরিণত করতে হলে যেসব গুণ-সিফাত অবশ্য প্রয়োজনীয় তাও এ নামাযের সাহায্যে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়। নামায দ্বারা এ উপকার কিরূপে লাভ করা যায় তাও আপনারা পূর্বের প্রবন্ধে ভালভাবে বুঝতে পেরেছেন আশা করি।

এখন বুঝে দেখতে হবে যে, নামাযের দোআ ও সূরাগুলোর অর্থ না বুঝে নামায পড়লে যদি এতবড় উপকার লাভ করা যায়, তাহলে কেউ যদি নামায ভালভাবে বুঝে-শুনে পড়ে, সে যা পড়ছে তা যদি সে হৃদয়-মন দিয়ে বুঝতে ও অনুভব করতে পারে তবে তার বিশ্বাস, মতবাদ, চিন্তাধারা এবং অভ্যাস ও স্বভাবের কি বিরাট পরিবর্তন সাধিত হতে পারে এবং তার গোটা জীবন কিরূপ আদর্শে গঠিত হতে পারে, এখানে আমি এ বিষয়ই পুংখানুপুংখরূপে আলোচনার চেষ্টা করবো।

সর্বপ্রথম আযান সম্বন্ধে ভেবে দেখুন। দৈনিক পাঁচবার আপনাকে কি বলে ডাকা হয়? বলা হয়ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ —'আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সকলের বড়।'

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ —'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ মা'বুদ নেই। বন্দেগীর যোগ্য আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই।'

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ —'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।'

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ —'নামাযের জন্য আস।'

حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ —'যে কাজে কল্যাণ ও মঙ্গল সেই কাজের দিকে আস।'

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ —'আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়।'

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ —'আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নেই।'

ভেবে দেখুন, এটা কত বড় শক্তিশালী ডাক। এ ডাক প্রত্যেক দিন পাঁচবার আপনাদেরকে একথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, "পৃথিবীতে যতবড় খোদায়ীর দাবীদার দেখা যাচ্ছে, তারা সকলেই মিথ্যাবাদী, আকাশ ও পৃথিবীতে মাত্র একজনই খোদায়ী ও প্রভুত্বের অধিকারী এবং কেবল তিনি ইবাদাতের যোগ্য। আসুন আমরা সকলে মিলে তাঁরই ইবাদাত করি। ইবাদাতেই আমাদের সকলের জন্য ইহকালের ও পরকালের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত।"

এ মর্মস্পর্শী আওয়ায শুনে কে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে পারে ? যার অন্তরে বিন্দুমাত্র ঈমান আছে, এতবড় নির্ভীক সাক্ষ্য এবং এত স্পষ্ট আহ্বান শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা তার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয় এবং প্রকৃত প্রভু-মালিকের দরবারে হাজির হয়ে তাঁর সামনে মাথা নত না করেও সে কিছুতেই থাকতে পারে না।

এ ডাক শুনেই আপনি উঠে পড়েন এবং সর্বপ্রথমেই আপনি চিন্তা করে দেখেন, আমি কি পবিত্র, না অপবিত্র ? আমার জামা-কাপড় পাক কিনা ? আমার অযু আছে কি নেই ? অন্য কথায় আপনার সুস্পষ্ট অনুভূতি থাকে যে, উভয় জাহানের বাদশাহের দরবারে হাজিরা দেয়ার বিষয়টি পৃথিবীর অন্যান্য সকল বিষয় হতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। অন্যান্য কাজ তো সকল অবস্থাতেই করা যায়, কিন্তু এ মহান দরবারে শুধু দেহ ও কাপড়-চোপড়ের পবিত্রতাই যথেষ্ট নয় অতিরিক্ত (বিশেষ) পবিত্রতাও (অর্থাৎ অযু) একান্ত অপরিহার্য। এরূপ পবিত্রতা ছাড়া এখানে হাজিরা দেয়া ভীষণ বেয়াদবী। এ অনুভূতির সাথেই আপনি প্রথমে পবিত্র হওয়ার কথা চিন্তা করেন এবং তারপরে অযু করা আরম্ভ করেন। এ অযুর সময়ে যদি আপনি প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগ ধোয়ার সময় এবং অযু শেষ করার পর হযরত নবী করীম (সা)-এর শিখানো দোআসমূহ পাঠ করেন এবং আল্লাহকে যথাযথরূপে স্মরণ করেন, তাহলে শুধু যে আপনার অংগ-প্রত্যংগই

ধোয়া হবে তা নয়, বরং আপনার অন্তরকেও ধৌত (পবিত্র) করা হবে। অযু শেষ করার পর নিম্ন দোআ পড়তে হবে ঃ

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক ও অদ্বিতীয় লা-শরীক আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর বান্দাহ এবং রাসূল। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং আমাকে পবিত্রতা অবলম্বনকারী বানাও।"

এরপর আপনি নামাযের জন্য দাঁড়ান। আপনার মুখ থাকে পবিত্র কেবলার দিকে। আপনি পাক-পবিত্র হয়ে সমগ্র জাহানের বাদশাহের দরবারে হাজির হন।

সর্বপ্রথমেই আপনার মুখ থেকে বের হয় ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ 'আল্লাহ সবচেয়ে বড়।'

মনে ও মুখে এ বিরাট অঙ্গীকার উচ্চারণ করে আপনি দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় জিনিস হতে নিজের সম্পর্কচ্ছেদ করার প্রতীক হিসেবে কান পর্যন্ত দু' হাত তোলেন এবং আপনার বাদশার সামনে হাত বেঁধে দণ্ডায়মান হন। এরপরে নিরতিশয় বিনয় সহকারে আপনি আরম্ভ করেন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ

"হে আল্লাহ ! আমি তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার নামের বরকত ও মাহাত্ম্য সত্যিই অতুলনীয়। তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ, তোমার সম্মান সকলের উচ্চে। তুমি ছাড়া কেউ মা'বুদ নেই।"

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ -

"অভিশপ্ত মরদুদ শয়তানের কবল হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

"মেহেরবান-দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ ۝ اٰمِيْنَ -

—"সারাজাহানের পালনকর্তা মহান আল্লাহর জন্যই সমগ্র ও সর্বপ্রকার তারীফ-প্রশংসা।

—তিনি অত্যন্ত দয়াময় ও মেহেরবান।

—তিনি বিচার দিনের একমাত্র মালিক। যেদিন মানুষের যাবতীয় কর্মের বিচার করা হবে এবং প্রত্যেককে তার কর্মের ফল ভোগ করতে হবে।

—হে মালিক ! আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।

—আমাদেরকে সহজ, সোজা, সঠিক পথ দেখাও।

—তাদের পথ, যারা তোমার অনুগ্রহ ও পুরস্কার প্রাপ্ত।

—আর যারা অভিশপ্ত ও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত নয়।

—হে আল্লাহ ! আমাদের দোআ কবুল কর, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো।

এরপর কুরআন শরীফের কয়েকটি আয়াত পড়তে হয়। কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াতই অমৃতে পরিপূর্ণ। তাতে অমূল্য উপদেশ, শিক্ষা এবং সত্য পথের দিকে আহ্বান রয়েছে। সূরা ফাতেহায় যে সহজ ও সোজা পথের জন্য দোআ করা হয়, তাতে সেই সোজা পথেরই হেদায়াত ও বিবরণ দেয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কয়েকটি সূরার উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

"কালের শপথ ! সমগ্র মানুষ ধ্বংসের মুখে। কেবল তারা ছাড়া যারা ঈমানদার এবং (ঈমানের দাবী অনুযায়ী) সৎকর্মশীল এবং যারা পরস্পর পরস্পরকে সত্য পথে চলতে উপদেশ ও পরামর্শ দেয় এবং সত্য পথে দৃঢ় ও মযবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে (কেবল তারাই ধ্বংসের পথ হতে রক্ষা পেতে পারে)।"

এ ছোট সূরাটি হতে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, ধ্বংস ও ব্যর্থতা হতে মানুষ কেবল একটি মাত্র উপায়ে বাঁচতে পারে। তা এই যে, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী আমল করাই যথেষ্ট নয়, বরং সাথে সাথে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকদের এমন একটা সুসংগঠিত দলও থাকা আবশ্যক, যে দল পরস্পরকে এবং দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে সত্যের পথে—ন্যায়ের দিকে আহ্বান জানাবে এবং সর্বপ্রকার দুঃখ-বিপদে আল্লাহর দ্বীন ইসলামের ওপর সুদৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে।

কিংবা অন্য কোন সূরা যেমন ঃ

أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝

"হিসাব-নিকাশের দিন-- কেয়ামতের প্রতি অবিশ্বাসী ব্যক্তি কি রকম হয়, তা তুমি দেখেছ কি ? এ ধরনের মানুষই এতিমকে বিতাড়িত করে এবং গরীব মিসকীনকে নিজেরা তো আহার দান করেই না-- এমনকি অন্য লোকদেরকেও এ কাজে উৎসাহিত করার জন্য এতটুকু কষ্টও স্বীকার করে না। এমন সব নামাযীর জন্য ধ্বংস (পরকালের প্রতি অবিশ্বাস করার কারণে) যারা নামাযে গাফলতি করে, এরা নামায পড়লেও তা কেবল লোক দেখানোর জন্যই পড়ে এবং তাদের মন এত সংকীর্ণ যে, অতি সামান্য ও ছোট-খাটো জিনিসও অভাবীদেরকে দিতে কুণ্ঠিত হয়।"

এ সূরাটির মূল শিক্ষা এই যে, পরকালের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করা ইসলামের প্রাণ স্বরূপ। (এটা না থাকলে ইসলামের কাজই প্রাণহীন দেহের মতই অর্থহীন)। এছাড়া কোন মানুষই আল্লাহর দেখানো সহজ সরল পথে চলতে পারে না। আর একটি সূরা ঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ۝ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝

"অন্যের দোষ অন্বেষণ করা এবং পরকে হীন প্রতিপন্ন করে অপমানসূচক কথা বলা-ই যাদের অভ্যাস তাদের সকলের জন্য আফসোস। তারা কেবল টাকা-পয়সা জমা করে এবং (তা কি রকম বাড়ছে) বার বার গুণে দেখে। তাদের ধারণা এই যে, তাদের ধন-সম্পত্তি তাদের কাছে চিরদিন থাকবে। তা কখনই নয়। একদিন তারা নিশ্চয় মরবে এবং হুতামা নামক জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তুমি কি জান হুতামা কি ? তা আল্লাহর জ্বালানো অগ্নিকুণ্ড ; তার লেলিহান শিখা কলিজা পর্যন্ত ভষ্ম করে। তা বড় এবং সুউচ্চ স্তম্ভের ন্যায় অগ্নি শিখা যা তাদেরকে ঘিরে ফেলবে।"

এভাবে নামাযে কুরআন শরীফের যেসব সূরা এবং আয়াত পাঠ করা হয় তাদের মধ্যে কোন না কোন মূল্যবান শিক্ষা এবং উপদেশ থাকে। তা মানবকে

স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয় যে, মানুষের প্রতি আল্লাহর এ হুকুম অনুসারে দুনিয়াতে কাজ করতে হবে। এসব হেদায়াত ও উপদেশের আয়াত পড়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকূতে যান। হাঁটুর ওপর হাত রেখে দুনিয়া জাহানের আল্লাহ তাআলার সামনে মাথা নত করে বারবার বলতে থাকেন ঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ "অতি পবিত্র আমার মহান পালনকর্তা পরওয়ারদেগার।" তারপরে সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং বলেন ঃ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলো, তার কথা আল্লাহ শুনতে পেয়েছেন।" এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে মাটির সাথে মাথা মিশিয়ে সেজদা করেন এবং বলেন ঃ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى "আমি মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।"

তা পড়ে মাথা উঠান এবং আদবের সাথে বসে পাঠ করেন ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

—আমাদের সব সালাম-শ্রদ্ধা, আমাদের সব নামায এবং সকল প্রকার পবিত্রতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে।

হে নবী ! আপনার প্রতি সালাম, আপনার ওপর আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।

আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাহদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ প্রভু ও মা'বুদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ তাআলার বান্দাহ এবং রাসূল।"

এভাবে আপনি যখন সাক্ষ্য দেন তখন আপনাকে শাহাদাত আঙ্গুল ওঠাতে হয়। কেননা এ অঙ্গুলি সংকেত দ্বারা নামাযের মধ্যেই আপনার আকীদা ও বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করা হয় এবং এ সাক্ষ্যের কথাটি মুখে বলার সময় বিশেষভাবে মনোযোগ স্থাপন করতে এবং মন-মগযের ওপর বিশেষ জোর দিতে হয়। এরপর আপনাকে নিম্নের দরূদ পাঠ করতে হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ـ

"হে আল্লাহ ! দয়া ও রহমত কর আমাদের সরদার ও নেতা হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি, যেমন তুমি রহমত করেছো হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই তুমি অতি উত্তম গুণের আধার এবং মহান। হে আল্লাহ ! বরকত নাযিল কর আমাদের সরদার ও নেতা হযরত মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর বংশধরদের ওপর, যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর বংশধরদের ওপরে করেছো। নিশ্চয়ই তুমি অতীব সৎগুণ বিশিষ্ট ও মহান।"

দরূদ পড়ার পরে আল্লাহর কাছে এভাবে দোআ করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ـ

"হে আল্লাহ ! আমি জাহান্নামের আযাব হতে বাঁচার জন্য তোমার কাছে আশ্রয় চাই। কবরের আযাব থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। সেই পথভ্রষ্টকারী দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, যে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। তোমার কাছে আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর অনিষ্ট থেকে। হে আল্লাহ ! অন্যায় কাজ এবং ঋণ থেকেও তোমার কাছে আশ্রয় চাই।"

এ দোআ পাঠ করার পর নামায পূর্ণ হয়ে যায়। রাব্বুল আলামীনের দরবার থেকে বিদায় নিয়ে সর্বপ্রথম ডান ও বাম দিকে ফিরে উপস্থিত সকলের এবং দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য রহমত ও শান্তি প্রার্থনা করে বলেন ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ "আপনাদের প্রতি আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।" এটা যেন একটি শুভ সংবাদ ; নামাযের পর আল্লাহর দরবার থেকে এ নিয়েই আপনি ফিরে এসেছেন। এভাবেই নামায আদায় করেন অতি ভোরে উঠে দুনিয়ার সব কাজ-কর্ম শুরু করার পূর্বেই। তারপর

অনেক ঘন্টা যাবত দুনিয়ার নানা কাজে লিপ্ত থাকেন। দ্বিপ্রহরের একটু পরেই আবার আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হয়ে নামায আদায় করেন—তার কয়েক ঘন্টা পরেই বেলা তৃতীয় প্রহরেও আবার এ নামায আদায় করেন। আবার কয়েক ঘন্টা কাজ-কর্ম করার পর সূর্যাস্ত হলেই আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে এ নামায আদায় করেন। তারপর দুনিয়ার কাজ-কর্ম শেষ হয়ে গেলে ঘুমাবার পূর্বে শেষবারের মত আল্লাহর সামনে হাজির হন। এ শেষ নামাযের শেষ তিন রাকআতের নাম 'বেতেরের নামায'। এর তৃতীয় রাকআতে আল্লাহর কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞা করেন। এ প্রতিজ্ঞার নাম 'দোআয়ে কুনুত'। এ দোআর মারফতে নামাযী আল্লাহর সামনে অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্রতার সাথে তাঁর আনুগত্য ও দাসত্বের শপথ গ্রহণ করে। তাঁর অনুগত হয়ে চলার ওয়াদা করে। এ প্রতিজ্ঞায় আপনি কি বলেন মনোযোগ সহকারে শুনুন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ - وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ -

"হে আল্লাহ ! আমরা তোমার কাছে সাহায্য চাই। তোমার কাছে গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। তোমার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি। আমরা কেবলমাত্র তোমার ওপরেই ভরসা করি। সর্বপ্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলের সাথে তোমার প্রশংসা করি। আমরা তোমার শোকর আদায় করি, তোমার দানকে অস্বীকার করি না। আমরা তোমার কাছে ওয়াদা করছি যে, তোমার অবাধ্য লোকদের সাথে আমরা কোন সম্পর্ক রাখবো না — তাদেরকে পরিত্যাগ করবো। হে আল্লাহ ! আমরা তোমারই দাসত্ব স্বীকার করি। কেবলমাত্র তোমার জন্যই নামায পড়ি, কেবল তোমাকেই সিজদা করি এবং আমাদের সকল প্রকার চেষ্টা সাধনা ও সকল কষ্ট স্বীকার কেবল তোমার সন্তুষ্টির জন্যই। কষ্ট আমরা কেবল তোমারই রহমত লাভের আশায় করি, তোমার আযাবকে আমরা ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার আযাবে কেবল কাফেরগণই নিক্ষিপ্ত হবে।"

একটু ভেবে দেখুন, যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচবার আযানের ধ্বনি শুনে এবং চিন্তা করে দেখে যে, কত বড় কথা সেই আযানেই ঘোষণা করা হচ্ছে এবং তা দ্বারা কত বড় মহান বাদশাহর কাছে হাজির হবার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। প্রতিবার আযান শুনে যে ব্যক্তি তা মনে মনে অনুভব করে নিজের সকল

কাজ-কর্ম ছেড়ে সারাজাহানের মালিক ও প্রভুর দরবারে হাজির হয়, প্রতি নামাযের পূর্বে অযু করে নিজের দেহ ও মনকে পবিত্র করে নেয় এবং বারবার নামাযে উল্লেখিত রূপে সূরা ও দোয়া মনোযোগ সহকারে পাঠ করে প্রকৃতপক্ষে তার হৃদয়-মনে আল্লাহর ভয় না জেগে পারে না। আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে তার লজ্জা না হয়ে পারে না। পাপ ও অন্যায় কাজের কালো চিহ্ন নিয়ে আল্লাহর দরবারে বারবার হাজির হতে তার অন্তরাত্মা নিশ্চয় কেঁপে ওঠবে। নামাযে আল্লাহর দাসত্ব এবং তাঁর আনুগত্য করে চলার কথা বলা এবং আল্লাহকে বিচার দিনের মালিক বলে বারবার স্বীকার করার পর কোন মানুষ বাহির দুনিয়ায় নিজের কাজ-কর্মের মধ্যে ফিরে এসে মিথ্যা কথা বলা, বেঈমানী করা, পরের হক আত্মসাৎ করা, ঘুষ খাওয়া ও দেয়া, সুদ খাওয়া ও দেয়া, অন্য মানুষকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া, নির্লজ্জতা, ব্যভিচার ও অন্যায় প্রভৃতি কাজ কিছুই করতে পারে না কিংবা এগুলো করার পর পুনরায় আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে এসব কথা মুখে স্বীকার করার দুঃসাহস করতে পারে না। আপনি জেনে বুঝে দৈনিক অসংখ্যবার আল্লাহর সামনে স্বীকার করেন, "হে আল্লাহ ! আমি কেবল তোমার দাসত্ব করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।" এটা স্বীকার করে আপনার পক্ষে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করা এবং অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা কেমন করে সম্ভব হতে পারে ? একবার এসব স্বীকার করে তার বিরোধিতা করলে পুনরায় আল্লাহর সামনে হাজির হতে আপনার মন আপনাকে তিরস্কার করবে, লজ্জায় আপনার মাথা নত হয়ে পড়বে। আবার বিরোধিতা করলে আরো বেশী লজ্জা হবে এবং বিবেক আপনাকে আরো বেশী দংশন করবে। সমস্ত জীবন ভরে দৈনিক পাঁচবার নামায পড়া সত্ত্বেও আপনার কাজ-কর্ম ও চরিত্র ঠিক না হওয়া এবং আপনার জীবনের আমূল পরিবর্তন সূচিত না হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এজন্যই আল্লাহ তাআলা নামাযের এ সুফল দান প্রসংগে বলেছেন ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ -

"নিশ্চয়ই নামায মানুষকে লজ্জাহীনতা, অশ্লীলতা ও সর্বপ্রকার পাপকার্য হতে বিরত রাখে।"

কিন্তু মানুষের মন ও চরিত্র সংশোধন করার এতবড় উপায় থাকা সত্ত্বেও এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া সত্ত্বেও যদি কারো চরিত্র ঠিক না হয়, যদি কেউ পাপ পথ থেকে বিরত না থাকে তবে বুঝতে হবে যে, আসলে তারই স্বভাব খারাপ। সে জন্য নামাযের কোন ত্রুটি নেই। পানি ও সাবান কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করে বটে ; কিন্তু তাতে কয়লার ময়লা দূর না হলে সে জন্য পানি ও সাবানের কোন দোষ দেয়া যায় না—দোষ কয়লারই হবে।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আমরা নামাযে যা কিছু পড়ি তা মোটেই বুঝি না বা বুঝেও পড়ি না। আমাদের নামাযে এটা একটি অতি বড় অভাব। এটা শিখার জন্য কিছু সময় ব্যয় করলেই অভাব পূরণ হতে পারে—নিজেদের মাতৃভাষায় নামাযের সব দোআ ও সূরাগুলোর অর্থ ও ভাব অনায়াসেই আপনারা শিখতে পারেন। আমি মনে করি, এতে আপনাদের বড়ই উপকার হবে।

জামায়াতের সাথে নামায

আগের প্রবন্ধগুলোতে আমি শুধু নামাযের বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতার কথাই বলেছি। তা দ্বারা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, এটা কত বড় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এ নামায মানুষের মধ্যে জীবন ব্যাপী বন্দেগীর ভাবধারা কেমন করে জন্মায় এবং কেমন করে তাকে এ বন্দেগীর হক আদায়ের যোগ্য করে তোলে—সে কথাও আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এক্ষণে আমি জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের উপকারিতার কথা আপনাদেরকে বলবো। তা দ্বারা আপনারা খুব ভাল করে বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহ দয়া ও অনুগ্রহ করে এ একই জিনিসের মধ্যে সবরকমের নিয়ামত কিভাবে জমা করে রেখেছেন। শুধু নামাযই আমাদের পক্ষে কম ছিল না ; কিন্তু সেই সাথে জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের আদেশ করে আল্লাহ্ পাক এটাকে দ্বিগুণ উপকারিতার ভাণ্ডার করে দিয়েছেন এবং তাতে এমন এক অপূর্ব শক্তি দান করেছেন, যা মানুষের মধ্যে আমূল পরিবর্তন সৃষ্টি করতে অতুলনীয়।

পূর্বেই বলেছি, জীবনের সর্বক্ষণ নিজেকে আল্লাহর বান্দাহ বলে মনে করা, অনুগত গোলামের ন্যায় মালিকের অধীন হয়ে থাকা এবং মালিকের হুকুম পালনের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকার নামই হচ্ছে ইবাদাত, আর নামায মানুষকে এ ইবাদাতের জন্যই প্রস্তুত করে। এরূপ ইবাদাতের জন্য মানুষের মধ্যে যতগুলো গুণের দরকার, নামায তার সবই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। দাস হওয়ার অনুভূতি, আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর কিতাবের প্রতি ঈমান, পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহভীতি, আল্লাহকে 'আলেমুল গায়েব' বলে স্বীকার করা, তাকে সবসময়ই নিজের কাছে অনুভব করা, আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য সর্বদা নিজেকে প্রস্তুত রাখা, আল্লাহর হুকুমগুলো ভাল করে জানা—নামায এসব এবং এ ধরনের বহু গুণই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে এবং তাকে আল্লাহ তাআলার খাঁটি বান্দাহরূপে গড়ে তোলে।

একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারেন যে, মানুষ নিজে যতই গুণসম্পন্ন হোক না কেন, অন্যান্য মানুষ যতক্ষণ তাঁর সহযোগী ও সাহায্যকারী না হবে ততক্ষণ সে আল্লাহর বন্দেগীর 'হক' পূর্ণরূপে আদায় করতে পারবে না। মানুষ যাদের সাথে দিন-রাত জীবনযাপন করে, সবসময় যাদের সাথে একত্রে কাজ করে, আল্লাহর ফরমাবরদারী করার ব্যাপারে তারা যদি সহযোগিতা না করে, তবে সে কিছুতেই আল্লাহর হুকুম পালনে সমর্থ হয় না।

মানুষ দুনিয়ায় একাকী আসেনি। একাকী থেকে সে কিছু করতেও পারে না। সে পাড়া-প্রতিবেশী ও সহকর্মী এবং জীবন পথের সঙ্গী-সাথীদের সাথে নানাভাবে জড়িত। আল্লাহর হুকুম আহকামও কোন নিসঙ্গ একটি মানুষের জন্য নয়, বরং সকল মানুষের জন্যে—জীবনের সকল প্রকার সম্পর্ক সম্বন্ধ সঠিকভাবে বজায় রাখার জন্যই তা আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে। এখন আল্লাহর হুকুম পালন করার ব্যাপারে যদি সবাই পরস্পরকে সাহায্য করে, সহযোগিতা করে, তবেই তারা এক সাথে আল্লাহর হুকুম পালনকারী হতে পারে। পক্ষান্তরে সকলে মিলে যদি আল্লাহর নাফরমানী শুরু করে কিংবা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক যদি এমন হয় যে, আল্লাহর আদেশ পালনে পরস্পর সহযোগিতা না করে, তবে একজন লোকের পক্ষে সঠিকভাবে নিয়মিত আল্লাহর হুকুম পালন করা এবং আল্লাহর বিধান অনুসারে কাজ করা একেবারেই অসম্ভব।

আপনারা যদি বিশেষ লক্ষ্যের সাথে কুরআন পাঠ করেন, তাহলে জানতে পারবেন যে, আল্লাহ তাআলা কেবল আপনাকেই আল্লাহর অধীন ও অনুগত হতে এবং আল্লাহর হুকুম পালন করে চলতে বলেননি। বরং সেই সাথে আপনাকে এ আদেশও দেয়া হয়েছে, আপনি সমগ্র দুনিয়াকে আল্লাহর অধীন ও অনুগত করে দিবেন, দুনিয়াতে আল্লাহর আইন জারী করবেন। দুনিয়ার যেখানে যেখানে 'শয়তানের' আইন চলছে, তা বন্ধ করবেন এবং সে স্থানে এক ও লা-শরীক আল্লাহ তাআলার আইনের হুকুমাত কায়েম করবেন। আপনার প্রতি আল্লাহ এই যে, বিরাট খেদমতের আদেশ দিয়েছেন একজন লোকের পক্ষে এ কাজ সমাধা করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। এ মতে বিশ্বাসী কোটি কোটি মুসলামনও যদি হয় আর তারা বিভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকে—তাদের মধ্যে কোন যোগাযোগ বা সম্পর্ক না থাকে তবে তারাও 'শয়তানের' সুশৃংখলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত শক্তিকে কিছুতেই পরাজিত করতে পারবে না। এজন্যই মুসলমানদের দলবদ্ধ হওয়া ও পরস্পরকে সাহায্য করা, একে অন্যের পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থক হয়ে দাঁড়ান এবং সকলে মিলে একই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম-সাধনা করা অপরিহার্য।

একটু গভীরভাবে দেখলে একথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এতবড় বিরাট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মুসলমানদের কেবল মিলিত ও একতাবদ্ধ হওয়াই যথেষ্ট নয়। তাদের মিলিত হতে হবে ঠিক পন্থা অনুসারে অর্থাৎ এমনভাবে মুসলমানদের একটি জামায়াত গঠন করতে হবে, যেন তাদের পরস্পরের সাথে সঠিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়—তাদের পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে যেন কোনরূপ দোষ-ত্রুটি না থাকে। তাদের মত, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মনীতির পূর্ণ ঐক্য বর্তমান থাকা চাই। তাদের একজন আমীর ও নেতা হওয়া দরকার, তাদের

মধ্যে সেই নেতার ইশারা অনুসারে কাজ করার অভ্যাস ও স্পৃহা থাকা চাই। তাদেরকে নেতার হুকুম পালন করতে হবে আর তা কতদূরইবা করতে হবে এবং কোন কারণ ঘটলে নেতার বিরোধিতাও করা যেতে পারে—তাও তাদের ভাল করে বুঝে নেয়া আবশ্যক। একথাগুলো মনে রাখুন এবং জামায়াতের সাথে নামায পড়লে এসব গুরুত্বপূর্ণ ভাবধারা নামাযীদের মধ্যে কেমন করে জেগে উঠে তা চিন্তা করে দেখুন।

আযান শোনা মাত্রই সব কাজ-কর্ম ছেড়ে মসজিদের দিকে যাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। কাজেই আযানের সাথে সাথেই মুসলমানদের নিজ নিজ কাজ ত্যাগ করা এবং একই কেন্দ্রের (মসজিদ) দিকে সকলের অগ্রসর হওয়া একটি বিরাট সৈন্যবাহিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সৈন্য শিবিরে 'বিউগলের' আওয়ায হওয়ার সাথে সাথেই প্রত্যেকটি সৈনিক বুঝতে পারে যে, সেনাপতি সকলকে ডাকছেন। এ সময় সকলের মনে একই ভাব উদয় হয়। সেই ভাব হচ্ছে সেনাপতির নির্দেশ পালনের কর্তব্য ও দায়িত্ব। একথা মনে হওয়ার সাথে সাথে সকলে একই কাজ করে, অর্থাৎ যে যেখানে আছে সেখান হতে সে আওয়ায শোনা মাত্রই নির্দিষ্ট স্থানের দিকে দৌড়াতে থাকে। সৈন্যদের জন্য এ পন্থা কেন গ্রহণ করা হয়েছে ? প্রথম এজন্য যেন আলাদাভাবে প্রত্যেকটি সৈনিকের মধ্যে হুকুম পালন করার এবং হুকুম পালনের জন্য সবসময়ই প্রস্তুত থাকার অভ্যাস হবে। দ্বিতীয়ত, সেই সাথে এ ধরনের সকল অনুগত সিপাহীদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী দল গঠিত হবে এবং সেনাপতির আদেশে একই সময় একই স্থানে সমবেত হওয়ার অভ্যাস হবে। এ অভ্যাসটি এজন্য দরকার যে, হঠাৎ কোন ঘটনা যদি দেখা দেয় তখন যেন সকল সিপাহী একই আওয়াযে একই স্থানে হাজির হয়ে কাজ করতে পারে। প্রত্যেক সৈনিক ব্যক্তিগতভাবে যদি খুব বড় বাহাদুর হয়, কিন্তু কাজের সময় ডাকলে অবিলম্বে উপস্থিত হয়ে যদি লড়াই করতে না পারে, তাহলে তাদের বাহাদুরীর কোন মূল্যই থাকে না। ডাক দেয়া মাত্র সৈন্যগণ যদি একত্র না হয় বরং নিজ নিজ ইচ্ছামত এক এক দিকে চলে যায়, তবে এ ধরনের হাজার বীর সৈনিককে শত্রুপক্ষের পঞ্চাশটি সৈনিকের একটি শৃংখলাবদ্ধ দল নাস্তানাবুদ করে দিতে পারে।

ঠিক এ নিয়মেই আযান শুনা মাত্রই কাজ-কর্ম ছেড়ে নিকটস্থ মসজিদে হাজির হবার জন্য মুসলমানকে আদেশ করা হয়েছে যেন সব মুসলমান মিলে আল্লাহর একটি সৈন্যদলে পরিণত হতে পারে। এভাবে দৈনিক পাঁচবার আযান শুনামাত্র হাজির হওয়ার অভ্যাস করানো হয় এজন্য যে, দুনিয়ার সকল প্রকার সৈনিকের তুলনায় এ খোদায়ী সেনাদের কর্তব্য অনেক বেশী, অনেক কঠোর। অন্যান্য ফৌজের পক্ষে বহুকাল পরে হয়ত যুদ্ধ করার প্রয়োজন পড়ে এবং কবে

কোন্ সময় যুদ্ধ বাঁধবে সে জন্য বহু পূর্ব থেকেই এত সব ট্রেনিং দেয়া হয়। কিন্তু এ খোদায়ী ফৌজকে প্রত্যেক মুহূর্তেই শয়তানী শক্তির সাথে লড়াই করতে হয় এবং প্রত্যেকটি মুহূর্তেই সেনাপতির আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। এজন্য মুসলমানদের দিন-রাতের মধ্যে পাঁচবার খোদায়ী 'বিউগল'—আযানের আওয়াযে আল্লাহর শিবির অর্থাৎ মসজিদের দিকে ছুটতে হয়, বলতে হবে যে, দায়িত্ব ও কর্তব্যের তুলনায় তাদের প্রতি এটাকে অনেক অনুগ্রহ করা হয়েছে সন্দেহ নেই।

এ যাবত শুধু আযানের সৌন্দর্য ও সার্থকতার কথাই আলোচনা করা হয়েছে। আযান শুনে সকল মুসলমান মসজিদে হাজির হয়। কেবল এ জমায়েত হওয়ার মধ্যেই অনেক সৌন্দর্য-সার্থকতা নিহিত রয়েছে। এখানে মিলিত হয়ে মুসলমানগণ পরস্পরকে দেখতে পান, চিনতে ও পরিচয় লাভ করতে পারেন।

কিন্তু আপনারা পরস্পরের সাথে এই যে মিলিত ও পরিচিত হন, তা কোন্ সূত্রে ? এ সূত্রে যে, আপনারা এক আল্লাহ তাআলার বান্দাহ, এক রাসূলের অনুসরণকারী, এক কুরআন শরীফই আপনাদের সকলেরই কিতাব—জীবন বিধান এবং আপনাদের সকলেরই জীবনের উদ্দেশ্য এক। সেই একই উদ্দেশ্য লাভ করার জন্য আপনারা মসজিদে একত্র হয়েছেন এবং এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পরও আপনারা প্রত্যেকেই সে একই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য চেষ্টা করবেন ; বস্তুত এ ধরনের পরিচয় এবং এরূপ সাহচর্য স্বাভাবিকভাবে আপনাদের মনে এ খেয়াল জাগিয়ে দেয় যে, আপনারা সকলেই একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত, একই ফৌজের সিপাহী আপনারা। আপনারা একে অপরের ভাই। দুনিয়ায় আপনাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক, আপনাদের লাভ-লোকসানে সকলেই আপনারা শরীক ও আপনাদের পরস্পরের জীবন একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত।

আপনারা যখন পরস্পরের দিকে তাকাবেন তখন ঠিক চোখ-মন অন্তর খুলে উদার দৃষ্টিতে তাকাবেন। শত্রু যে দৃষ্টিতে শত্রুকে দেখে থাকে আপনারা কারো প্রতি সেভাবে তাকান না বরং বন্ধু যেরূপ বন্ধুর দিকে তাকায়, ভাই যে চোখে ভাইয়ের দিকে তাকায় ঠিক সেই দৃষ্টিতেই একজন অপরজনের প্রতি তাকিয়ে থাকেন। এভাবে তাকাবার ফলে আপনি যখন কোন ভাইকে পুরাতন ও ছেড়া কাপড় পরিহিত দেখতে পাবেন, কাউকে বিশেষ চিন্তিত বিপদগ্রস্ত বা ক্ষুধার্ত দেখবেন, কাউকে দেখবেন অক্ষম পংগু, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও অন্ধ তখন আপনার অন্তরে আপনা আপনিই সহানুভূতি ও দয়ার উদ্রেক হবে। আপনারা ধনী লোকেরা গরীব ও অসহায় দুঃস্থদের দুঃখ অনুভব করবেন, ফকীর-মিসকীন

লোকেরা ধনীদের কাছে পৌঁছে নিজেদের দুরবস্থার কথা বলার সাহস পাবে। কারো সম্পর্কে যদি আপনি জানতে পারেন যে, সে অসুস্থ কিংবা বিপদগ্রস্ত বলে মসজিদে আসতে পারেনি তখন তাকে দেখতে যাবার জন্য আপনার মনে আগ্রহ হবে। কারো মৃত্যু সংবাদ পেলে জানাযা পড়তে যেতে পারেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতে পারেন। বস্তুত এ কাজই আপনাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর ভালবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করবে।

আর একটু ভেবে দেখুন---আপনারা যেখানে একত্র হন তা একটি পাক-পবিত্র স্থান। এ পাক স্থানে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আপনারা একত্র হয়ে থাকেন। চোর-ডাকাত, শরাবী আর জুয়াড়ী দলও এক স্থানে একত্র হয় বটে ; কিন্তু তাদের সকলের মন অসৎ ইচ্ছায় পরিপূর্ণ থাকে। কিন্তু আপনাদের সমবেত হওয়াকে এদের সাথে তুলনা করা যায় না। কারণ এখানে আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণই একত্র হয়ে থাকেন—আল্লাহর ইবাদাতের জন্য আপনাদের এ সম্মেলন আল্লাহর ঘরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আল্লাহর সামনে বন্দেগী ও দাসত্বের কথা খালেছ মনে স্বীকার করার জন্যই এখানে সকলে সবতে হন। এমতস্থানে ঈমানদার লোকদের মনে আপনা আপনি নিজ নিজ গুনাহের জন্য লজ্জার অনুভূতি জেগে উঠে। অন্য দিকে যদি কোন মানুষ অন্য কারো সামনে কোন গুনাহের কাজ করে থাকে, আর সেই ব্যক্তি যদি মসজিদে হাজির হয়, তাহলে কেবল এতেই গুনাহগার ব্যক্তি লজ্জায় মরে যায়। উপরন্তু মুসলমানদের মনে পরস্পরকে উপদেশ দেয়ার ভাবও যদি বর্তমান থাকে এবং সে যদি দরদ ভালবাসা ও সহানুভূতির সাথে একজনের দোষক্রটি কেমন করে দূর করা যায়, তা ভাল করে জেনে নেয়, তবে তাদের এ সম্মেলনের প্রতি আল্লাহর অশেষ রহমত ও বরকত নাযিল হবে—তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এভাবে জামায়াতে নামায পড়ার সুযোগে এক মুসলমান অন্য মুসলমানের দোষ-ক্রটি সংশোধন করতে পারবেন—একজন অন্যজনের অভাব পূরণ করবেন। ফলে ধীরে ধীরে গোটা সমাজই সৎ ও নেককার হতে পারবে।

মসজিদে কেবল মিলিত হওয়ার মধ্যেই এ বিরাট বরকত রয়েছে। এরপর জামায়াতের সাথে নামায পড়ার উপকারিতা ও বরকত যে কত অসীম তাও ভেবে দেখুন। নামাযীগণ সকলে একই সারিতে সমানভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাদের কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়, কেউ উচ্চ নয়, কেউ নীচু নয়—আল্লাহর দরবারে, আল্লাহর সামনে সকল মানুষ একেবারে সমান। কারো হাত লাগলে বা কারো স্পর্শ লাগলে তাদের কেউ নাপাক হয়ে যায় না। এখানে অস্পৃশ্যতার কোন অবকাশ নেই। তাদের সকলেই পাক এবং পবিত্র ; কারণ এরা সকলেই মানুষ, সকলেই এক আল্লাহর বান্দাহ ; একই দ্বীন ইসলামের অনুগামী। এ নামাযীদের মধ্যে বংশ, পরিবার, গোত্র, দেশ আর ভাষায় আদৌ কোন পার্থক্য

নেই। ব্যক্তিগতভাবে এদের কেউ সাইয়েদ, কেউ পাঠান, কেউ খাঁ সাহেব, কেউ হাওলাদার আর কেউ চৌধুরী সাহেবও হতে পারেন। আবার এদের একজন হয়ত এক দেশের অধিবাসী আর একজন অন্য দেশের অধিবাসী। কেউ এক ভাষায় কথা বলে, কেউ অন্য ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এসব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা সকলে একই সারিতে দাঁড়িয়ে মিলিতভাবে আল্লাহর ইবাদাত করে। এর অর্থ এই যে, তারা সকলেই এক জাতির লোক। এখানে বংশ-গোত্র, দেশ-অঞ্চল ও জাতীয়তার প্রভেদ পার্থক্য একেবারে মিথ্যে। মানুষের পরস্পরের মধ্যে সবচেয়ে বড় সম্পর্ক হচ্ছে আল্লাহর বন্দেগী আল্লাহর ইবাদাত। এ ব্যাপারে আপনারা সকলেই যখন এক তখন অন্যান্য ব্যাপারেও আপনাদের ভিন্ন ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনই কারণ থাকতে পারে না।

আপনারা যখন সারি বেঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ান, তখন মনে হয় যেন একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী বাদশাহের সামনে কর্তব্য পালনের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। কাতার বেঁধে দাঁড়ানোর এবং একত্রে মিলে ওঠাবসা করায় নামাযীদের মনে পরম ঐক্যভাবের সৃষ্টি হয়। এভাবে নামাযের ভিতর দিয়ে সকলকে আল্লাহর বন্দেগী করার অভ্যাস করানো হয়—তাদের সকলের হাত একত্রে ওঠবে, সকলের পা এক সাথে চলবে। তাতে পরিষ্কার মনে হবে যে, নামাযীরা বিশজন বিশজন কিংবা একশজন নয়—তারা একত্রে মিলে একটি অখণ্ড মানুষে পরিণত হয়েছে।

জামায়াত ও কাতারবন্দী হওয়ার পরে কি করা হয় ? সকল নামাযী একই ভাষায় আল্লাহর সামনে একই আরয জানায় ঃ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ "হে আল্লাহ ! আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।" اهدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ "হে আল্লাহ ! আমাদেরকে সহজ সঠিক পথ দেখাও।" رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ "হে আল্লাহ ! সব তারীফ প্রশংসা কেবল তোমারই জন্য।" اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ। "আমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপরও।" তারপরে নামায শেষ করে একে অপরকে এ বলে সালাম করে اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ -এর অর্থ এই যে, নামাযীদের প্রত্যেকেই পরস্পর কল্যাণকামী এবং সকলে মিলে একই মালিকের কাছে সকলের মঙ্গল দাবী করছে। কোন নামাযী একাকী নয়, তাদের কেউই কেবলমাত্রই নিজের জন্য কল্যাণ কামনা করে না। বরং সকলের মুখে এ দোআ যে, হে আল্লাহ !

আমাদের সকলেরই প্রতি তোমার অনুগ্রহ ও কল্যাণ বর্ষিত হোক, সকলকে একই সহজ ও সোজা পথে চলার তৌফিক দাও, সকলের ওপরেই শান্তি বর্ষিত হোক। নামায এভাবে সকল নামাযীর দিলকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দেয়, সকলের মনে একই খেয়াল ও একই চিন্তাধারা জাগরিত করে, তাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর ভালবাসা, ঐক্য ও মংগলাকাংখার সৃষ্টি হয়।

কিন্তু মনে রাখবেন, জামায়াতের সাথে নামায ইমাম ছাড়া পড়া যায় না। দু'জন মিলে পড়লেও তাদের মধ্যে একজনকে ইমাম ও অপরজনকে মোকতাদী হতে হয়। জামায়াত শুরু হলে তা থেকে আলাদা হয়ে একাকী নামায পড়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বরং হুকুম রয়েছে যে, জামায়াত আরম্ভ হওয়ার পর যেই আসবে, তাকে সেই ইমামের পিছনেই (একেতেদা করে) দাঁড়াতে হবে। এসব কাজ কেবল নামাযের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আসলে এটা দ্বারা একটি বড় শিক্ষা এই দেয়া হচ্ছে যে, মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে এভাবে জামায়াতবন্দী হয়ে থাকতে হবে। আর আপনাদের মধ্যে একজন যদি ইমাম না হয় তাহলে আপনাদের সেই জামায়াত গঠনই হতে পারে না। জামায়াত গঠন হওয়ার পরেও তা থেকে আলাদা হয়ে থাকলে আপনাদের জীবন মোটেই ইস-লামী জীবন নয়। মুসলিম জীবনের সাথে এর আদৌ সম্পর্ক নেই।

এখানেই শেষ নয়। জামায়াতের সাথে নামায পড়ার মাধ্যমে ইমাম ও মোকতাদীদের মধ্যে একটা বিরাট মযবুত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়—যার সাহায্যে প্রত্যেকটি মুসলমানই জানতে পারে যে, এ ছোট্ট মসজিদের বাইরে পৃথিবী নামক বিরাট মসজিদে 'ইমামের' মর্যাদা কি ? তাঁর কর্তব্য কি ? তাঁর কি কি 'হক' আছে ? সেই 'বড় মসজিদের' ইমামের অনুসরণ আপনাকে কিভাবে করতে হবে, সে ভুল করলে আপনি কি করবেন ? তার ভুলকে আপনি কতক্ষণ বরদাশত করবেন ? কখন আপনি তার ভুল ধরতে পারবেন ? আর তা শোধরাবার দাবী করতে পারবেন ? আর কোন অবস্থায় ইমামকে পদচ্যুত করতে পারবেন ? এ সমস্ত কথা ছোটখাটোভাবে প্রত্যেক মুসলিমকে মসজিদের মধ্যে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। এক কথায় মসজিদে একটি ছোটখাট রাজ্য চালাবার নিয়ম-কানুন দৈনিক পাঁচবার শিক্ষা দেয়া হয় এবং তার অভ্যাস করানো হয়।

একথাগুলো বিস্তারিতভাবে বলার অবকাশ এখানে নেই। সংক্ষেপে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলে রাখছি।

শরীয়াতের আদেশ এই যে, সমাজের লোকদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী পরহেযগার হবে, ইলম যার বেশী হবে, কুরআন শরীফ যে সকলের

অপেক্ষা ভাল করে পড়তে ও বুঝতে পারবে এবং সেই সাথে যার উপযুক্ত বয়স হয়েছে, ঠিক তাকেই নামাযের ইমাম বানাতে হবে। কর্মক্ষেত্রে যারা জাতির নেতা হবে তাদের মধ্যে কি কি গুণ থাকা অবশ্য দরকার—উক্ত ব্যবস্থা দ্বারা পরিষ্কারভাবে তারই শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

শরীয়াত আদেশ করেছে যে, জামায়াতের অধিকাংশ লোক যাকে ইমাম বানাতে রাজী নয়, তাকে ইমাম নিযুক্ত করা অনুচিত। অল্পসংখ্যক লোকের অসম্মতি ধর্তব্য নয়, কারণ তা হয় না এমন লোক কখনো পাওয়া যায় না। কিন্তু জামায়াতের অধিকাংশ লোক যদি কোন ব্যক্তিকে অপসন্দ করে, তবে তাকে কিছুতেই ইমাম নিযুক্ত করা যেতে পারে না। এর দ্বারা জাতির ইমাম বা নেতা নির্বাচন করার নিয়ম শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

শরীয়াতে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, নামাযের ইমাম এমন ব্যক্তিকে বানাতে হবে, যে সকল নামাযীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নামায পড়বে। কারণ নামাযীদের মধ্যে অনেক রুগ্ন, বৃদ্ধ, অসুস্থ আর দুর্বল লোকও থাকতে পারে। এমতাবস্থায় কেবল যুবক, শক্তিমান আর অবসর বিশিষ্ট মানুষদের প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাযে লম্বা লম্বা কেরাত পড়লে এবং লম্বা লম্বা রুকূ'-সেজদা করতে থাকলে অন্যের পক্ষে অনেক কষ্ট ও অসুবিধা হতে পারে। তাই ইমামের মনে রাখতে হবে যে, নামাযীদের মধ্যে অনেক বৃদ্ধ আছে, রুগ্ন ও দুর্বল ব্যক্তি আছে এবং এমন অনেক লোক আছে যারা তাড়াতাড়ি নামায পড়ে নিজ নিজ কাজে ফিরে যেতে চায়। হযরত নবী করীম (সা) এ ব্যাপারে অনেক সহানুভূতি দেখিয়েছেন। নামায পড়াবার সময় কোন শিশুর কান্নার আওয়ায শুনতে পেলেও তিনি নামায অনেক সংক্ষেপ করতেন। কারণ শিশুর মাতা (কিংবা পিতা) এ জামায়াতে শরীক থাকলে তার মনে কষ্ট হতে পারে—তাই নামাযের ব্যাঘাত হতে পারে। এ নিয়ম দ্বারা জাতির নেতৃবৃন্দকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তাকে যখন 'নেতা' বানান হয়েছে, তখন প্রত্যেক কাজেই জাতির সকল প্রকার লোকের প্রতি তার লক্ষ্য থাকা বাঞ্ছনীয়। শরীয়াতের ব্যবস্থা এই যে, নামায পড়াবার সময় ইমামের যদি এমন কোন অবস্থা হয়, যাতে সে আর নামায পড়াতে পারছে না, তাহলে অবিলম্বে তার সরে গিয়ে অন্য এক ব্যক্তিকে ইমাম করে দেয়া আবশ্যক। এ থেকে এ নির্দেশ পাওয়া যায় যে, জাতির নেতা যখন নিজ কর্তব্য পালনে অক্ষম হবে, তখন সে নিজেই পদত্যাগ করে অন্য কোন উপযুক্ত লোককে সেখানে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করবে। এটা করা তার পক্ষে ফরয। এ কাজে তার কোন লজ্জা হওয়া উচিত নয়, এতে স্বার্থপরতাও নেই।

শরীয়াতের আদেশ এই যে, ইমাম যা করবে মোকতাদীগণও তার অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবে। ইমামের কোন কাজ করার আগে মোকতাদীর

তা করা একেবারে নিষিদ্ধ। এমনকি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "ইমামের আগে কেউ রুকূ' বা সিজদা করলে কিয়ামতের দিন তাকে গাধা বানিয়ে ওঠানো হবে।" নেতাকে কিভাবে অনুসরণ করে চলা অবশ্য কর্তব্য এখানে মুসলিম জাতিকে তাই শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

নামাযের মধ্যে ইমাম কোন ভুল করলে অর্থাৎ যখন দাঁড়ান দরকার তখন বসলে, কিংবা যখন বসা দরকার তখন দাঁড়ালে 'সুবহানাল্লাহ' বলে তার ভুল ধরে দেয়া মোকতাদীগণের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। 'সুবহানাল্লাহ' অর্থ হচ্ছে 'আল্লাহ তাআলা পাক ও মহান'। ইমামের ভুল ধরার সময় 'সবুহানাল্লাহ' বলার তাৎপর্য এই যে, কেবল আল্লাহ তাআলাই সকল প্রকার ভুল-ক্রটি হতে পবিত্র ; তুমি মানুষ, তোমার ভুল হওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। ইমামের ভুল ধরার জন্য ইসলামে এটাই নিময় করা হয়েছে।

এ নিয়মে যখনই ইমামের ভুল ধরা হবে, তখন কোন প্রকার লজ্জা-শরমের প্রশ্রয় না দিয়ে তার নিজ ভুল সংশোধন করে নেয়া উচিত। অবশ্য ভুল ধরে দেয়ার পরেও ইমাম যদি নিসন্দেহে মনে করে যে, তার কোন ভুল হয়নি—সে ঠিক কাজ করেছে, তখন সে নিজ বিশ্বাস অনুসারে যথারীতি নামায সমাধা করবে। এমতাবস্থায় জামায়াতের লোকদের পক্ষে ইমামের ভুলকে ভুল মনে করেও তার অনুসরণ করা কর্তব্য। নামায শেষ হওয়ার পরে ইমামের সামনে তার ভুল প্রমাণ করে পুনরায় নামায পড়াবার দাবী করার অধিকার সকল নামাযীরই আছে।

ইমামের সাথে জামায়াতের লোকদের এরূপ ব্যবহার মাত্র ছোটখাট ভুলের ব্যাপারে হবে। কিন্তু ইমাম যদি নবীর সুন্নাতের খেলাফ নামায পড়াতে শুরু করে কিংবা নামাযের মধ্যে জেনে বুঝে কুরআন শরীফ ভুল পড়ে অথবা নামায পড়াবার সময় কোন কুফরী, শিরকী বা প্রকাশ্য গুনাহের কাজ করে বসে—তখন নামায ছেড়ে দিয়ে সেই ইমাম পরিত্যাগ করা প্রত্যেক নামাযীর পক্ষেই ফরয।

মুসলমান সমাজকে জাতীয় জীবনে তাদের নেতাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে, নামায সম্পর্কে শরীয়াতের এসব হেদায়াত দ্বারা তা চমৎকারভাবে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

জামায়াতের সাথে নামায পড়ার যেসব সার্থকতা ও সুফলের কথা এখানে বলা হলো—তা দ্বারা আপনারা পরিষ্কারভাবে জানতে পারলেন যে, আল্লাহ তাআলার এ একটি কথা মাত্র ইবাদাত—যা দিন ও রাতে পাঁচবার মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য করতে হয়—তাতে মুসলমানদের জন্য দুনিয়া আখেরাতে সকল

স্থানেই বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তা দ্বারা বুঝতে পারা যায় যে, মাত্র এ একটি জিনিস মুসলমানকে যথার্থ ভাগ্যবান করে দিতে পারে এবং এটা কেমন করে মুসলমানকে আল্লাহর গোলামী এবং দুনিয়ায় নেতৃত্ব করার জন্য তৈরি করে দেয়। এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, নামায যখন সকল কল্যাণে পরিপূর্ণ তখন বর্তমান সময় এর এতসব কল্যাণ কোথায় গেল ? এ প্রশ্নের জবাব পরবর্তী প্রবন্ধে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

নামাযের ফল পাওয়া যায় না কেন ?

পূর্বের প্রবন্ধগুলোতে নামাযের যে উপকারিতা ও সুফল দানের কথা আমি নানাভাবে ব্যক্ত করেছি, সেই নামায থেকে বর্তমানে লোকেরা সেই রকম সুফল লাভে সক্ষম হচ্ছে না কেন, এখানে এ প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করবো। বর্তমান যুগে নামায পড়ার পরেও মুসলমান এত লাঞ্ছিত ও দুর্বল কেন, তাদের চরিত্র উন্নত হচ্ছে না কেন, একটি অপরাজেয় শক্তিধর আল্লাহর সেনাবাহিনীতে পরিণত হচ্ছে না কেন, দুনিয়ার মধ্যে কাফেরদের বিপক্ষে তারা এত শক্তিহীন ও অবহেলিত কেন ? এটা সত্যিই একটি কঠিন প্রশ্ন।

এ প্রশ্নর সংক্ষিপ্ত জবাব এ হতে পারে যে, মুসলমানগণ আসলে নামাযই পড়ে না, আর পড়লেও ঠিক সেভাবে এবং সেই নিয়মে পড়ে না, যেভাবে আর যে নিয়মে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল পড়তে আদেশ করেছেন। কাজেই যে নামায ঈমানদার ব্যক্তিকে উন্নতির চরম সীমায় পৌছাতে পারে, আজিকার মুসলমানগণ বর্তমানের এ নামায হতে সেরূপ সুফল লাভের আশা করতে পারে না। কিন্তু আমি জানি, এতটুকু সংক্ষিপ্ত জবাবে আপনারা পরিতৃপ্ত হবেন না। কাজেই একটু বিস্তারিতভাবেই এর জবাব দেয়া আবশ্যক।

এই যে (মসজিদে) একটি দেয়াল ঘড়ি ঝুলছে, আপনি জানেন যে, এতে অনেক যন্ত্রাংশ একটি অন্যটির সাথে জড়িত রয়েছে। এতে যখন চাবি দেয়া হয়, তখন প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশ নিজ নিজ কাজ শুরু করে এবং সেই সাথে বাইরের কাঁটায় ভিতরের যন্ত্রাংশগুলোর কাজের ফল প্রকাশ হতে থাকে। অর্থাৎ দু'টি কাঁটা ঘুরে ঘুরে সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড মিনিটের পর মিনিট বানিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বানাতে থাকে। এখন চিন্তা করে দেখুন, ঘড়ি বানাবার উদ্দেশ্য কি ? ঠিকভাবে সময় জানানই যে তার একমাত্র উদ্দেশ্য, একথা সকলেই জানেন। এজন্যই সঠিক সময় নির্দেশ করতে পারে এমন সব ছোট ছোট যন্ত্রাংশ এর মধ্যে একত্র করা হয়েছে। তারপর সেগুলোকে পরস্পর জুড়ে দেয়া হয়েছে। যেন সবগুলো মিলে যথারীতি চলতে থাকে এবং প্রত্যেকটি অংশ যেন সঠিক সময় জানাবার জন্য যতটুকু কাজ করা দরকার ঠিক ততটুকু কাজ করে — বেশী নয়, কমও নয়। পুনরায় তাতে চাবি দিবার নিয়ম করা হয়েছে। কেননা, চাবি না দিলে যন্ত্রাংশগুলো থেমে যাবে, তা সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে না। তাই নির্দিষ্ট সময়ের পরে চাবি দিয়ে তাকে গতিশীল করে দেয়া হয়। ফলে সবগুলো যন্ত্রাংশ চলতে শুরু করে। এগুলোকে যখন ঠিকভাবে জুড়ে দেয়া হয় এবং তাতে চাবি দেয়া হয়, ঠিক তখনই যে উদ্দেশ্যে তা তৈরী

হয়েছে তা এ ঘড়ি দ্বারা লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু যদি ঠিকমত চাবি দেয়া না হয়, তবে তা ঠিকভাবে সময় নির্দেশ করতে পারবে না। যদি চাবি দেয়াও হয়, কিন্তু নিয়মানুসারে না দেয়া হয়, তাহলে ঘড়ি বন্ধ হয়ে যাবে কিংবা চললেও ঠিকমত সময় নির্দেশ করতে পারবে না। যদি এর কোন কোন অংশ বের করে দিয়ে চাবি দেয়া হয়, তবে সে চাবি দেয়ায় কোন ফলই হবে না। আর যদি এর কোন অংশ বের করে সেখানে সিঙ্গার সেলাই মেশিনের অংশ লাগিয়ে দেয়া হয় এবং চাবি দেয়া হয়, তথাপি তা সময় নির্দেশ করতে পারবে না ; ওদিকে কাপড় সেলাই করার কাজও তার দ্বারা সম্ভব হবে না। এর সবগুলো যন্ত্রাংশ যদি একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করে এর মধ্যে রাখা হয়, তবে চাবি দিলেও তা চলবে না। প্রকাশ্যভাবে দেখতে গেলে তো বলতে হবে যে, ঘড়ির সব যন্ত্রাংশই এর মধ্যে আছে, কিন্তু যন্ত্রাংশ কেবল এর মধ্যে থাকলেই তো আর এর উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে না। কারণ, এদের পরস্পরের সাথে কোন যোগ নেই এবং শ্রেণীবিন্যাস করে সেগুলোকে ঠিকমত সাজানও হয়নি। তাই সেগুলো পরস্পর চলতে পারছে না। এখানে যেসব অবস্থার কথা বলা হলো তাতে যদিও ঘড়িটি কোন কাজ করবে না এবং তাতে চাবি দেয়া নিষ্ফল হবে তবুও বাইরের লোক তা দেখে কিছুই বুঝতে পারবে না যে, এটা ঘড়ি নয় বা এতে রীতিমত চাবি দেয়া হচ্ছে না। তারা তো বলবে যে, এটা দেখতে ঠিক ঘড়ির মতোই এবং সে জন্য ঘড়ি দ্বারা যে উদ্দেশ্য লাভ হয়, তাই পাওয়ার আশা করবে এজন্যই দূর থেকে তারা যখন দেখবে যে, আপনি ঘড়িতে ঠিক মত চাবি দিচ্ছেন, কাজেই ঘড়ি দ্বারা যে সুফল লাভ করা যায়, তা হতেও সে ঠিক তাই পাওয়ার আশা করবে। কিন্তু এর ভিতরে যখন ঘড়ির ঠিক অবস্থা বর্তমান নেই তখন বাহির থেকে ঘড়ির মত দেখালে কি হবে? এর দ্বারা আসল ঘড়ির কাজ পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

ঘড়ির যে উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করলাম, তা দ্বারা আপনারা সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন। ইসলামকে এ ঘড়ির মত মনে করুন, ঘড়ির উদ্দেশ্য যেমন সঠিক সময় নির্দেশ করা, তেমনি ইসলামেরও উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ এ দুনিয়াতে আল্লাহর খলীফা—আল্লাহর সৈনিকরূপে বসবাস করবে। নিজেরা আল্লাহর হুকুম অনুসারে চলবে, অন্যকেও আল্লাহর বিধানের অধীন পরিচালিত করবে। কুরআন শরীফে একথাটি পরিষ্কার বলা হয়েছে :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ -

"তোমরা সেই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে সমগ্র মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাদের কাজ এই যে, তোমরা সকল মানুষকে ন্যায় কাজের আদেশ করবে, সকল অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে ফিরাবে এবং আল্লাহর প্রতি মযবুতভাবে ঈমান রাখবে।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ ـ

"আর এরূপে আমরা তোমাদেরকে (সর্বশ্রেষ্ঠ) জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমারা সকল মানুষ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পার।"

-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ ـ(النور : ٥٥)

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে তাদের কাছে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি তাদের যমীনের বুকে তার খলীফা বানাবেন।"-(সূরা আন নূর ঃ ৫৫)

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ـ

"এই কাফেরদের সাথে লড়াই করো যেন শেষ পর্যন্ত ফেত্‌না খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহরই জন্য হয়ে যায়।"

-(সূরা আনফাল ঃ ৩৯)

এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ঘড়ির যন্ত্রাংশের ন্যায় ইসলামেও অনেক কলকব্জা জমা করা হয়েছে। ইসলামের আসল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সেগুলো যেমন দরকারী, তেমনি পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণও। ইসলামের মৌলিক মতবাদ, আকায়েদ, নৈতিক চরিত্রের নিয়ম-নীতি, কাজ-কারবার, আদান-প্রদানের কায়দা-কানুন, আল্লাহর হক, মানুষের হক, নিজের হক আর দুনিয়ার অন্য যেসব জিনিসের সাথে মানুষের সম্পর্ক রয়েছে সেগুলোর হক, কামাই-রোযগার এবং খরচ করার রীতিনীতি, যুদ্ধ-জিহাদের নিয়ম-পন্থা, সন্ধি-সমঝোতার নিয়ম প্রণালী, রাষ্ট্র পরিচালনার বিধান-পদ্ধতি এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার করে বসবাস করার নিয়ম -- এসবগুলোই ইসলামের অঙ্গ -- ইসলামের ছোট ছোট যন্ত্রাংশ এবং এগুলোকে ঘড়ির যন্ত্রাংশের ন্যায় একটির সাথে অন্যটিকে এমনভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে যে, চাবি দিলেই তার সবগুলো ঠিকভাবে চলতে শুরু করে--আর এগুলো মিলিতভাবে চলার ফলে এর আসল উদ্দেশ্য ইসলামের প্রাধান্য ও প্রভূত্ব এবং দুনিয়ায় আল্লাহর বিধানের প্রতিষ্ঠা

—এমন সুন্দর ও ধারাবাহিকভাবে লাভ হতে থাকে, যেমন ঘড়ির যন্ত্রগুলো চলার ফলে বাইরের সময় নির্দেশকারী কাঁটা সঠিক সময় জ্ঞাপন করে। ঘড়ির বিভিন্ন অংশগুলোকে পরস্পর জুড়ে দেবার জন্য কয়েকটি লোহার পাত ও ছোট ছোট লোহার কাঁটা ব্যবহার করা হয়েছে। ঠিক তেমনি ইসলামের বিভিন্ন কাজকে পরস্পরের সাথে যুক্ত রাখার জন্য এবং সেগুলোর সামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রেণী বিন্যাস করার জন্য জামায়াত গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুসলমানদের এ জামায়াতের এমন একজন নেতা হবে যার মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও বোধশক্তি এবং তাকওয়া-পরহেযগারীর বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকবে ; জামায়াতের কর্মীগণ তার কথা মেনে চলবে, তার কথা অনুসারে কাজ করবে। নেতা তাদের মিলিত শক্তির সাহায্যে লোকদের ওপর ইসলামী আইন জারী করবে এবং তাদের ইসলামী আইনের বিরোধিতা হতে বিরত রাখবে। এভাবে ইসলামের সবগুলো অংশ যখন পরস্পর যুক্ত হবে সেগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রেণীবিন্যাস কায়েম করা হবে, তখন তাতে গতি আনার জন্য সেগুলোকে ঠিকমত চালাবার জন্য তাতে চাবি দেয়া আবশ্যক হয়। বস্তুত ইসলামী জীবনব্যবস্থায় নামায সেই চাবির কাজ করে। দিন রাত পাঁচবার করে এ চাবি দেয়ার কাজ করতে হয়। তারপর এ ঘড়িকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাও দরকার। সে জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে। বছরে একবার করে ত্রিশ দিনের জন্য এটা সেই কাজ সমাধা করে। এ ঘড়িতে তেল দেয়া আবশ্যক, বছরে একবার যাকাত আদায় করে এ তেল দেয়ার কাজ করা হয়। এ তেল বাইর থেকে আমদানী করা হয় না, এ ঘড়িরই কোন অংশ এটা তৈরি করে এবং অন্যান্য শুকনা অংশগুলোকে চলাবার যোগ্য করে দেয়। ঘড়িকে মাঝে মাঝে 'ওভারহল' করারও দরকার হয়, জীবনে একবার হজ্জ করলে এ 'ওভারহলিং'-এর কাজ সম্পন্ন হয়।

এখন সকলেই বুঝতে পারেন, এ চাবি দেয়া, পরিষ্কার করা, তেল দেয়া এবং ওভারহলিং করা ঠিক তখনি সার্থক হতে পারে, যখন এ ঘড়ির মধ্যে কেবল ঘড়িরই অংশগুলো পরস্পর যুক্ত ও সুবিন্যস্ত থাকবে, যেভাবে ঘড়ির নির্মাতা তা সাজিয়ে দিয়েছে। ঠিক এমন অবস্থায় চাবি দিলেই তা সঠিকভাবে চলতে পারে এবং ঠিকমত সময় নির্দেশ করতে পারে। একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন যে, বর্তমান সময় ইসলামের অবস্থা এদিক দিয়ে বড়ই খারাপ। প্রথমত যে জামায়াত গঠনের সাহায্যে ইসলামের সমস্ত অংশ পরস্পর জুড়ে দেয়া হয়েছিল, সেই জামায়াতের অস্তিত্ব এখন নেই। ফলে সব অংশ-গুলোই আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। ঐক্য শক্তি বিলুপ্ত হয়েছে। এখন যার যা ইচ্ছা সে তাই করে যাচ্ছে। কেউ বাধা দেবার নেই, সঠিক পথ দেখাবার কেউ

নেই। ইচ্ছা হলে ইসলামের আইন মেনে চলে, না হয় ইসলাম ত্যাগ করে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে। আজকের মুসলমান এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং তারা এ ঘড়ির অনেকগুলো অংশ বের করে নিজ নিজ ইচ্ছামত অনেক অংশ এতে যোগ করেছে, যা কোনক্রমেই এ ঘড়ির অংশ হতে পারে না। কেউ 'সিঙ্গার মেশিনের' অংশ ঢুকিয়ে দিয়েছে, কেউ 'আটা কলের' এক অংশ তাতে লাগিয়ে দিয়েছে আবার কেউ কেউ মোটর গাড়ীর কতক অংশ নিজের পসন্দ অনুসারে সন্ধান করে এনে এতে জুড়ে দিয়েছে। এখন এরা একদিকে মুসলমান, অন্যদিকে সুদী কারবার চালাচ্ছে, ইন্সিওরেন্সে কোম্পানীতে জীবন বীমা করছে, ইংরেজী আইনের ভিত্তিতে গড়া আদালতে মিথ্যা মোকদ্দমা চালাচ্ছে। কাফেরদের অনুগত হয়ে তাদের খেদমত করছে। নিজেদের মেয়ে, বোন আর স্ত্রীদেরকে 'মেম' বানাচ্ছে। নিজেদের সন্তানদেরকে জড়বাদী শিক্ষা দান করছে। এদিকে মার্কস ও লেলিনের অনুকরণ করাচ্ছে এবং অন্য দিকে বৃটেন ও আমেরিকার নীতিও স্বীকার করাচ্ছে। মোটকথা, ইসলাম বিরোধী অসংখ্য জিনিস এনে স্বয়ং মুসলমানগণই ইসলামের এ ঘড়ির সাথে জুড়ে দিয়েছে।

এসব অবাঞ্ছনীয় কাজ করার পরও যদি কেউ আশা করে যে, চাবি দিলেই ঘড়ি ঠিকমত চলবে, আর যে উদ্দেশ্যে ঘড়ি বানানো হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যও এটা দ্বারা হাসিল হবে, আর পরিচ্ছন্ন করে তেল দেয়া এবং ওভারহলিং করায় যে ফল পাওয়া উচিত, তাও যদি কেউ এটা দ্বারা পেতে চায়, তবে তাকে চরম নির্বোধ ছাড়া কি-ই বা বলা যেতে পারে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই অনায়াসে বুঝা যায় যে, বর্তমানে এ ঘড়ির (ইসলামের) যে দশা হয়েছে, তাতে জীবন ভর চাবি দিলে, সাফ করলে এবং তেল দিতে থাকলেও এর আসল উদ্দেশ্য কিছুতেই হাসিল হতে পারে না। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য মেশিনের অংশগুলো এর মধ্যে থেকে বের করা না হবে এবং সেই স্থানে এর আসল অংশগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত ঠিকভাবে সাজিয়ে দেয়া না হবে—প্রথম ঘড়ি প্রস্তুত করার সময় যেমন সাজান হয়েছিল—ততক্ষণ পর্যন্ত এর দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য লাভ করার কোন আশাই করা যায় না।

বিষয়টি খুব ভাল করে বুঝে নেয়া আবশ্যক। মুসলমানদের নামায, রোযা এবং হজ্জ ও যাকাত সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হওয়ার কারণ এটাই। প্রথমত তাদের মধ্যে খুব কম লোকই রীতিমত নামায আদায় করে, রোযা রাখে, যাকাত দেয় ও হজ্জ করে। জামায়াতী বন্ধন ও শৃংখলা চূর্ণ হয়ে যাওয়ার ফলে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ একেবারে স্বেচ্ছাচারী হয়ে গিয়েছে। ইসলামের এ ফরযগুলো কেউ আদায় করছে কিনা তা জিজ্ঞেস করার কেউ নেই। অতপর যারা তা আদায় করে তারাইবা কিভাবে আদায় করে। আজ জামায়াতের সাথে নামায

পড়ার প্রচলন প্রায় নেই, কোথাও জামায়াতের ব্যবস্থা থাকলেও সেখানকার সমজিদে এমন লোককে ইমাম নিযুক্ত করা হয়, যার দ্বারা দুনিয়ার অন্য কোন কাজ সমাধা হতে পারে না— সেই যোগ্যতাও তার নেই। যারা মসজিদের রুটি খায়, দ্বীনি ফরয পালন করাকে যারা একটি রোযগারের উপায় বলে মনে করে, যারা জ্ঞান ও ইলমের ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ, নৈতিক শক্তিহীন এবং চরিত্রের দিক দিয়ে বড় অনগ্রসর, অধিকাংশ সেই শ্রেণীর লোকদেরকেই ধরে মসজিদের ইমাম বানিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ সকল মুসলমানকে আল্লাহর খাঁটি খলীফা আর দুনিয়ায় আল্লাহর সৈনিকে পরিণত করার উদ্দেশ্যেই এ ইমাম নিযুক্তির নিয়ম করা হয়েছিল। এভাবে নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জের যে অবস্থা আজকাল হয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়।

এতসব সত্ত্বেও অনেকে বলতে পারে যে, আজকাল অনেক মুসলমান ফরয আদায় করছে, আপন আপন কর্তব্য যথারীতি পালন করছে। কিন্তু ওপরে যেমন বলা হয়েছে. ঘড়ির কতক অংশ বের করে দিয়ে সেই স্থানে অন্য মেশিনের কতকগুলো অংশ জুড়ে দেয়ার পরে তাতে চাবি দেয়া না দেয়া, সাফ করা না করা এবং তেল দেয়া না দেয়া একই কথা—সবই একেবারে নিষ্ফল এবং অর্থহীন। দূর হতে দেখলে তো এটাকে 'ঘড়ি' বলেই মনে হবে। বাহির থেকে কেউ দেখে অবশ্যই বলবে যে, এটাই ইসলাম এবং আপনারা মুসলমান। আপনারা যখন এ ঘড়িতে চাবি দেন বা তা সাফ করেন, তখন দূর থেকে দেখে লোকগণ মনে করে যে, আপনারা ঠিক মতই 'চাবি' দিচ্ছেন আর 'সাফ' করছেন। কেউ বলতে পারে না যে, এটা নামায নয়, এটা রোযা নয় কিন্তু এর ভিতরে যে কি আছে, তা বাহির থেকে যারা দেখবে তারা কেমন করে বুঝবে ?

আজ মুসলমানদের দ্বীনি কাজ-কর্ম নিষ্ফল হচ্ছে কেন ? তার মূল কারণ আমি আপনাদের সামনে স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করলাম। একথাও বুঝিয়ে দিলাম যে, মুসলমানগণ নামায পড়ে আর রোযা রেখেও আল্লাহর সৈনিক হতে পারছে না কেন ; বরং তারা কাফেরদের খাদেম ও অন্ধভাবে তাদের পদাংক অনুসরণকারী এবং নানাভাবে মযলুম হচ্ছে কেন ? যদি কিছু মনে না করেন তাহলে এটা অপেক্ষাও অনেক দুঃখের কথা আমি বলতে পারি। বর্তমান দুরবস্থার জন্য মুসলমানদের দিলে নিশ্চয়ই দুঃখ বা কষ্ট আছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাও সত্য যে, বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে হাজারে নয়শত নিরানব্বইজন বরং তার চেয়েও বেশী লোক এমন রয়েছে যারা এ দুরবস্থা দূর করার জন্য চেষ্টা করতে মোটেই রাজি নয়। ইসলামের এ 'ঘড়ির' ভিতরের কলকব্জা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকেই নিজেদের মর্জী মত এক একটা নূতন অংশ এতে লাগিয়ে দিয়েছে, একে সংশোধন করতে অর্থাৎ অন্য

মেশিনের অংশগুলো বের করে এবং এর আসল অংশগুলোকে যথাযথ সাজিয়ে একে ঠিক করতে আজ মুসলমানগণ সম্পূর্ণ নারাজ। এমনকি, কেউ তা করতে চাইলেও এরা তাকে বরদাশত পর্যন্ত করতে পারে না। কারণ অন্য মেশিনের জিনিসগুলো যখন এর মধ্য থেকে বের করা হবে, তখন প্রত্যেকেরই প্রিয় জিনিস বের হয়ে যাবে। কিন্তু অপর লোকদের প্রিয় জিনিস বের হয়ে যাবে ; আর নিজে বাইরের যে অংশ এতে জুড়ে দিয়েছে তা তাতে থাকতে দেয়া হবে, এটা তো হতে পারে না। এভাবে তার আসল অংশগুলো যখন ঠিকমত সাজিয়ে মযবুত করে বাঁধা হবে তখন সেই সাথে নিজেরাও বন্দী হয়ে পড়বে বলে এদের ভয় হচ্ছে। কেননা, সকলকে শক্ত করে বাঁধলে একজনকেও নিশ্চয়ই মুক্ত ও অবাধ রাখা যেতে পারে না। আর এটা এমন কষ্টকর ব্যাপার, যা ইচ্ছা করে সহ্য করা এদের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য তারা চায় যে, এ ঘড়ি যেমন আছে তেমনি ঝুলতে থাকুক, আর দূর হতে লোকেরা দেখে এটাকে ঘড়ি মনে করে প্রতারিত হতে থাকুক। পক্ষান্তরে যারা এহেন অকর্মণ্য ঘড়িকে অত্যন্ত ভালবাসে, তারা এতে খুব ঘন ঘন চাবি দিতে আর একে সাফ করতেই মশগুল। কিন্তু কোন দিন ভুলক্রমে এর অংশগুলো ঠিকমত সাজাতে এবং অন্য মেশিনের জিনিসগুলো বের করে ফেলতে প্রস্তুত হবে না, এটা সত্যই দুঃখের কথা।

আমি যদি আপনাদের এরূপ মতে সায় দিতে পারতাম তাহলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু আমি তা পারছি না। যে সত্য আমি জানতে পেরেছি, তার বিরুদ্ধে কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, বর্তমান অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সাথে তাহাজ্জুদ, এশরাক, চাশত প্রভৃতি নামাযও যদি পড়া হয়, পাঁচ ঘন্টা করে দৈনিক কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা হয়, রমযান শরীফ ছাড়াও বছরে অবশিষ্ট এগার মাসের সাড়ে পাঁচ মাসও যদি রোযা রাখা হয় তবুও কোন ফল হবে না। তবে ঘড়ির মধ্যে তার আসল কলকজা রেখে ঠিকমত সাজানোর পরে সামান্য একটু চাবি দিলেই তা চলতে থাকবে, আর সঠিকভাবে সময়ও নির্দেশ করতে পারবে। তখন খানিকটা সাফ করা আর কয়েক ফোটা তেল দিলেও অনেক সুফল লাভ করা যাবে। অন্যথায় সারাজীবন ভরে চাবি দিলেও এ ঘড়ি কখনো চলবে না এবং এর দ্বারা আসল উদ্দেশ্য লাভ করাও যাবে না।

রোযা

নামাযের পরেই মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ তাআলা যে ইবাদাত ফরয করেছেন তা হচ্ছে রযমান মাসের রোযা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস বন্ধ রাখার নামই রোযা। নামাযের ন্যায় এ রোযাকেও অ্যবহমানকাল থেকে সকল নবীর শরীয়াতেই ফরয করা হয়েছে। অতীতের সকল নবীর উম্মাতগণ এমনিভাবেই রোযা রাখতো, যেমন রাখছে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর উম্মাতগণ। অবশ্য রোযার হুকুম আহকাম, রোযার সংখ্যা এবং রোযার সময় ও মুদ্দতের ব্যাপারে বিভিন্ন নবীগণের শরীয়াতে পার্থক্য রয়েছে। বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রত্যেক ধর্মেই রোযা রাখার প্রথা কোন না কোন প্রকারে বর্তমান আছে। অবশ্য তারা এতে নিজেদের ইচ্ছামত অনেক কিছু যোগ করে নিয়েছে এবং নানাভাবে এর রূপ বিকৃত করে দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কুরআন মজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৩)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর তরফ থেকে যত শরীয়াত দুনিয়ায় নাযিল হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতেই রোযা রাখার বিধি-ব্যবস্থা ছিল। চিন্তা করার বিষয় এই যে, রোযার মধ্যে এমন কি বস্তু নিহিত আছে, যার জন্য আল্লাহ তাআলা সকল যুগের শরীয়াতেই এর ব্যবস্থা করেছেন।

ইতিপূর্বে আরো কয়েকবার বলেছি যে, মানুষের সমগ্র জীবনকে ইবাদাত অর্থাৎ আল্লাহর বন্দেগীতে পরিণত করাই হচ্ছে ইসলামের আসল উদ্দেশ্য। মানুষ জন্মগতভাবেই আল্লাহর বান্দাহ, আল্লাহর বন্দেগী তার প্রকৃত স্বভাব। কাজেই ইবাদাত অর্থাৎ চিন্তা ও কর্মের দিক দিয়ে এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর বন্দেগী পরিত্যাগ করা মানুষের পক্ষে উচিত নয়। জীবনের প্রত্যেকটি কাজ এবং সকল সময় চিন্তা করা উচিত যে, আল্লাহর সন্তোষ কিসে, আর কোন্ জিনিসে তার অসন্তোষ। তারপর যে দিকেই এবং যে কাজেই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা করা যাবে, মানুষের সে দিকেই যাওয়া উচিত এবং যেদিকে তাঁর অসন্তুষ্টি সেদিক থেকে ঠিক তেমিন দূরে থাকা উচিত, যেমন

আগুন থেকে প্রত্যেকটি মানুষ দূরে থাকে। যে পথ আল্লাহ পসন্দ করেন সেই পথে চলা, যে পথ তিনি পসন্দ করেন না সেই পথে না চলাই মানুষের কর্তব্য। এভাবে মানুষের সমগ্র জীবন যখন গঠিত হবে তখন প্রমাণিত হবে যে, সে যথাযথভাবে আল্লাহর বন্দেগী করছে এবং وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ○ (الذريت) "মানুষ ও জ্বীন জাতিকে কেবল আমার ইবাদাত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।" আল্লাহর এ ঘোষণা অনুসারে সে নিজের জন্মের উদ্দেশ্য সার্থক করতে পেরেছে।

একথাও পূর্বে বলা হয়েছে যে, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত নামে পরিচিত যে ইবাদাতগুলো মানুষের প্রতি ফরয করা হয়েছে, মানুষকে সেই আসল ইবাদাতের জন্য তৈরি করাই হচ্ছে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। এগুলো ফরয সাব্যস্ত করার অর্থ এ নয় যে, গুণে গুণে দিনে রাতে পাঁচবার নামায পড়লেই, রমযান মাসে ত্রিশ দিন ধরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্ষুৎ পিপাসার কষ্ট সহ্য করলেই, মালদার হলে বছরে একবার যাকাত এবং জীবনে একবার হজ্জ আদায় করলেই আল্লাহর প্রতি মানুষের কর্তব্য পুরোপুরি পালন হয়ে গেল এবং তারপর মানুষের পূর্ণ আযাদী—যা ইচ্ছে তাই করতে পারে—বরং এ ইবাদাতগুলোর ভিতর দিয়ে মানুষকে ঠিকভাবে গঠন করা এবং তার গোটা জীবনকে আল্লাহর বন্দেগীর যোগ্য করে তোলাই হচ্ছে এ ইবাদাতগুলোকে ফরয করার আসল উদ্দেশ্য। এখন উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিচার করতে হবে যে, রোযা মানুষকে কেমন করে সেই আসল ইবাদাতের জন্য প্রস্তুত করে।

রোযা ছাড়া অন্যান্য যেসব ইবাদাত আছে, তা পালন করার জন্য কোন না কোন রূপে বাহ্যিক প্রকাশের আশ্রয় নিতে হয়। নামায পড়ার সময় নামাযীকে ওঠা-বসা ও রুকূ'-সিজদা করতে হয়। এটা অন্য লোকে দেখতে পারে। হজ্জ করার জন্য দীর্ঘ পথ সফর করতে হয়, আর সেই সফরও করতে হয় হাজার হাজার মানুষের সাথে মিলে। যাকাত আদায়ের ব্যাপারেও অন্ততপক্ষে দু'জনকে জানতে হয়—একজন দেয়, আর একজন তা গ্রহণ করে। এসব ইবাদাতের কথা কারো কাছে গোপন থাকতে পারে না। এটা আদায় করলেই অন্য লোকে জানতে পারে। কিন্তু 'রোযার' কথা আল্লাহ এবং রোযাদার ভিন্ন অন্য কেউ জানতে পারে না। এক ব্যক্তি যদি সকলের সামনে সেহরী খায় ইফতারের সময় সকলের সাথে মিলে ইফতার করে আর দিনের বেলা গোপনে কিছু খায় বা পান করে, তবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। প্রকাশ্যভাবে সকল লোকই তাকে রোযাদার বলে মনে করবে একথা ঠিক ; কিন্তু আসলে সে মোটেই রোযাদার নয়।

রোযার এ দিকটা সামনে রেখে চিন্তা করুন। যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে রোযা রাখে লুকিয়ে কিছু পানাহার করে না, কঠিন গরমের সময় পিপাসায় কলিজা যখন ফেঁটে যাবার উপক্রম হয় তখন যে এক ফোঁটা পানি পান করে না— অসহ্য ক্ষুধার দরুন চোখে তারা ফুটতে শুরু করলেও কোন কিছু খাওয়ার ইচ্ছা করে না—সেই ব্যক্তির ঈমান কত মযবুত ? আল্লাহ তাআলা যে আলেমুল গায়েব সেই কথা সে কতখানি দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে। কত নিসন্দেহে সে জানে যে, তার কাজ দুনিয়ার লোকদের কাছে অজানা থাকলেও সারাজাহানের মালিকের কাছে কিছু অজানা নয়। তার মনে আল্লাহর ভয় কত তীব্র, অসহ্য কষ্ট স্বীকার করা সত্ত্বেও কেবলমাত্র আল্লাহর ভয়েই সে এমন কাজ করে না যাতে তার রোযা ভেঙ্গে যেতে পারে। পরকালের বিচারের প্রতি তার আকীদা-বিশ্বাস কত দৃঢ়। এক মাস সময়ের মধ্যে সে কমপক্ষে তিনশত ষাট ঘন্টাকাল রোয থাকে। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পরকাল সম্পর্কে তার মনে কখনো কোন সন্দেহ জাগে না। এ ব্যাপারে তার মনে যদি এতটুকু সন্দেহ হতো যে, পরকাল আছে কিনা, কিংবা সেখানে আযাব বা সওয়াব হবে কিনা বলে কোন দ্বন্দ্ব যদি তার মনে থাকতো তাহলে সে কিছুতেই তার রোযা পূর্ণ করতে পারতো না। এ সন্দেহ সৃষ্টি হলে কেবল আল্লাহর হুকুম বলে মানুষ কিন্তু পানাহার না করার সংকল্পে মযবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

এভাবে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বছর এক মাসকাল মুসলমানদের ঈমানের ধারাবাহিক পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এ পরীক্ষায় মানুষ যতই মযবুত হয়, ততই তার ঈমান দৃঢ় হয়। বস্তুত এটা পরীক্ষার ওপরে পরীক্ষা, ট্রেনিং-এর ওপর ট্রেনিং। কারো কাছে যখন কোন আমানত রাখা হয় তখন তার ঈমান বড় পরীক্ষায় পড়ে যায়। যদি সে এ পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে এবং সে যদি আমানতের খেয়ানত না করে, তখন তার মধ্যে আমানতের বোঝা বহন করার আরও বেশী ক্ষমতা হয়। ক্রমে সে আরও আমানতদার হতে থাকে। তদ্রূপ আল্লাহ তাআলাও ক্রমাগতভাবে এক মাসকাল পর্যন্ত দৈনিক বারো চৌদ্দ ঘন্টা ধরে মুসলমানদের ঈমানকে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। এ পরীক্ষায় সে যখন পুরোপুরিভাবে উত্তীর্ণ হয় তখন তার মধ্যে আল্লাহকে ভয় করে অন্যান্য গুনাহ হতে ফিরে থাকার যোগ্যতা অধিক পরিমাণে জাগ্রত হয়। তখন সে আল্লাহকে 'আলেমুল গায়েব' মনে করে গোপনেও আল্লাহর আইন ভঙ্গ করতে পারে না। প্রত্যেকটি কাজে সে সেই কিয়ামতের দিনকে মনে করবে যেদিন সবকিছুই খুলে যাবে এবং নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেকটি ভাল কাজে ভাল ফল এবং মন্দ কাজের মন্দ ফল দেয়া হবে। একথা বলা হয়েছে কুরআন পাকে নিম্নলিখিত আয়াতে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (البقرة : ١٨٣)

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। সম্ভবত তোমরা পরহেযগার হবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৩)

রোযার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা মুসলমানকে দীর্ঘকাল শরীয়াতের হুকুম ধারাবাহিকভাবে পালন করতে বাধ্য করে। নামাযের এক ওয়াক্তে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগে। যাকাত বছরে একবার মাত্র আদায় করতে হয়। হজ্জে অবশ্য দীর্ঘ সময় লাগে, কিন্তু তার সুযোগ সমগ্র জীবনে মাত্র একবারই এসে থাকে। তাও আবার সকল মুসলমানের জন্য নয়, কেবল মালদার লোকেরাই সেই সুযোগ পায়। কিন্তু রোযা এসব ইবাদাত হতে সম্পূর্ণ আলাদা। তা প্রত্যেক বছর পূর্ণ একটি মাস ধরে দিন-রাত প্রত্যেক (সমর্থ) মুসলমানকে ইসলামী শরীয়াত পালনের অভ্যাস করায়। শেষ রাতে সেহরী খাওয়ার জন্য ওঠতে হয়, একটি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই খানাপিনা সব বন্ধ করতে হয়, সারাদিন কোন কোন কাজ কিছুতেই করা যায় না, সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট সময়ে ইফতার করতে হয়— একটু আগেও নয়, একটু পরেও নয়। ইফতারের পরে খানাপিনা ও আরাম করার অনুমতি আছে। কিন্তু তার পরেই তারাবীহ নামাযের জন্য দৌড়াতে হয়। এভাবে প্রত্যেক বছর পূর্ণ একটি মাস সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুসলমানকে ক্রমাগতভাবে সিপাহীদের ন্যায় একটি মযবুত আইনের দ্বারা বেঁধে রাখা হয়। তারপর এগারো মাসের জন্য তাকে জীবনের কর্মক্ষেত্রে মুক্ত করে দেয়া হয়। এ মাসে যে ট্রেনিং সে পেয়েছে, পরবর্তী এগারো মাস তার কাজ-কর্মের ভিতর তা যেন প্রতিফলিত হয় এবং তারপরও কোন বিষয় অসম্পূর্ণ থাকলে পরবর্তী বছর তা যেন পূর্ণ করে দেয়া হয়।

মুসলমান সমাজের এক এক ব্যক্তিকে আলাদাভাবে এ ট্রেনিং নেয়ার ব্যবস্থা করা হলে তা মোটেই ফলপ্রসু হতো না। সৈনিকদেরকে কখনো এক একজন করে প্যারেড করানো হয় না, গোটা সৈন্যবাহিনীকে একত্রে এক সাথে তা করান হয়। সকলকে একই সময় 'বিউগলের' আওয়ায শুনে উঠতে হয় এবং 'বিউগলের' আওয়ায অনুসারে নির্দিষ্ট কাজে লেগে যেতে হয়। ফলে সৈন্যদের মধ্যে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার অভ্যাস হয়। সেই সাথে একজনের ট্রেনিং-এ অন্যজন সহযোগিতা করে থাকে। একজনের ট্রেনিং কোনরূপ অসম্পূর্ণ থাকলে দ্বিতীয়জন এবং দ্বিতীয়জনের অসম্পূর্ণ থাকলে তৃতীয়জন তা পূর্ণ করে থাকে। ঠিক এজন্য ইসলামে রমযান মাসকে রোযা পালন করার জন্য নির্দিষ্ট করা

হয়েছে। সমগ্র মুসলমানকে আদেশ করা হয়েছে, তারা সকলে মিলে এ সময়ে রোযা রাখতে শুরু করবেন। বস্তুত এ হুকুমটি মানুষের ব্যক্তিগত ইবাদাতকে সামগ্রিক ইবাদাতে পরিণত করে দিয়েছে। এক সংখ্যাকে লক্ষ দ্বারা গুণ করলে যেমন লক্ষের একটি বিরাট সংখ্যা হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি এক এক ব্যক্তির আলাদাভাবে রোযা রাখায় যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায় লক্ষ কোটি মানুষ একত্রে রোযা রাখলে লক্ষ কোটি গুণ বেশী উন্নতি লাভ করা সম্ভব। রমযানের মাস সমগ্র পরিবেশকে নেকী আর পরহেযগারীর পবিত্র ভাবধারায় উজ্জ্বল করে তুলে। গোটা জাতীয় জীবনে তাকওয়া পরহেযগারীর সবুজ তাজা ফসল বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল নিজেকেই গুনাহ হতে বাঁচাতে চেষ্টা করে না বরং তার মধ্যে কোন প্রকার দুর্বলতা থাকলে তার জন্য অন্য সব রোযাদার ভাই তার সাহায্য ও সহযোগিতা করে। রোযা রেখে গুনাহ করতে প্রত্যেকটি মানুষের লজ্জাবোধ হয় ; পক্ষান্তরে প্রত্যেকের মনে কিছু ভাল ও সওয়াবের কাজ করার ইচ্ছা জাগে। সম্ভব হলে গরীবকে একবেলা খাবার দেয়, উলঙ্গ ব্যক্তিকে কাপড় দান করে, বিপন্নের সাহায্য করে। কোথাও নেক কাজ হতে দেখলে তাতে অংশগ্রহণ করে। আর কোথাও প্রকাশ্যভাবে পাপ অনুষ্ঠান হতে থাকলে তা বন্ধ করতে চেষ্টা করে। এভাবে চারদিকে নেকী ও তাকওয়ার একটি মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সকল প্রকারের পুণ্য ও ভাল কাজ বৃদ্ধি পাওয়ার অনুকূল মৌসুম শুরু হয়। বস্তুত দুনিয়াতে সকল ফসল নির্দিষ্ট মৌসুমে ফলে থাকে। তখন চারদিকে কেবল সেই ফসলেরই চমৎকার দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। এজন্যই শেষ নবী (সা) এরশাদ করেছেন ঃ

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ ـ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلاَّ الصَّوْمُ فَاِنَّهٗ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ ـ

"মানুষের প্রত্যেকটি কাজের ফল আল্লাহর দরবারে কিছু না কিছু বৃদ্ধি পায় ; একটি নেক কাজের ফলে দশগুণ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বেশী হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ বলেন রোযাকে এর মধ্যে গণ্য করা হবে না। কারণ রোযা খাঁছ করে কেবল আমারই জন্য রাখা হয়। আর আমিই এর প্রতিফল দান করবো।"

এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে জানা গেল যে, নেক কাজ যে করে তার নিয়ত অনুসারে নেক কাজের ফল অত্যধিক বৃদ্ধি পায় বটে ; কিন্তু সেই সবের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। কিন্তু রোযার ফল বৃদ্ধির কোন শেষ সীমা নির্দিষ্ট নেই। রমযান মাস যেহেতু মঙ্গল, কল্যাণ ও নেকী বৃদ্ধি পাবার মৌসুম, এ মৌসুমে কেবল একজন মুসলমানই নয়, লক্ষ কোটি মুসলমান মিলে এ নেকীর

বাগিচায় পানি ঢালে। এজন্য তা সীমা সংখ্যাহীন ফল দান করতে পারে। এ মাসে যত ভাল নিয়তের সাথে ভাল কাজ করা যাবে, যত বরকত রোযাদার নিজে লাভ করবে এবং অন্য রোযাদার ভাইকে দিতে চেষ্টা করবে—তারপর পরবর্তী এগারো মাস পর্যন্ত এ মাসের যত প্রভাব রোযাদারের ওপর থাকবে এটা ততবেশী সুফল দেবে। এটা এমনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে যার কোন শেষ সীমা পরিসীমা থাকবে না। এখন মুসলমান নিজেরাই যদি এটাকে সীমাবদ্ধ করে রাখে, তবে সে কথা স্বতন্ত্র।

রোযার এ আশ্চর্যজনক সুফল এবং বরকতের কথা শুনে প্রত্যেকের মনেই এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আজ তা কোথায় গেল ? মুসলমান আজ রোযা রাখে নামায পড়ে। কিন্তু এর সুফল যা বর্ণনা করা হয় তা তারা আদৌ লাভ করছে না কেন ? এর একটি কারণ আমি পূর্বেই বলেছি। তা এই যে, ইসলামের ব্যাপক বিধানের বিভিন্ন অংশকে আলাদা করে ফেলার পর এবং তাতে বাইরের অনেক নূতন জিনিসের আমদানীর পর তা থেকে আসল ফল লাভের আশা করা যায় না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ইবাদাত সম্পর্কে বর্তমান মুসলমানদের দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তারা এখন মনে করছে যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছু খানাপিনা না করার নামই ইবাদাত। আর এ কাজ কোন লোক করলেই তার ইবাদাত পূর্ণ হলো, এরূপ মনে করা হয়; এভাবে অন্যান্য ইবাদাতেরও কেবল বাইরের কাঠামো ও অনুষ্ঠানকেই ইবাদাত বলে মনে করা হয়। এজন্যই ইবাদাতের আসল ভাবধারা যা মুসলমানদের প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হওয়া আবশ্যক। মুসলমানদের শতকরা ৯৯জন বরং তার চেয়েও বেশী লোক তা থেকে বঞ্চিত। ঠিক এজন্যই ইবাদাতসমূহ পূর্ণ ফল দেখাতে পারে না। কারণ ইসলামে নিয়ত, বুদ্ধি-বিবেচনা এবং আন্তরিকতার ওপরই সবকিছু নির্ভর করে। পরবর্তী প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

রোযার মূল উদ্দেশ্য

মানুষ যে কাজই করে না কেন, তাতে দু'টি জিনিস অবশ্যই থাকবে ঃ একটি তার উদ্দেশ্য— যে জন্য সেই কাজ করা হয়। অন্যটি সেই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য গৃহীত পন্থা। উদারহণ স্বরূপ ভাত খাওয়ার কথা বলা যেতে পারে। ভাত খাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে বেঁচে থাকা এবং দৈহিক শক্তির স্থায়িত্ব। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য 'গ্রাস' বানাতে হয়, মুখে দিতে হয়, চিবাতে হয় এবং গিলতে হয়। খাওয়ার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সবচেয়ে বেশী কার্যকরী ও সর্বাপেক্ষা বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ পন্থা এটাই। এজন্য খাওয়ার কাজ সমাধার জন্যই এটাকে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সকলেই জানেন যে, এ ব্যাপারে আসল জিনিস হচ্ছে এর উদ্দেশ্য—যে জন্য খাওয়া হয়—খাওয়ার এ পন্থাটি আসল বস্তু নয়। এখন কোন ব্যক্তি যদি মাটি, ছাঁই বা বালি মুঠি ভরে মুখে দেয় এবং চিবিয়ে গিলে ফেলে ; তবে তাকে কি বলা যাবে ? বলতেই হবে যে, তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু কেন ? এজন্য যে, খাওয়ার এ চারটি নিয়ম পালন করলেই তো আর খাওয়ার উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। তেমনি যে ব্যক্তি ভাত খাওয়ার সাথে সাথে বমি করে ফেলে, তারপরও সে যদি অভিযোগ করে যে, ভাত খাওয়ার যে উপকারিতা বর্ণনা করা হয়, তা আমি মোটেই পাচ্ছি না। বরং আমি তো ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছি, মৃত্যু আমার নিকটবর্তী। এ নির্বোধ ব্যক্তি নিজের এ দুর্বলতার জন্য খাওয়ার ওপরে দোষারোপ করছে, অথচ আসলে এটা তারই নির্বুদ্ধিতার ফল মাত্র। সে নির্বোধের ন্যায় মনে করেছে ঃ যে কয়টি নিয়ম পালনের দ্বারা খাওয়ার কাজ সমাধা করা হয়, ব্যাস, শুধু সেই কয়টি সম্পন্ন হলেই জীবনী শক্তি লাভ করা যাবে। এজন্যই সে মনে করেছে যে, এখন পেটে ভাতের বোঝা রেখে লাভ কি, তা বের করে ফেলাই উচিত। এভাবে পেট হালকা হয়ে যাবে। খাওয়ার বাহ্যিক নিয়ম তো পালন করা হয়েছে। এ নির্বোধ ব্যক্তি এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেছে এবং কার্যত তাই করছে। সুতরাং তার দুর্ভোগ তাকেই ভুগতে হবে। একথা তার জানা উচিত ছিল যে, ভাত যতক্ষণ পর্যন্ত পেটে গিয়ে হযম না হবে এবং রক্তে পরিণত হয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে না পড়বে—ততক্ষণ পর্যন্ত জীবনী শক্তি কিছুতেই লাভ করা সম্ভব নয়। খাওয়ার কাজের বাহ্যিক নিয়মগুলো যদিও অপরিহার্য, কারণ তা ছাড়া ভাত পেটের মধ্যে কিছুতেই প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু এ বাহ্যিক অনুষ্ঠান পালন করলেই খাওয়ার আসল উদ্দেশ্য লাভ করা যায় না। এ বাহ্যিক অনুষ্ঠানে এমন কোন যাদু নেই যে, এগুলো সম্পন্ন হলেই ঐন্দ্রজালিক উপায়ে তার শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহিত হবে। রক্ত সৃষ্টির জন্য

আল্লাহ তাআলা যে নিয়ম বানিয়ে দিয়েছেন, তা সেই নিয়ম অনুসারেই হতে পারে। সেই নিয়ম লংঘন করলে ধ্বংস অনিবার্য।

এখানে যে উদাহরণটি বিস্তারিতভাবে বললাম, তা একটু চিন্তা করলেই বর্তমান মুসলমানদের ইবাদাত নিষ্ফল হয়ে যাওয়ার কারণ সহজেই বুঝতে পারা যায়। পূর্বে যেমন একাধিকবার বলেছি বর্তমানে মুসলমানগণ নামায রোযার আরকান (আভ্যন্তরীণ জরুরী কাজ) এবং তার বাহ্যিক অনুষ্ঠানকেই আসল ইবাদাত বলে মনে করেছে। অথচ এটা অপেক্ষা বড় ভুল আর কিছুই হতে পারে না। তারা মনে করে যে, এ অনুষ্ঠানসমূহ যে ব্যক্তি ঠিকভাবে আদায় করলো, সে আল্লাহর ইবাদাত সুসম্পন্ন করলো। এদেরকে সেই ব্যক্তির সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যে ব্যক্তি ভাতের মুঠি বানাল, মুখে রাখল, চিবালো এবং গিলে ফেললো। আর এ চারটি কাজ করাকেই খাওয়া এবং খাওয়ার উদ্দেশ্য এটা থেকেই হাসিল হলো বলে মনে করেছে। সে এভাবে মাটি খেলো কিংবা বালি খেলো অথবা তা বমি করে ফেললো তাতে কিছু যায় আসে না। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, মুসলমানদের এ ভ্রান্তি যদি না হয়ে থাকে তাহলে রোযাদার ব্যক্তি কেমন করে মিথ্যা কথা বলতে পারে ও কেমন করে পরের 'গীবত' করতে পারে, কথায় কথায় তারা লড়াই-ঝগড়া কেমন করে করতে পারে ? তাদের মুখ থেকে গালি-গালায ও অশ্লীল কথা কেমন করে বের হয় ? পরের হক তারা কিভাবে কেড়ে নেয় ? হারাম খাওয়া ও অন্যকে হারাম খাওয়ানোর কাজ কেমন করে করতে পারে যে, তারা আল্লাহর ইবাদাত করছে। বালি কিংবা মাটি খেয়ে যারা মনে করে যে, তারা খাওয়ার কাজ সমাধা করছে, এরা ঠিক তাদেরই মতো।

বিশেষভাবে ভেবে দেখার বিষয় এই যে, গোটা রমযান মাস ভরে ৩৬০ ঘন্টাকাল আল্লাহর ইবাদাত করার পরে যখন মুসলমানগণ অবসর গ্রহণ করে তখন শাওয়ালের প্রথম তারিখেই এ বিরাট ইবাদাতের সকল প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হয় কেন ? হিন্দু জাতি তাদের মেলা-উৎসবে যাকিছু করে, মুসলমানগণ ঈদের উৎসবে ঠিক তাই করে। এমনকি শহর অঞ্চলে ঈদের দিন ব্যভিচার, নাচ-গান, মদ পান আর জুয়া খেলার তুফান বইতে শুরু করে। অনেক লোককে এমনও দেখা যায় যে, দিনের বেলা রোযা রেখে সারারাত মদ খায়, যেনা করে। সাধারণ মুসলমান আল্লাহর ফযলে এতটা পথভ্রষ্ট এখনো হয়নি ; কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, রমযান খতম হওয়ার পরেই তাকওয়া-পরহেযগারীর প্রভাব কতজন লোকের ওপর বর্তমান থাকে ? আল্লাহর আইন লংঘন করতে কতজন লোক ভয় পায় ? নেক কাজে কতজন লোক অংশগ্রহণ করে ? স্বার্থপরতা কতজনের দূর হয়ে যায় ?

ভেবে দেখুন, এর প্রকৃত কারণ কি হতে পারে ? আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, এর একমাত্র কারণ এই যে, মুসলমানদের মনে ইবাদাতের অর্থ এবং সেই সম্পর্কে যে ধারণা রয়েছে তা সম্পূর্ণ ভুল। তারা মনে করে যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছু না খাওয়া, কিছু পান না করাকেই রোযা বলে। আর এটা করার নামই ইবাদাত। এজন্য দেখা যায় যে, মুসলমান রোযার খুব সম্মান করে, খুব যত্নের সাথে রক্ষা করে চলে—তাদের মনে আল্লাহর ভয় এতবেশী হয় যে, যেসব কাজে রোযা ভংগ হবার আশংকা হয়, তা থেকে তারা দূরে সরে থাকে। এমনকি প্রাণের আশংকা দেখা দিলেও কেউ রোযা ভাংগতে রাজী হয় না। কিন্তু মুসলমানগণ একথা জানে যে, কেবল ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকার নামই আসল ইবাদাত নয়, এটা ইবাদাতের বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র। এ অনুষ্ঠান পালন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের মনে আল্লাহর ভয় ও ভালবাসা জাগিয়ে তোলা মাত্র। তাদের মধ্যে যেন এতদূর শক্তি জেগে ওঠে যে, তারা বড় বড় লাভজনক কাজকেও কেবল আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে ভয় করে (নিজের মনকে শক্ত করে) তা পরিত্যাগ করে। আর কঠিন বিপদের কাজেও যেন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিজের মনকে শক্ত করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এ শক্তি মুসলমানদের মধ্যে তখনি আসতে পারে, যখন রোযার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে এবং রমযানের পূরা মাস আল্লাহর ভয় ও ভালবাসায় নিজের মনকে নফসের খাহেস হতে ফিরিয়ে রাখবে, আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রস্তুত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান মুসলমান সমাজ রমযানের পরেই এ অভ্যাসকে এবং এ অভ্যাসলব্ধ গুণগুলোকে এমনভাবে হারিয়ে ফেলে যেমন কেউ ভাত খেয়েই অমনি বমি করে ফেলে। উপরন্তু অনেক মুসলমান ইফতার করার সাথে সাথে সারাদিনের পরহেযগারী ও তাকওয়াকে উগরিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় রোযার আসল উদ্দেশ্য যে কোন মতেই হাসিল হতে পারে না তা প্রত্যেকেই বুঝতে পারেন। রোযা কোন যাদু নয়, এর কেবল বাহ্যিক অনুষ্ঠান পালন করলেই তা দ্বারা বড় কোন উদ্দেশ্য লাভ করা যেতে পারে না। ভাত হতে ততক্ষণ পর্যন্ত শারীরিক শক্তি লাভ করা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তা পাকস্থলিতে গিয়ে হযম হবে এবং রক্ত হয়ে শরীরের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হবে। তদ্রূপ রোযা দ্বারাও কোন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করা যেতে পারে না—যতক্ষণ পর্যন্ত রোযাদার রোযার আসল উদ্দেশ্য ভালভাবে বুঝতে না পারবে এবং তার মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে তা অংকিত না হবে এবং চিন্তা-কল্পনা, ইচ্ছা ও কর্ম সবকিছুর ওপর তা একেবারে প্রভাবশীল হয়ে না যাবে।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা রোযার হুকুম দেয়ার পর বলেছেন ঃ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ অর্থাৎ তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে সম্ভবত তোমরা মোত্তাকী

ও পরহেযগার হতে পারবে। আল্লাহ পাক একথা বলেননি যে, রোযার রেখে তোমরা নিশ্চয়ই পরহেযগার ও মোত্তাকী হতে পারবে। কারণ রোযা হতে যে সুফল লাভ করা যায় তা রোযাদারের নিয়ত, ইচ্ছা-আকাংখা ও আগ্রহের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। যে ব্যক্তি এর উদ্দেশ্য জানতে ও ভাল করে বুঝতে পারবে এবং তা দ্বারা মূল উদ্দেশ্য লাভের চেষ্টা করবে সে তো কম বেশী মোত্তাকী নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু যে এর উদ্দেশ্যই জানবে না এবং তা হাসিলের জন্য চেষ্টা করবে না, রোযা দ্বারা তার কোন উপকারই হবার আশা নেই।

হযরত নবী করীম (সা) নানাভাবে রোযার আসল উদ্দেশ্যের দিকে ইংগিত করেছেন এবং বুঝিয়েছেন যে, উদ্দেশ্য না জেনে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকায় কোনই সার্থকতা নেই। তিনি বলেছেন ঃ

مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ -

"যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করবে না তার শুধু খানা-পিনা পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনই প্রয়োজন নেই।"

অন্য হাদীসে রাসূলে করীম (সা) এরশাদ করেছেন ঃ

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ اِلاَّ الظَّمَاءُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ اِلاَّ السَّهَرُ -

"অনেক রোযাদার এমন আছে কেবল ক্ষুধা আর পিপাসা ছাড়া যার ভাগ্যে অন্য কিছুই জোটে না। তেমনি রাত্রিতে ইবাদাতকারী অনেক মানুষও এমন আছে, যারা রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারে না।"

এ দু'টি হাদীসের অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। এটা দ্বারা ভালরূপে জানা যায় যে, শুধু ক্ষুধার্ত ও পিপাসায় কাতর থাকাই ইবাদাত নয়, এটা আসল ইবাদাতের উপায় অবলম্বন মাত্র। আর আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর আইন ভঙ্গের অপরাধ না করা এবং যে কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, আর যতদূর সম্ভব নিজের আমিত্বকে নষ্ট করা যায় ; আল্লাহকে ভালবেসে সেসব কাজ ঐকান্তিক আগ্রহের সাথে পালন করা আসল ইবাদাত। এ ইবাদাত যে করতে পারবে না, সে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থেকে নিজের পেটকে কষ্ট দেয়, তার বার-চৌদ্দ ঘন্টা উপবাস থাকায় কোনই লাভ নেই। আল্লাহ তাআলা কেবল এজন্যই মানুষকে খানা-পিনা ত্যাগ করতে বলেননি। রোযার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নবী করিম (সা) এরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ

"ঈমান ও এহতেসাবের সাথে যে ব্যক্তি রোযা রাখবে তার অতীতের গুনাহ-অপরাধ মাফ করে দেয়া হবে।"

ঈমান--অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে একজন মু'মিনের যে ধারণা ও আকীদা হওয়া উচিত তা স্মরণ থাকা চাই আর এহতেসাব-এর অর্থ এই যে, মুসলমান সবসময়েই নিজেও চিন্তা-কল্পনা করবে, নিজের কাজ-কর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে ও ভেবে দেখবে যে, আল্লাহর মর্জির খেলাফ চলছে না তো। এ দু'টি জিনিসের সাথে যে ব্যক্তি রমযানের পূর্ণ রোযা রাখবে, সে তার অতীতের সব গুনাহ অপরাধ মাফ করিয়ে নিতে পারবে। অতীতে সে কখনও নাফরমান আর আল্লাহদ্রোহী বান্দাহ থাকলেও এভাবে রোযা রাখলে প্রমাণিত হবে যে, এখন সে প্রকৃত মালিক আল্লাহর দিকে পুরোপুরি প্রত্যাবর্তন করেছে। হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে ঃ

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَذَنْبَ لَهُ ـ

"গুনাহ থেকে যে তাওবা করে, সে একেবারে নিষ্পাপ হয়ে যায়।"

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْقَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرَءٌ صَائِمٌ ـ

"রোযা একটি ঢালের ন্যায় (ঢাল যেমন দুশমনের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে, তেমনি রোযাও শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য ঢাল স্বরূপ)। সুতরাং যে ব্যক্তি রোযা রাখবে, তার (এ ঢাল ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়) দাঙ্গা-ফাসাদ থেকে ফিরে থাকা উচিত। কেউ তাকে গালি দিলেও কিংবা তার সাথে লড়াই-ঝগড়া করলেও পরিষ্কারভাবে বলা উচিত যে, ভাই, আমি রোযা রেখেছি, তোমার সাথে এ অন্যায় কাজে আমি যোগ দেব এমন আশা করতে পারি না।"

অন্য কয়েকটি হাদীসে শেষ নবী (সা) বলেছেন যে, রোযা রেখে যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে নেক কাজ করা উচিত এবং প্রত্যেকটি ভাল কাজেই অংশগ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করে রোযা রাখা অবস্থায় রোযাদারের মনে তার অন্যান্য ভাইয়ের প্রতি খুব বেশী পরিমাণে সহানুভূতি থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ নিজে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হওয়ার দরুন খুব ভাল করেই অনুভব করতে পারে যে, আল্লাহর গরীব বান্দাহগণ দুঃখ ও দারিদ্র্যে কেমন করে দিন কাটায়। হযরত

ইবনে আব্বাস (রা) রমযানে অন্যান্য সময় অপেক্ষা অধিক দয়ালু ও সহানুভূতিশীল হতেন। এ সময় কোন প্রার্থী তাঁর দুয়ার হতে বঞ্চিত হতে পারতো না। কোন কয়েদীও এ সময়ে বন্দী থাকতো না। একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهٗ مَغْفِرَةً لِذُنُوْبِهٖ وَعِتْقَ رَقَبَتِهٖ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهٗ مِثْلَ اَجْرِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْتَقِصَ مِنْ اَجْرِهٖ شَيْئٌ۔

"রমযান মাসে যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে ; তার এ কাজ তার গুনাহ মাফ এবং জাহান্নামের আগুন থেকে তাকে বাঁচাবার কারণ হবে। এ রোযাদারের রোযা রাখায় যত সওয়াব হবে, তাতে তারও ঠিক ততখানি সওয়াব হবে। কিন্তু তাতে রোযাদারের সওয়াব একটুও কম হবে না।"

রোযা ও আত্মসংযম

রোযার অসংখ্য নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সুফল রয়েছে। মানুষের মধ্যে আত্মসংযমের শক্তি সৃষ্টি করা তার অন্যতম। রোযা মানুষের মধ্যে আত্মসংযমের শক্তি কিরূপে জাগ্রত করে, তা সম্যকরূপে বুঝার জন্য সর্বপ্রথম 'আত্মসংযম'-এর অর্থ জানা আবশ্যক। ইসলাম কোন্ ধরনের আত্মসংযমের পক্ষপাতী এবং রোযা মানুষের মধ্যে সেই শক্তি কিরূপে বিকশিত করে, তাও জেনে নেয়া অপরিহার্য কর্তব্য।

মানুষের 'খুদী'—আত্মজ্ঞান যখন তার দেহ এবং অন্যান্য শক্তিসমূহকে পরিপূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করে নিতে পারে এবং মনের যাবতীয় কামনা-বাসনা ও আবেগ-উচ্ছ্বাসকে নিজের সিদ্ধান্তের অধীন ও অনুসারী করে তুলতে পারে, ঠিক তখনই হয় আত্মসংযম। একটি রাষ্ট্রে প্রধান শাসনকর্তার মর্যাদা যেরূপ হয়ে থাকে মানুষের গোটা সত্তায় তার 'খুদী'রও ঠিক সেই মর্যাদাই হয়ে থাকে এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার হাতিয়ার। মানুষের দৈহিক ও মস্তিষ্কের শক্তি খুদীরই 'খিদমত' করে। নফস বা প্রবৃত্তি 'খুদী'র সামনে নিজের কামনা-বাসনার কেবল আবেদনই পেশ করতে পারে, আর কিছু করার মত ক্ষমতা তার নেই। এসব অস্ত্র ও শক্তিসমূহকে কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে এবং নফসের আবেদনকে মঞ্জুর করা হবে কিনা সেই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার একমাত্র 'খুদী'রই। এখন কোন খুদী যদি দুর্বল হয়, দেহ রাজ্যে নিজের ইচ্ছামত শাসন চালাবার ক্ষমতা যদি তার না-ই থাকে এবং নফসের আবেদন যদি নির্দেশের অনুরূপ হয় তবে সেই 'খুদী' বড় অসহায়, পরাজিত ও নিষ্ক্রিয়। যে অশ্বারোহী নিজের অশ্বকে কাবু করতে পারে না, বরং সে নিজেই অশ্বের আয়ত্বাধীন হয় ; মানুষের এ খুদী ঠিক তারই মত অক্ষম। এ ধরনের দুর্বল মানুষ দুনিয়ায় কোনদিনই সফল জীবনযাপন করতে পারে না। মানুষের ইতিহাসে যাঁরাই নিজেদের কোন প্রভাব ও স্মৃতি চিহ্ন উজ্জ্বল করে রেখে গেছেন তাঁদের প্রত্যেকেই নিজের আভ্যন্তরীণ সমগ্র শক্তিকে বল প্রয়োগ করে হলেও—নিজের অধীন ও অনুগত করে নিয়েছেন। তাঁরা কোন দিনই নফসের লোভ-লালসার দাস এবং আবেগ-উচ্ছ্বাসের গোলাম হননি, তাঁরা সবসময়ই তার মনিব বা পরিচালক হিসেবেই রয়েছেন। তাঁদের ইচ্ছা-বাসনা অত্যন্ত মযবুত এবং সংকল্প অটল ছিল।

কিন্তু যে 'খুদী' নিজেই খোদা হয়ে বসে এবং যে 'খুদী' আল্লাহর দাস ও আদেশানুগামী হয়ে থাকে, এ দু' প্রকার খুদীর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য

রয়েছে। সফল জীবনযাপনের জন্য অনুগত 'খুদী' একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু যে খুদী সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে, বিশ্ব মালিকের অধীনতা ও আনুগত্য স্বীকার করে না, বরং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, যে 'খুদী' কোন উচ্চতর নৈতিক বিধান মেনে নিতে প্রস্তুত নয়, কোন হিসেব গ্রহণকারীর কাছে জবাবদিহি করার ভয় যার নেই, সে যদি নিজের দেহ ও মনের সমগ্র শক্তি নিচয়কে করায়ত্ব করে অত্যন্ত শক্তিশালী এক 'খুদী'তে পরিণত হয়, তবে তা দুনিয়ার ফেরাউন, নমরূদ, হিটলার ও মুসোলিনির ন্যায় বড় বড় প্রলয় সৃষ্টিকারীর-ই উদ্ভব করতে পারে। কিন্তু এরূপ আত্মসংযম কখনও প্রশংসনীয় হতে পারে না। ইসলামও এ ধরনের আত্মসংযম মোটেই সমর্থন করে না। প্রথমে মানুষের 'খুদী' নিজ আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত হবে, আনুগত্যের মস্তক অবনত করবে, তাঁর সন্তোষ লাভের জন্য চেষ্টা করা এবং তাঁর আইনের আনুগত্য করাকেই নিজের প্রধান হিসেবেই গ্রহণ করবে, তাঁরই সামনে নিজেকে দায়ী মনে করবে— ইস-লাম এরূপ 'খুদী'কেই সমর্থন করে। এরূপ অনুগত ও বিশ্বস্ত 'খুদী'ই স্বীয় দেহ ও শক্তি নিচয়ের ওপর নিজের প্রভুত্ব ক্ষমতা এবং তার মন ও কামনা-বাসনার ওপর স্বীয় শক্তি-আধিপত্য কায়েম করবে—যেন তা দুনিয়ায় সংস্কার সংশোধন করার জন্য এক বিরাট শক্তিরূপে মাথা তুলতে পারে।

বস্তুত এটাই ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মসংযমের প্রকৃত ও মূল কথা। রোযা মানুষের মধ্যে এরূপ আত্মসংযমের প্রবল শক্তি কিরূপে সৃষ্টি করে, এখন আমরা তাই আলোচনা করবো। নফস ও দেহের যাবতীয় দাবী-দাওয়া যাচাই করে দেখলে পরিষ্কাররূপে জানা যায় যে, তার মধ্যে তিনটি দাবী হচ্ছে মূল এবং ভিত্তিগত। বস্তুত এ তিনটিই অধিকতর শক্তিসম্পন্ন দাবী। প্রথমেই হচ্ছে ক্ষুন্নিবৃত্তির দাবী। জীবন রক্ষা একমাত্র এরই ওপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়, যৌন আবেগের দাবী। মানুষের বংশ তথা মানব জাতির স্থিতির এটাই একমাত্র উপায় এবং তৃতীয়, শান্তি ও বিশ্রাম গ্রহণের দাবী। কর্মশক্তিকে নতুন করে জাগ্রত এবং বলিষ্ঠ করে তুলার জন্য এটা অপরিহার্য। মানুষের এ তিনটি দাবী যদি নিজ নিজ সীমার মধ্যে থাকে, তবে তা বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত ভাবধারার অনুরূপ হবে, সন্দেহ নেই। অন্যদিকে নফস ও দেহের কাছে এ জিনিসই হচ্ছে বড় ফাঁদ। একটু ঢিল—একটু সুযোগ পেলেই এ তিনটি ফাঁদ মানষের খুদীকে বন্দী করে নিজের গোলাম—নিজের দাসানুদাস বানিয়ে নেয়। ফলে এর প্রত্যেকটি দাবীই সম্প্রসারিত হয়ে অসংখ্য দাবীর একটি সুদীর্ঘ ফিরিস্তি হয়ে পড়ে। একটি দুর্বল খুদী যখন এসব দাবীর কাছে পরাজিত হয়, তখন খাদ্যের দাবী তাকে পেটের দাস বানিয়ে দেয়, যৌনক্ষুধা তাকে পশু অপেক্ষাও নিম্নস্তরে ঠেলে দেয় এবং দেহের বিশ্রামপ্রিয়তা তার ইচ্ছাশক্তিকে বিলোপ করে। অতপর

সে আর তার নফস ও দেহের শাসক বা পরিচালক থাকে না, বরং সে তখন এর অধীন আদেশানুগত দাসে পরিণত হয় এবং এর নির্দেশসমূহকে —ভাল-মন্দ, সংগত, অসংগত সকল উপদেশ--পালন করে চলাই তার একমাত্র কাজ হয়।

রোযা নফসের এ তিনটি লালসা বাসনাকে নিয়ন্ত্রিত করে—নিয়মানুগ করে তোলে এবং 'খুদী'কে তার ওপর প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারে অভ্যস্ত করে দেয়। যে খুদী আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এ রোযা তাকে সম্বোধন করে বলে ঃ আল্লাহ আজ সারাটি দিন পানাহার করাকে তোমার ওপর নিষেধ বা হারাম করেছে, এ সময়ের মধ্যে কোন পবিত্র খাদ্য এবং সদুপায়ে অর্জিত কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করাও জায়েয নয়।

সে বলে ঃ আজ তোমার মালিক মহান আল্লাহ তোমার যৌনক্ষুধা চরিতার্থ করার ওপরে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। সুবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিতান্ত হালাল উপায়েও নফসের লালসা-বাসনা পূর্ণ করা তোমার জন্য হারাম করে দিয়েছেন। সে আরও বলে দেয় যে, সারাদিনের দুঃসহ ক্ষুধা পিপাসার পর যখন তুমি ইফতার করবে, তখন তুমি পরিশ্রান্ত হয়ে আরাম করার পরিবর্তে ওঠ এবং অন্যান্য দিনের চেয়েও বেশী ইবাদাত কর।

বস্তুত এতেই তোমার রাব্বুল আলামীনের সন্তোষ নিহিত আছে। রোযা তাকে এটাও জানিয়ে দেয় যে, বহু রাকাআতের নামায সমাপ্ত করে যখন বিশ্রাম করবে, তখন সকাল পর্যন্ত বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে থেকো না। সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হলেও শেষ রাতে সেহরী খাওয়ার জন্য জাগো এবং সুবহে সাদেকের আলোকচ্ছটা ফুটে ওঠার পূর্বেই তোমার দেহকে খাদ্য দ্বারা শক্তিশালী করে তোল। খুদী রোযার এসব হুকুম-আহকাম মানুষকে শুনিয়ে তদনুযায়ী আমল করার সম্পূর্ণ ভার তার ওপরেই ন্যস্ত করে। তার পিছনে কোন পুলিশ কোন সি, আই, ডি, কিংবা প্রভাব বিস্তার করার মত শক্তি নিযুক্ত করা হয় না। সে যদি গোপনে খাদ্য গ্রহণ করে, কিংবা যৌনক্ষুধার পরিতৃপ্তি সাধন করে, তবে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তা দেখতে পায় না। তারাবীহ নামায পড়া থেকে বাঁচার জন্য সে যদি কোন শরীয়াতী কৌশল অবলম্বন করে তবে কোন পার্থিব শক্তিই তার প্রতিরোধ করতে পারে না। সবকিছুই তার নিজের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। মু'মিন ব্যক্তির 'খুদী' যদি বাস্তবিকই আল্লাহর অধীন ও অনুগত হয়ে থাকে, তার ইচ্ছাশক্তিতে যদি নফসকে নিয়ন্ত্রিত করার মত ক্ষমতা থাকে, তবে সে নিজেই আহারের তীব্র আগ্রহ, যৌনক্ষুধা ও লালসাকে এবং বিশ্রাম প্রিয়তাকে রোযার উপস্থাপিত অসাধারণ নিয়ম-নীতির বাঁধনে নিজেই মযবুত করে বেঁধে দেবে।

এটা কেবল একদিনেরই অনুশীলন নয়, এ ধরনের ট্রেনিং-এর জন্য মাত্র একটি দিন মোটেই যথেষ্ট নয়। ক্রমাগত নিরবচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘ ৩০টি দিন মানুষই মানুষের খুদীকে এমনি ট্রেনিং ও অনুশীলনের মধ্যেই অতিক্রম করতে হয়। বছরে একটি বার পুরো ৭২০ ঘন্টার জন্য এ প্রোগ্রাম রচনা করা হয় যে, শেষ রাতে জেগে সেহরী খাও, ঊষার শুভ্রচ্ছটার সূচনা হলেই পানাহার বন্ধ কর। সমগ্র দিন ভর সকল প্রকার খানাপিনা পরিহার কর। সূর্যাস্তের ঠিক পর মুহূর্তেই যথাসময়ে ইফতার কর। তারপর রাতের একটি অংশ তারাবীর নামাযে— যে নামায সাধারণত পড়া হয় না—অতিবাহিত কর। তারপর কয়েক ঘন্টা বিশ্রামের পর আবার নতুন করে কার্যসূচী অনুযায়ী কাজ শুরু করে দাও। এভাবে পুরো একমাস ধরে ক্রমাগত নফসকে তার তিনটি সবচেয়ে বড় এবং সর্বাপেক্ষা বেশী শক্তিশালী দাবী ও লালসাকে এক কঠিন নিয়মের দুচ্ছেদ্য বাঁধনে আবদ্ধ করা হয়। এর ফলে 'খুদী'র মধ্যে একটি বিরাট শক্তি স্ফূরিত হয়, তা আল্লাহর মর্জি অনুসারে নিজের নফস ও দেহের ওপরে শাসন ক্ষমতা চালাতে সমর্থ হয়। পরন্তু সারা জীবনভর মাত্র একবারের জন্য এ প্রোগ্রাম করা হয়নি। বালেগ হবার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক বছর দীর্ঘ একটি মাস এ কাজেই ব্যয়িত হয়। ফলে নফসের ওপর 'খুদী'র বাঁধন বার বার নূতন এবং শক্ত হয়ে যায়।

এরূপ শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য কেবল এটাই নয় যে, মু'মিনের 'খুদী' তার ক্ষুধা, পিপাসা, যৌনবৃত্তি এবং বিশ্রাম অভিলাষকেই আয়ত্বাধীন করে নিবে আর কেবল রমযান মাসের জন্যই এরূপ হবে, এ উদ্দেশ্য তার নয়। মানুষের তিনটি সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে বেশী জোরদার ও শাণিত হাতিয়ারের সাথে মুকাবিলা করে তার 'খুদী' অন্যান্য সমগ্র আবেগ-উচ্ছ্বাস, হৃদয়বৃত্তি এবং সকল প্রকার লোভ-লালসাকে নিয়মানুগ ও বিধিবদ্ধ করে দেয়। তাতে এমন এক নতুন শক্তির উদ্ভব হয় যে, কেবল রমযান মাসেই নয় অতপর বাকী এগারোটি মাস ধরে তা বলিষ্ঠ ও শাণিত থাকে এবং রীতিমত কাজ করে। এ সময় আল্লাহর নির্ধারিত প্রত্যেকটি কাজেই সে তার দেহ ও যাবতীয় শক্তি নিযুক্ত করতে পারে, আল্লাহর সন্তোষ লাভ হয় এমন প্রত্যেকটি ভাল কাজের চেষ্টা করতে পারে, আল্লাহর নিষিদ্ধ ও অমনোনীত প্রত্যেকটি পাপ কাজকে রুখে দাঁড়াতে পারে এবং তার যাবতীয় লোভ-লালসাকে আবেগ-উচ্ছ্বাস ও হৃদয় বৃত্তিতে আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয়। তার নফসের হাতে ছেড়ে দেয় না, তাই যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকেই টেনে নিতে পারে না। প্রভুত্বের রজ্জু তার নিজের হাতেই ধরে রাখে। নফসের যেসব লালসাকে যে সময় যতখানি এবং যেভাবে পূর্ণ করার অনুমতি আল্লাহ তাআলা

দিয়েছেন সে তাকে সেই নিয়ম অনুসারেই পূর্ণ করে। তার ইচ্ছাশক্তিও এতখানি দুর্বল হয় না যে, সে ফরযকে ফরয জেনে এবং তা পালন করার ইচ্ছা সত্ত্বেও পালন করতে পারে না। শুধু এজন্য দেহ রাজ্যের ওপরে সে প্রবল পরাক্রমশালী এক শাসনকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুত এ শক্তি মানুষের অভ্যন্তরে মানুষের 'খুদী'তে সৃষ্টি করাই রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি রোযা রেখেও এ শক্তি লাভ করতে পারে না, সে নিজেকে ক্ষুৎ-পিপাসায় পরিশ্রান্ত ও জর্জরিত করেছে। তার উপবাস ও পানাহার পরিত্যাগ একেবারে নিষ্ফল।

কুরআন এবং হাদীস—দু'টিতে একথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা কাজ করা পরিহার করতে পারলো না, তার পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনই আবশ্যকতা নেই। তিনি আরো বলেছেন যে, অনেক রোযাদার এমন আছে, যারা রোযা হতে ক্ষুৎ-পিপাসার ক্লান্তি ভিন্ন আর কিছুই লাভ করতে পারে না।

চতুর্থ অধ্যায়

যাকাতের হাকীকত

بسم الله الرحمن الرحيم

যাকাতের গুরুত্ব

নামাযের পর ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। সাধারণত নামাযের পরই রোযার উল্লেখ করা হয় বলে অনেকের মনে এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, নামাযের পরই বুঝি রোযার স্থান। কিন্তু কালামে পাক থেকে জানা যায় যে, নামাযের পর যাকাতই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই দু'টি ইসলামের প্রধান স্তম্ভ—এটা বিধ্বস্ত হয়ে গেলে ইসলামের প্রাসাদও ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

'যাকাত' অর্থ পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতা। নিজের ধন-সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ গরীব-মিসকীন ও অভাবী লোকদের মধ্যে বন্টন করাকে 'যাকাত' বলা হয়। কারণ এর ফলে সমগ্র ধন-সম্পত্তি এবং সেই সাথে তার নিজের আত্মার পরিশুদ্ধি হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ তাঁর বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ ব্যয় করে না, তার সমস্ত ধন অপবিত্র এবং সেই সাথে তার নিজের মন ও আত্মা পংকিল হতে বাধ্য। কারণ, তার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার নামগন্ধ মাত্র বর্তমান নেই। তার দিল এতদূর সংকীর্ণ, এতদূর স্বার্থপর এবং এতদূর অর্থ পিশাচ যে, যে আল্লাহ অনুগ্রহ পূর্বক তাকে প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন-সম্পদ দান করেছেন তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতেও তার মন কুণ্ঠিত হয়। এমন ব্যক্তি দুনিয়ায় খালেছভাবে আল্লাহর জন্য কোন কাজ করতে পারবে, তার দ্বীন ও ঈমান রক্ষার্থে কোনরূপ আত্মত্যাগ ও কুরবানী করতে প্রস্তুত হতে পারবে বলে মনে করা যেতে পারে কি? কাজেই একথা বলা যেতে পারে যে, যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না তার দিল নাপাক, আর সেই সাথে তার সঞ্চিত ধন-মালও অপবিত্র, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

'যাকাত' ফরয করে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটি মানুষকে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছানুক্রমেই প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন-মাল হতে আল্লাহর নির্দিষ্ট হিস্যা আদায় করে এবং আল্লাহর বান্দাহদের যথাসাধ্য সাহায্য করে, বস্তুত সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাজ করার উপযুক্ত, ঈমানদার লোকদের মধ্যে গণ্য হওয়ার যোগ্যতা তারই রয়েছে। পক্ষান্তরে যার দিল এতদূর সংকীর্ণ যে, আল্লাহর জন্য এতটুকু কুরবানী করতে প্রস্তুত হয় না, তার দ্বারা আল্লাহর কোন কাজই সাধিত হতে পারে না—সে ইসলামী

জামায়াতে গণ্য হবার যোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে তাকে মানব দেহের একটি পঁচা অংগ মনে করা যেতে পারে, আর পঁচা অংগকে যত শীঘ্র কেটে বিচ্ছিন্ন করা যায় শরীরের অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগের পক্ষে ততই মংগল। অন্যথায় সমগ্র দেহেই পচন শুরু হবে। এ জন্যই হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পর যখন আরবের কোন এক গোত্রের লোক যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করেছিল, তখন (প্রথম খলীফা) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) তাদের বিরুদ্ধে—কাফেরদের বিরুদ্ধে যেমন করতে হয় ঠিক তেমনি—যুদ্ধের কথা ঘোষণা করেছিলেন। অথচ তারা নামায পড়তো, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি তাদের ঈমানও বর্তমান ছিল। এতে নিসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, যাকাত আদায় না করলে নামায-রোযা ইত্যাদি তার কোন কাজই আল্লাহর কাছে গৃহীত হতে পারে না, আর এরূপ ব্যক্তির ঈমানদার হওয়ার দাবী করার আদৌ কোন মূল্য নেই।

কুরআন মজীদ থেকে নিসন্দেহে জানতে পারা যায়, প্রাচীনকাল থেকে প্রত্যেক নবীর উম্মাতের প্রতিই সমানভাবে নামায ও যাকাত আদায় করার কঠোর আদেশ করা হয়েছিল—দ্বীন ইসলামের কোন অধ্যায়েই কোন নবীর সময়ে কোন মুসলমানকেই নামায ও যাকাত থেকে রেহাই দেয়া হয়নি। হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর বংশের নবীদের কথা আলোচনা করার পর কুরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاۤءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۝ (الانبياء : ٧٣)

"আমরা তাদেরকে মানুষের নেতা বানিয়েছি, তারা আমাদেরই বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করে—পথপ্রদর্শন করে। আমরা ওহীর সাহায্যে তাদেরকে ভাল কাজ করার, নামায কায়েম করার এবং যাকাত আদায় করার আদেশ করেছি, তারা খাঁটিভাবে আমার ইবাদাত করতো—হুকুম পালন করতো।"-(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৭৩)

হযরত ইসমাঈল (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۖ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ۝

"তিনি তাঁর লোকদেরকে নামায এবং যাকাত আদায় করার আদেশ করতেন এবং আল্লাহর দরবারে তিনি বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন।"

-(সূরা মরিয়ম ঃ ৫৫)

হযরত মূসা (আ) তাঁর নিজের সম্পর্কে দোয়া করেছিলেন— "হে আল্লাহ ! এ দুনিয়ায় আমাদের মংগল দাও, পরকালেও কল্যাণ দান কর।" এর উত্তরে আল্লাহ্ সূরা আল আরাফের ১৫৬ আয়াতে বলেছিলেন ঃ

عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِۦ مَنْ أَشَآءُ ۖ وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَالَّذِينَ هُم بِـَٔايَـٰتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝

"যাকে ইচ্ছা হবে, তাকে আমার আযাবে নিক্ষেপ করবো। যদিও আমার রহমাত সকল জিনিসের ওপরই পরিব্যাপ্ত আছে ; কিন্তু তা কেবল সেই লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট করবো যারা আমাকে ভয় করবে এবং যাকাত আদায় করবে, আর যারা আমার বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।"
—(সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৬)

হযরত মূসা (আ)-এর জাতির লোকদের দিল অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল। ধন-সম্পদ লাভের জন্য প্রাণ দিতেও তারা কুণ্ঠিত হতো না। বর্তমানকালের ইয়াহুদীরাই তার বাস্তব উদাহরণ। এজন্য আল্লাহ্ তাআলা এ মহান সম্মানিত পয়গাম্বরের প্রার্থনা উত্তরে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন যে, তোমার উম্মাত যথারীতি যাকাত আদায় করলে আমার রহমাত পেতে পারবে অন্যথায় পরিষ্কার জেনে রাখ, তারা আমার রহমাত হতে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হবে এবং আমার আযাব তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নেবে। হযরত মূসা (আ)-এর পরেও বনী ইসরাঈল-গণকে বার বার এ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। বার বার তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছে ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করবে না এবং রীতিমত নামায ও যাকাত আদায় করবে (সূরা আল বাকারা, রুকূ ১০)। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে সুস্পষ্ট নোটিশ দেয়া হয়েছে এই বলে ঃ

وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ ـ(المائدة : ١٢)

"আল্লাহ্ বললেন, হে বনী ইসরাঈলগণ ! তোমরা যদি নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় করতে থাক, আমার রাসূলদের ওপর ঈমান আন, তাদের সাহায্য কর এবং আল্লাহকে করযে হাসানা দাও, তাহলে আমি তোমাদের সাথী এবং তোমাদের দোষ-ত্রুটিগুলো দূর করে দেব (অন্যথায় রহমাত লাভের কোন আশাই তোমরা করতে পার না)।"—(সূরা মায়েদা ঃ ১২)

হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-ই সর্বশেষ নবী ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকেও একই সাথে নামায এবং যাকাতের হুকুম দিয়েছেন। সূরা মরিয়ামে বলা হয়েছে ঃ

وَجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَاكُنْتُ ص وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝ (مريم : ٣١)

"আল্লাহ আমাকে মহান করেছেন—যেখানেই আমি থাকি এবং যতদিন আমি জীবিত থাকবো ততদিন নামায পড়া ও যাকাত আদায় করার জন্য আমাকে নির্দেশ করেছেন।"–(সূরা মরিয়াম ঃ ৩১)

এ থেকে নিসন্দেহে জানতে পারা যায় যে, দ্বীন ইসলাম প্রত্যেক নবীর সময়ই নামায ও যাকাত এ দু'টি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়েছিল। আল্লায় বিশ্বাসী কোন জাতিকেই এ দু'টি কর্তব্য থেকে কখনও নিষ্কৃতি দেয়া হয়নি।

হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর উপস্থাপিত শরীয়াতে এ দু'টি ফরযকে কিভাবে পরস্পর যুক্ত ও অবিচ্ছেদ্য করে দেয়া হয়েছে, তা অনুধাবন যোগ্য। কুরআন পাকের প্রথমেই যে আয়াতটি উল্লেখিত রয়েছে, তা এই ঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ ج فِيْهِ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ (البقرة : ٢-٣)

"এই কুরআন আল্লাহর কিতাব—এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। এটা পরহেযগার, আল্লাহভীরু লোকদেরকে দুনিয়ার জীবনের সঠিক ও সোজা পথপ্রদর্শন করে। পরহেযগার তারাই যারা অদৃশ্যকে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২-৩)

অতপর বলা হয়েছে ঃ

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ق وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ (البقرة : ٥)

"বস্তুত এরাই রব প্রদত্ত হেদায়াত লাভ করেছে এবং এরাই সফলকাম। অর্থাৎ যাদের ঈমান নেই এবং নামায ও যাকাত আদায় করে না তারা শুধু আল্লাহর হেদায়াত থেকেই বঞ্চিত নয়, কল্যাণ ও সাফল্য তাদের ভাগ্যে জুটবে না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৫)

তারপর এই সূরা আল বাকারা পড়তে পড়তে সামনে এগিয়ে যান, কয়েক পৃষ্ঠা পরই আদেশ হয়েছে ঃ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ـ(البقرة : ٤٣)

"নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকূ'কারীদের সাথে একত্রিত হয়ে রুকূ' কর (জামায়াতের সাথে নামায আদায় কর)।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ৪৩)

অতপর কিছুদূর অগ্রসর হয়ে এই সূরায় বলা হয়েছে ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○ (البقرة : ١٧٧)

"পূর্ব কিংবা পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়ালেই কোন পুণ্য লাভ হয় না বরং যে ব্যক্তি আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব এবং পয়গাম্বরদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহর প্রেমে তার অভাবী আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকীন, পথিক ও প্রার্থীকে নিজেদের ধন-সম্পদ দান করে, অন্য লোকদেরকে তাদের ঋণ, দাসত্ব কিংবা কয়েদ থেকে মুক্তি লাভের ব্যাপারে সাহায্য করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, বস্তুত একমাত্র তারাই পুণ্য লাভ করতে পারে। আর যারা প্রতিশ্রুতি পূরণ করে, বিপদ, ক্ষতি-লোকসান এবং যুদ্ধের সময় যারা ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর সত্য পথে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকে, তারাই পুণ্যবান। তারাই খাঁটি মুসলমান, মুত্তাকী ও পরহেযগার।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭)

এরপর সূরা আল মায়েদায় এ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাও প্রণিধানযোগ্য ঃ

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ○ وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۵ (المائدة : ٥٥ـ٥٦)

"মুসলমান ! তোমাদের প্রকৃত বন্ধু সাহায্যকারী হচ্ছে শুধু আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদার লোকগণ মাত্র। ঈমানদার লোক বলতে তাদেরই বুঝায়, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহর সামনে মাথা নত করে। অতএব যারা আল্লাহ, রাসূল এবং ঈমানদারদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, তারা আল্লাহর দল বলে বিবেচিত হবে এবং আল্লাহর দলই নিশ্চিতরূপে বিজয়ী হবে।"–(সূরা মায়েদা ঃ ৫৫-৫৬)

এই আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, এই আয়াত থেকে জানা গিয়েছে যে, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে তারাই মুসলমান। ইসলামের এ দু'টি 'রুকন'কে যে ব্যক্তি যথাযথরূপে আদায় করবে না, তার ঈমানদার হওয়ার দাবী মূলত মিথ্যা। দ্বিতীয়ত, এ আয়াত থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ, আল্লাহ রাসূল এবং ঈমানদার লোকগণ একটি দলভুক্ত। অতএব ঈমানদার ব্যক্তিগণের অন্যান্য সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে এই পার্টিতে শামিল হতে হবে। এই দলের বাইরের কোন ব্যক্তিকে সে পিতা হোক, ভাই হোক, পুত্র হোক, প্রতিবেশী, স্বদেশবাসী কিংবা অন্য যে কেউ হোক না কেন—কোন মুসলমান যদি তাকে নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে এবং তার সাথে ভালবাসা ও সহানুভূতির সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে আল্লাহ তাআলা যে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হবে, এমন আশা কিছুতেই করা যেতে পারে না। সর্বশেষে এই আয়াত থেকে একথাও জানা গেল যে, ঈমানদার লোকগণ দুনিয়ায় কেবল তখনই জয়ী হতে পারে যখন তারা একনিষ্ঠ হয়ে শুধু আল্লাহ, রাসূল এবং ঈমানদার লোকদেরকেই নিজেদের পৃষ্ঠপোষক, বন্ধু সাহায্যকারী এবং সাথী হিসেবে গ্রহণ করবে।

আরও খানিকটা অগ্রসর হয়ে সূরা 'তাওবা'য় আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে কাফের ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ক্রমাগত কয়েক রুকূ' পর্যন্ত এই যুদ্ধ সম্পর্কে হেদায়াত দিয়েছেন। এই প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ط

"তারা যদি কুফর ও শিরক থেকে 'তাওবা' করে খাঁটিভাবে ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাইয়ে পরিণত হবে।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ১১)

অর্থাৎ শুধু কুফর ও শিরক থেকে 'তাওবা' করা এবং ঈমান আনার কথা প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়, সে যে কুফর ও শিরক থেকে তাওবা করেছে এবং প্রকৃতপক্ষেই ঈমান এনেছে, তার প্রমাণের জন্য যথারীতি নামায আদায় করা

এবং যাকাত দেয়াও অপরিহার্য। অতএব, তারা যদি তাদের এরূপ বাস্তব কাজ দ্বারা একথার প্রমাণ পেশ করে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই, অন্যথায় তাদেরকে 'ভাই' মনে করা তো দূরের কথা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও বন্ধ করা যাবে না। এ সূরায় আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اُولٰۤئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط (التوبة : ٧١)

"ঈমানদার পুরুষ এবং ঈমানদার স্ত্রীলোকেরাই প্রকৃতপক্ষে পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ও সাহায্যকারী। এদের পরিচয় এবং বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা নেক কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, আল্লাহ ও রাসূলের বিধান মেনে চলে। প্রকৃতপক্ষে এদের প্রতিই আল্লাহ রহমাত বর্ষণ করবেন।"

–(সূরা আত তাওবা ঃ ৭১)

অন্য কথায় কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান এনে কার্যত নামায ও যাকাত আদায় না করবে, ততক্ষণ সে মুসলমানদের দ্বীনি ভাই রূপে পরিগণিত হতে পারবে না। বস্তুত ঈমান, নামায ও যাকাত এ তিনটি জিনিসের সমন্বয়েই ঈমানদার লোকদের জামায়াত গঠিত হয়। যারা এ কাজ যথারীতি করে, তারা এই পাক জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদেরই পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব, ভালবাসা ও সহানুভূতির সম্পর্ক স্থাপিত হবে। আর যারা এ তিনটি কাজ করে না, তারা এ জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের নাম মুসলমানদের ন্যায় হলেও ইসলামী জামায়াতের মধ্যে শামিল হতে পারে না। এখন তাদের সাথে বন্ধুত্ব, প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করলে আল্লাহর আইন ভংগ করা এবং তাতে আল্লাহর পার্টির শৃংখলা নষ্ট করা হবে। তাহলে এসব লোক দুনিয়ায় জয়ী হয়ে থাকার আশা কি করে করতে পারে?

আরও সামনে অগ্রসর হলে সূরা হজ্জ-এ দেখা যায়, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ ○ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○ (الحج : ٤٠-٤١)

"যে আল্লাহর সাহায্য করবে, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তার সাহায্য করবেন। আল্লাহ তাআলা বড়ই শক্তিমান এবং সর্বজয়ী। (আল্লাহর সাহায্য তারাই করতে পারে) যাদেরকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করলে তারা নামায আদায়ের (সামাজিক) ব্যবস্থা কায়েম করবে এবং সামগ্রিকভাবে যাকাত আদায় করবে, লোককে সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। বস্তুত সকল জিনিসের পরিণাম আল্লাহর ওপরই নির্ভর করে।"-(সূরা আল হজ্জ ঃ ৪০-৪১)

বনী ইসরাঈলদের ইতিপূর্বে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এ আয়াতে মুসলমানদেরকেও ঠিক সেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে বনী ইসরাঈলদেরকে বলা হয়েছিল যে, তারা যতদিন নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে এবং নবীদের কাজে সাহায্য করতে থাকবে অর্থাৎ আল্লাহর আইন জারি করবে, ততদিন আল্লাহ্ তাদের সাথী ও সাহায্যকারী থাকবেন। আর যখন এ কাজ তারা ত্যাগ করবে, তখনই আল্লাহ্ তাদের প্রতি সকল সাহায্য বন্ধ করে দেবেন। ঠিক একথাই এ আয়াতে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, দুনিয়ায় শক্তি লাভ করে যদি তারা নামায আদায়ের সামাজিক ব্যবস্থা এবং যাকাত আদায়ের সামগ্রিক পন্থা প্রতিষ্ঠা করে আর ভাল কাজের প্রচার ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ করে, তাহলে আল্লাহ্ তাদের সাহায্যকারী হবেন। বস্তুত, আল্লাহ্ অপেক্ষা শক্তিমান সাহায্যকারী আর কেউ হতে পারে না। তিনি যাকে সাহায্য করবেন, তাকে আর কেউ পরাভূত করতে পারে না। কিন্তু মুসলমান যদি নামায ও যাকাত আদায় করা পরিত্যাগ এবং দুনিয়ার শক্তি লাভ করে সৎকাজের পরিবর্তে অসৎকাজের প্রচার করে, অন্যায়কে নির্মূল না করে সৎকাজের পথ বন্ধ করতে থাকে, আল্লাহর কালেমাকে বিজয়ী করার পরিবর্তে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করতে শুরু করে আর কর আদায় করে নিজেদের জন্য দুনিয়ার বুকে 'স্বর্গ' রচনা করাকে রাজত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করে, তাহলে আল্লাহর সাহায্য তাদের ভাগ্যে কখনো জুটবে না। তারপর শয়তানই হবে তাদের সাহায্যকারী। ভাবতে অবাক লাগে, এটা কত বড় শিক্ষার কাজ ! বনী ইসরাঈল আল্লাহ্ প্রদত্ত এই বাণীকে অমূলক ও মৌখিক মাত্র মনে করেছিল। ফলে তার বিপরীত কাজ করে তাদেরকে দুনিয়ার দিকে দিকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে ঘুরে মরতে হচ্ছে। বিভিন্ন স্থান থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করা হচ্ছে, কোথাও তারা স্থায়ীভাবে আশ্রয় লাভ করতে পারছে না। এরা দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী সম্প্রদায়, কোটি কোটি টাকা তাদের ভাণ্ডারে স্তুপীকৃত হয়ে আছে, কিন্তু এ টাকা তাদের কোন কাজেই লাগছে না। নামাযের পরিবর্তে অসৎকাজ

এবং যাকাতের বদলে সুদখোরীর অভিশপ্ত পন্থাকেই অবলম্বন করে তারা একদিকে নিজেরা আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত হচ্ছে, অপর দিকে তারা প্লেগের ইঁদুরের ন্যায় দুনিয়ার দিকে দিকে এ অভিশাপ সংক্রমিত করে ফিরছে। মুসলমানদেরকেও এ হুকুমই দেয়া হয়েছে। কিন্তু মুসলমানগণ সেই দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নামায আদায় ও যাকাতদানের ক্ষেত্রে উদাসীন হয়েছে এবং আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি প্রয়োগ করে সত্য প্রচার এবং মিথ্যা ও অন্যায় প্রতিরোধের দায়িত্ব পালন করা ভুলে বসেছে। আর এর তিক্ত ফলও তারা নানাভাবে ভোগ করছে। (দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম ও মহাশক্তিধর) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সমগ্র দুনিয়ায় তারা সকল যালেম শক্তির নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তারা দুর্বল ও পরাভূত। নামায ও যাকাত ত্যাগ করার কুফল তো দেখলেন। এখন এদের (বনী ইসরাঈলদের মধ্যে) এমন একটি দল সৃষ্টি হয়েছে যারা মুসলমানদের মধ্যে লজ্জাহীনতা, অশ্লীলতা, পর্দাহীনতা এবং কুৎসিত কাজের প্রবর্তন করতে বদ্ধপরিকর। তারা মুসলমানদেরকে বলছে, "তোমাদের আর্থিক অসচ্ছলতা দূর করতে হলে ব্যাংক ও ইন্সুরেন্স কোম্পানী খুলে পেট ভরে সুদ খাও।" কিন্তু সত্য কথা এই যে, মুসলমানগণও যদি এতেই লিপ্ত হয়ে থাকে, তবে তাদেরকেও ইয়াহুদীদের ন্যায় চরম লাঞ্ছনার এক কঠিন বিপদে নিক্ষেপ করা হবে এবং চিরন্তন অভিশাপে অভিশপ্ত হবে।

যাকাত কি জিনিস এতে আল্লাহ তাআলা কত বড় শক্তি নিহিত রেখেছেন, যদিও মুসলমানগণ এটাকে একটি অতি সাধারণ জিনিস বলে মনে করছে, অথচ তাতে যে কত বিরাট লাভের সম্ভাবনা রয়েছে এসব বিষয়ে পরবর্তী প্রবন্ধগুলোতে আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো ; এই প্রবন্ধটিতে আমি শুধু একথাই বলতে চাচ্ছি যে, নামায ও যাকাত ইসলামের একান্ত বুনিয়াদী জিনিস। ইসলামে এই দু'টির গুরুত্ব এত অধিক যে, এটা যেখানে নেই সেখানে আর যাই থাক, ইসলাম যে নেই তা সন্দেহাতীত। অথচ অনেক 'মুসলমান' আজ নামায কায়েম না করে এবং যাকাত আদায় না করেও 'মুসলমান' হিসেবে গণ্য হতে চায় এবং তাদের তথাকথিত কিছু ধর্মগুরুও এ বিষয়ে তাদেরকে নিশ্চয়তা দান করেছে। কিন্তু কুরআন তাদের দাবীর তীব্র প্রতিবাদ করে। মানুষ যদি কালেমায়ে তাইয়্যেবা পড়ে তার সত্যতা প্রমাণের জন্য নামায এবং যাকাত আদায় না করে, তাহলে কুরআনের দৃষ্টিতে তার এ কালেমা পড়া একেবারেই অর্থহীন। এজন্যই হযরত আবু বকর (রা) যাকাত দিতে অস্বীকারকারী ব্যক্তিদের কাফের মনে করে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। যারা আল্লাহ ও রাসূলকে মানে এবং নামাযও পড়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা জায়েয কিনা সাহাবায়ে কেরামের মনে তখন এই সন্দেহ জাগ্রত

হয়েছিল। কিন্তু যখন হযরত আবু বকর (রা) যাকে আল্লাহ তাআলা নবুয়াতের কাছাকাছি সম্মান দান করেছিলেন—সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন ঃ আল্লাহর শপথ, রাসূলে করীম (সা)-এর জীবনে যারা যাকাত দিত, আজ যদি কেউ তার উট বাঁধার একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে, তবে তার বিরুদ্ধে আমি অস্ত্র ধারণ করবো। শেষ পর্যন্ত সকল সাহাবীই একথার যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং সকলে একমত হয়ে ঘোষণা করলেন যে, যারা যাকাত দিবে না তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা অপরিহার্য। কুরআন শরীফ সুস্পষ্ট ভাষায় বলছে যে, যাকাত না দেয়া কেবল পরকালে অবিশ্বাসী মুশরিকদেরই কাজ ঃ

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ لَايُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

"যেসব মুশরিক যাকাত দেয় না, যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে, তাদের ধ্বংস অনিবার্য।"-(সূরা হা-মীম-আস-সিজদা ঃ ৬-৭)

যাকাতের মর্মকথা

পূর্বে বলা হয়েছে, নামাযের পর ইসলামের সর্বপ্রধান 'রুকন' হচ্ছে যাকাত। আর তার গুরুত্ব এতবেশী যে, নামাযকে অস্বীকার করলে যেমন কাফের হতে হয়, অনুরূপভাবে যাকাত দিতে অস্বীকার করলে তাকে শুধু কাফেরই হতে হয় না, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম একমত হয়ে তার বিরুদ্ধে জিহাদও করেছেন।

এখানে আমি যাকাতের প্রকৃত রূপ এবং এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব আলোচনা করতে চেষ্টা করবো। যাকাত মূলত কি জিনিস এবং ইসলাম এর এতবেশী গুরুত্ব দেয় কেন তা আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

আমাদের মধ্যে অনেক লোকই যার তার সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। অথচ কাউকে বন্ধু বলে স্বীকার করার সময় সে বাস্তবিকই বন্ধুত্বের উপযুক্ত লোক কিনা তা পরীক্ষা এবং যাচাই করে দেখে না। এ কারণে বন্ধুত্বের ব্যাপারে তারা প্রায়ই প্রতারিত হয়ে থাকে। পরে তাদের বড় দুঃখ এবং অনুতাপ করতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যারা বুদ্ধিমান তারা যাদের সাথে মেলামেশা করে তাদেরকে খুব ভাল করে যাচাই পরীক্ষা করে নেয় এবং পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যাদেরকে তারা খুব ভাল লোক, নির্ভরযোগ্য, নিষ্ঠাবান ও বিশ্বাসভাজন বলে মনে করে, কেবল তাদের সাথেই বন্ধত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে, আর অন্যান্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ও সর্বাভিজ্ঞ। তিনি যাকে তাকে নিজের বন্ধু বানাবেন, নিজের দলভুক্ত করে নিবেন এবং তাঁর দরবারে সম্মান ও নৈকট্যের মর্যাদা দান করবেন তা কি করে আশা করা যেতে পারে? সাধারণ বুদ্ধিমান মানুষ যখন পরীক্ষা ও যাচাই না করে কারো সাথে বন্ধুত্ব করতে রাযী হয় না, তখন সকল জ্ঞান ও বুদ্ধির একচ্ছত্র অধিকারী আল্লাহ তাআলা খুব ভালভাবে যাচাই ও পরীক্ষা না করে কাউকে বন্ধু বলে স্বীকার করতে পারেন না। দুনিয়ায় এই যে কোটি কোটি মানুষ ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে, যাদের মধ্যে ভাল-মন্দ সকল প্রকার মানুষই রয়েছে, নির্বিচারে ও নির্বিশেষে এদের সকলকেই আল্লাহর দলে শামিল করে নেয়া সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তাআলা যাদেরকে দুনিয়ায় তাঁর খলীফা বানাতে এবং আখেরাতে তাঁর নৈকট্য দান করতে চান, তাদেরকে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডে বিশেষ পরিস্থিতি ও পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যাচাই করে নিতে চান। যাঁরাই সেই পরীক্ষায় যথাযথভাবে উত্তীর্ণ হবেন, তাঁরাই আল্লাহর দলে গণ্য হতে পারবেন, আর যারা তা পারবে না তারা নিজেরাই তা

থেকে দূরে সরে যাবে এবং তারা পরিষ্কাররূপে জানতে পারবে যে, তারা আল্লাহর দলে শামিল হবার যোগ্যতা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়নি।

মানুষকে পরীক্ষা করার সেই কষ্টি পাথরটি কি ? আল্লাহ নিজে যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তাই তিনি সর্বপ্রথম মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞানকেই পরীক্ষা করতে চান। মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা কিছু আছে কিনা, না নিরেট নির্বোধ তা তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে থাকেন। কারণ নির্বোধ লোকেরা কখনও বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের বন্ধু হতে পারে না। (আর মূর্খ ও নির্বোধ লোকেরা তো কিছুতেই এবং কখনই আল্লাহর বন্ধু হতে পারে না।) আল্লাহর অস্তিত্বের নিশানা দেখে যে বুঝতে পারে যে, তিনিই আমার মালিক ও সৃষ্টিকর্তা, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ কোন পরোয়ারদিগার, দোয়া শ্রবণকারী এবং সাহায্যকারী আর কেউ নেই। আল্লাহর কালাম দেখে যে তাকে আল্লাহর কালাম বলেই চিনতে পারে এবং তা অন্য কারো কালাম হতে পারে না বলে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করে, সত্য নবী এবং মিথ্যা নবীদের জীবন চরিত, কাজ-কর্ম ও শিক্ষা-দীক্ষার মৌলিক পার্থক্য সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে এবং নবী হওয়ার দাবীদারগণের মধ্যে প্রকৃত নবীকে আল্লাহর প্রেরিত নবী এবং সত্যের পথ নির্দেশকারী নবী বলে চিনতে পারে, আর মিথ্যা নবীকে দাজ্জাল ও প্রতারক বলে চিহ্নিত করতে পারে সেই ব্যক্তিরই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাকে লক্ষ কোটি লোকের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে নিজের দলের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে গণ্য করেন। অবশিষ্ট যারা প্রথম পরীক্ষায় ব্যর্থ হয় তাদেরকে তিনি পরিত্যাগ করেন।

এই প্রথম পরীক্ষায় যে সকল প্রার্থী উত্তীর্ণ হয় তাদেরকে অতপর দ্বিতীয় পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। দ্বিতীয়বারে মানুষের বুদ্ধির সাথে সাথে তার নৈতিক চরিত্র বলেরও যাচাই করা হয়। সত্য এবং পুণ্য কাজের পরিচয় লাভ করে তা গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা এবং অন্যায় ও পাপ কাজের পরিচয় লাভ করার পর তা পরিত্যাগ করার যোগ্যতা ও শক্তি তার আছে কিনা তা জেনে নেয়া এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য। যাচাই করে দেখা হয় যে, এই ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির দাস, বাপ-দাদার অন্ধ অনুসারী এবং পারিবারিক প্রথা ও দুনিয়ার সাধারণ রীতিনীতির গোলাম তো নয় ? একটি কাজকে আল্লাহর বিধানের বিপরীত জেনে এবং তাকে খারাপ মনে করেও তার মধ্যে লিপ্ত থাকার মত দুর্বলতা তার মধ্যে নেই তো ? পক্ষান্তরে একটি জিনিসকে আল্লাহর মনোনীত এবং সত্য জেনে তা গ্রহণ করার মনোবল আছে কিনা তাও যাচাই করা হয়। এ পরীক্ষায়ও যারা বিফল হয় তাদেরকে আল্লাহর দলভুক্ত করা হয়

না। আল্লাহর দলভুক্ত কেবল তারাই হতে পারে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق لَاانْفِصَامَ لَهَا ط

অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের বিরোধী বিধান ও পথ এবং বিধানদাতাকে যারা সাহসের সাথে পরিত্যাগ করে—সেই ব্যাপারে কারো পরোয়া করে না এবং নির্ভীকভাবে কেবল আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারেই জীবনযাপন করতে প্রস্তুত হয়—তাতে কেউ খুশী হোক আর নারায হোক সেই দিকে মাত্রই ভ্রুক্ষেপ করে না, তারা একটি মযবুত জিঞ্জির দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে নিয়েছে যা কখনো ছিড়বে না।

এ পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয় তাদেরকে তৃতীয় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। একবার পরীক্ষা হয় আল্লাহর অনুসরণ ও আনুগত্য স্বীকারের প্রবণতার। এই সময়ে হুকুম দেয়া হয় যে, আমার তরফ থেকে যখনই কোন নির্দেশ দেয়া হবে, তখনই তোমরা নিদ্রা ত্যাগ করে আমার সামনে হাজির হবে ; কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে, নিজের স্বার্থ ও মনঃপুত কাজ ছেড়ে, আনন্দ আর খুশী ত্যাগ করে আসবে এবং নির্দিষ্ট কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করবে, গ্রীষ্ম হোক, বর্ষা হোক, শীত হোক—যাই হোক না কেন, সকল সময়েই ডাক শোনা মাত্র হাজির হবে—সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে আমার দরবারে উপস্থিত হবে এবং কর্তব্য পালন করবে। আবার যখন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার না করতে বলবো এবং নফসের খাহেশ পূরণ করতে নিষেধ করবো, তখন তোমাকে এই হুকুম পুরোপুরি পালন করতে হবে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় যত দুঃসহ কষ্টই হোক না কেন ; আর যত সুমিষ্ট পানীয়, সুস্বাদু খাদ্য তোমার সামনে স্তূপীকৃত হোক না কেন। এই পরীক্ষায় যারা অনুত্তীর্ণ হয় তাদেরকেও বলে দেয়া হয়, 'তোমাদের দ্বারা আমার কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। আর তৃতীয় পরীক্ষায়ও যারা উত্তীর্ণ হয় কেবল তাদেরকেই নির্বাচন করা হয়।' কারণ এদের সম্পর্কেই এই আশা করা যেতে পারে যে, আল্লাহর তরফ থেকে যে বিধান নাযিল করা হবে তাই তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে স্বার্থ এবং লাভ, সুখ ও দুঃখ-কষ্ট সকল অবস্থায়ই যথাযথরূপে পালন করতে পারবে।

অতপর চতুর্থ পরীক্ষা নেয়া হয় মানুষের ধন-সম্পদ কুরবানী করার। তৃতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ লোকগণও আল্লাহর 'কর্মচারী' পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য প্রমাণিত হতে পারেনি। কেননা তাদের দিল ছোট, সংকীর্ণ, হীন

সাহস ও বীর্যহীন এবং নীচ কিনা—মুখে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার বড় বড় দাবী করার লোক তো অসংখ্য পাওয়া যায়, কিন্তু বন্ধুর খাতিরে পকেটের পয়সা খরচ করতে পস্তুত কিনা, তার পরীক্ষা নেয়া এখনও বাকী রয়েছে। তারা তো সেই সকল লোকদের মত নয় যারা মুখে মুখে 'মা' 'মা' করে ভক্তিতে গদগদ এবং সেই মায়ের জন্য দাংগা করতেও পিছ পা নয়, কিন্তু সেই 'মা' যখন জন্তুর বেশে শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন লাঠি নিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়—পিটিয়ে ছাল উঠিয়ে দেয়। এমন স্বার্থপর, অর্থপূজারী সংকীর্ণমনা ব্যক্তিকে কোন সাধারণ বুদ্ধির মানুষও নিজের বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পারে না। আর বড় উদার আত্মা বিশিষ্ট লোকও এমন ব্যক্তিকে নিজের কাছে কোনরূপ মর্যাদা দিতেও প্রস্তুত হবে না। তাহলে যে মহান আল্লাহর ধনভাণ্ডার প্রতিটি মুহূর্ত সর্বসাধারণ সৃষ্টির জন্য উন্মুক্ত এবং বিপুলভাবে তা দান করা হয় তিনি এমন ব্যক্তিকে কেমন করে বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পারেন, যে আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ আল্লাহরই পথে খরচ করতে প্রস্তুত নয় ? আর যে আল্লাহ এতবড় বুদ্ধিমান এবং বিজ্ঞ তিনি কেমন করে এমন ব্যক্তিকে নিজের দলভুক্ত করতে পারেন, যার বন্ধুত্ব ও ভালবাসা মৌখিক জমা-খরচ মাত্র এবং যার ওপর কোন কাজেই বিন্দুমাত্র ভরসা করা যায় না ? কাজেই এ চতুর্থ পরীক্ষায় যারা ব্যর্থ হয় তাদেরকেও পরিষ্কার বলে দেয়া হয় যে, আল্লাহর দলে তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরাও অকর্মণ্য—আল্লাহর খলীফার ওপর যে বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তা পালন করার যোগ্যতা তোমাদের নেই। এ দলে কেবল তাদেরকেই শামিল করা যেতে পারে যারা আল্লাহর ভালবাসায় জীবন-প্রাণ ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, বংশ-পরিবার, দেশ—সবকিছুর ভালবাসাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে কুরবান করতে পারে ঃ

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ط ـ(ال عمران : ٩٢)

"তোমরা নিজ নিজ প্রিয় জিনিসগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয় না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পুণ্য ও মহত্ত্বের উচ্চতম মর্যাদা লাভ করতে পারবে না।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২)

আল্লাহর এই দলে সংকীর্ণমনা লোকদের কোনই স্থান নেই, কেবল উদার উন্নত হৃদয়বান ব্যক্তিরাই এই দলে শামিল হতে পারে।

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ০ (التغابن : ١٦)

"মনের সংকীর্ণতা এবং কৃপণতাকে যারা অতিক্রম করতে পেরেছে কেবল তারাই সর্বাঙ্গীন কল্যাণ লাভ করতে পারে।"–(সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৬)

আল্লাহর দলে কেবল এমন লোকদের ভর্তি করা যেতে পারে, যারা কেউ তাদের শত্রুতা করলেও, তাদেরকে দুঃখ দিলেও, তাদের ক্ষতিসাধন করলেও এবং তাদের কলিজাকে টুকরো টুকরো করলেও — কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তারা পেটের খাদ্য এবং পরণের কাপড় দিতে অস্বীকার করবে না এবং বিপদের সময় তার সাহায্য করতেও কুণ্ঠিত হবে না ঃ

وَلاَ يَأْتَلِ اُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّوْتُوْٓا اُوْلِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ص وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ط اَلاَ تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ (النور : ٢٢)

"তোমাদের মধ্যে যারা বড় এবং সংগতি সম্পন্ন লোক তারা যেন নিজেদের প্রিয়জনদের, নিকটাত্মীয়দের, গরীব-দুঃখীদের এবং আল্লাহর পথে হিজরত -কারীদের (কোন অপরাধের জন্য বিরক্ত হয়ে তাদেরকে) সাহায্য দান বন্ধ না করে। বরং তাদেরকে মাফ করে দেয়াই বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দেন তা কি তোমরা চাও না ? অথচ আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড় ক্ষমাশীল এবং দয়াবান।"[১]-(সূরা আন নূর ঃ ২২)

এখানে এমন মহৎ লোকদের প্রয়োজন, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ○ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لاَنُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلاَ شُكُوْرًا ○ (الدهر : ٨-٩)

"খালেছভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তারা ইয়াতিম, মিসকীন এবং বন্দীদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয় এবং তারা বলে যে, আমরা তোমাদেরকে কেবল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই খাওয়াচ্ছি, তোমাদের কাছে আমরা কোনরূপ বিনিময় বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ চাই না।"-(সূরা দাহর ঃ ৮-৯)

এই দলে এমন লোকদের আবশ্যক, যারা আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ থেকে বেছে বেছে ভাল ভাল জিনিস আল্লাহর জন্যই খরচ করে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ص وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ - (البقرة : ٢٦٧)

---

১. হযরত আবু বকর (রা)-এর জনৈক প্রিয় লোক যখন তাঁর কন্যা হযরত আয়েশা (রা)-এর চরিত্র সম্পর্কে অপবাদ দেয়ার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছিল এবং হযরত আবু বকর (রা) তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তার আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছিলেন তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়। আয়াতটি নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তিনি কম্পিত ও ভীত হয়ে বললেন ঃ 'আমি আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাই' এবং তখনই তিনি সেই লোকটির আর্থিক সাহায্য পুনরায় জারি করলেন।

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নিজেরা যে ধন-সম্পত্তি উপার্জন করেছ এবং আমি তোমাদের জন্য যমীন থেকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ভাল ভাল সামগ্রী (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর। খারাপ দ্রব্য থেকে কিছু সেই পথে খরচ করো না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৭)

এখানে এমন বড় আত্মার লোকদের আবশ্যক, যারা নিজেদের অভাব-অনটন, দারিদ্র ও রিক্ততার দুঃসহ অবস্থায় নিজেদের অপরিহার্য প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর দ্বীনের খেদমত এবং নেক বান্দাদের সাহায্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয় না ঃ

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ لا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ ـ

"তোমাদের রবের ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবী সমান বিশাল বেহেশতের দিকে অগ্রসর হও, যা সেসব মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, যারা আর্থিক দুর্গতি ও সচ্ছলতা উভয় অবস্থায়ই আল্লাহর জন্য খরচ করে।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৩-১৩৪)

আল্লাহর দলের লোকদের ঈমান এতটুকু মযবুত হওয়ার দরকার যে, আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করাকে তারা নিষ্ফল মনে করবে না। বরং তারা একান্তভাবে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহর পথে যাকিছু খরচ করা যায়, দুনিয়া এবং আখেরাতে তিনি তার উত্তম ফল দান করবেন। এজন্য তারা কেবল আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই খরচ করে। তাদের এ দানশীলতার কথা দুনিয়ায় প্রচার হোক বা না হোক কিংবা কেউ তার দানের শুকরিয়া আদায় করুক বা না করুক সেই দিকে কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করে না ঃ

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتُظْلَمُوْنَ ۝ (البقرة : ٢٧٢)

"তোমরা আল্লাহর পথে যাকিছু খরচ করবে তা তোমাদেরই কল্যাণ সাধন করবে—অবশ্য যদি তোমরা সেই খরচের ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া আর কারো সন্তুষ্টি পেতে না চাও। এভাবে তোমরা ভাল কাজে যা কিছু দান করবে তার পূর্ণ ফল তোমরা লাভ করবে। সে দিক দিয়ে তোমাদের প্রতি বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭২)

ধনী হয়ে সুখের মধ্যে ডুবে থেকেও যারা আল্লাহকে ভুলে যায় না, আল্লাহর দলে এ ধরনের ধীর প্রকৃতির লোকদেরই দরকার। তারা বড় বড় প্রাসাদে সুখ ও সম্ভোগের ভিতরে থেকেও আল্লাহকে ভুলে যাবে না ঃ

يَـاَيُّهَـا الَّـذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُلْـهِكُمْ اَمْـوَالُـكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْـرِ اللّـٰهِ ج وَمَنْ يَّـفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓـئِكَ هُـمُ الْـخٰسِرُوْنَ ○ (الـمنفقون : ٩)

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের সম্পদ আর সন্তান যেন তোমাদেরকে কখনও আল্লাহর যিকর থেকে বিরত না রাখে। এসবের জন্য যারা আল্লাহকে ভুলে যাবে তারা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"-(সূরা মুনাফিকুন ঃ ৯)

ওপরে বর্ণিত গুণাবলী আল্লাহ তাআলার দলের লোকদের মধ্যে বর্তমান থাকা অপরিহার্য। এছাড়া কোন ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধুদের মধ্যে গণ্য হতে পারে না। বস্তুত এটা মানুষের শুধু নৈতিক চরিত্রেরই নয়, তার ঈমানেরও বড় কঠিন এবং তিক্ত পরীক্ষা। আল্লাহর পথে খরচ করতে যে ব্যক্তি কুণ্ঠিত হবে, এরূপ খরচকে যে নিজের ওপরে জরিমানা বলে মনে করবে, কৌশল ও শঠতা করে তা থেকে যে 'আত্মরক্ষা' করতে চায়, আর কিছু খরচ করলেও সে জন্য লোকের প্রতি নিজের অনুগ্রহ প্রকাশ করে মনের ঝাল মিটাতে চায় কিংবা নিজের বদান্যতার কথা দুনিয়ায় প্রচার করতে চায়, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি এমন লোকদের আদৌ ঈমান থাকতে পারে না। সে মনে করে, আল্লাহর জন্য সে যা কিছু করেছে, তা একেবারে নিষ্ফল হয়েছে। তার নিজের সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ, নিজের স্বার্থ ও খ্যাতিকেই সে আল্লাহ এবং তাঁর সন্তুষ্টি অপেক্ষাও বেশী প্রিয় বলে মনে করে। তার মতে এ দুনিয়াটাই সবকিছু। টাকা-পয়সা খরচ করলেও এ দুনিয়ায়ই সে জন্য সুনাম ও খ্যাতি লাভ হওয়া আবশ্যক। কারণ তাহলে সে টাকার বিনিময় এখানেই পাওয়া যেতে পারে। নতুবা টাকাও খরচ করলো আর কেউ জানতেও পারলো না যে, অমুক ব্যক্তি অমুক ভাল কাজে এতগুলো টাকা দিয়ে দিয়েছে, তবে তো সবই অর্থহীন হয়ে যায়। কুরআন মজীদে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে যে, এ ধরনের মানুষ আল্লাহর কোন কাজেই আসতে পারে না। সে যদি নিজেকে ঈমানদার বলে প্রচার করে তথাপি সে ঈমানদার তো নয়ই বরং সে প্রকাশ্য মুনাফিক। নিম্নের আয়াতগুলো তার প্রমাণ।

يٰٓاَيُّهَـا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَـدَقٰـتِكُمْ بِالْـمَنِّ وَالْاَذٰى لا كَـالَّـذِىْ يُنْفِقُ مَالَـهٗ رِئَـآءَ النَّـاسِ وَلَا يُـؤْمِنُ بِاللّـٰهِ وَالْـيَوْمِ الْاٰخِرِ ط (البقرة : ٢٦٤)

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের দানকে অন্যের ওপরে নিজের অনুগ্রহ প্রচার করে বা কাউকে কষ্ট দিয়ে তার মত নিষ্ফল করে দিও না, যে ব্যক্তি শুধু অন্যকে দেখাবার জন্য কিংবা সুনাম কিনার জন্য অর্থ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস রাখে না।"

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ (التوبة : ٣٤)

"যারা 'স্বর্ণ' এবং 'রৌপ্য' সঞ্চয় করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাদেরকে কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দাও।"–(সূরা তাওবা ঃ ৩৪)

لاَيَسْتَاذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ۝ اِنَّمَا يَسْتَاذِنُكَ الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِىْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ۝

"হে নবী ! যারা আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে, তারা নিজেদের জান-মালসহ জিহাদে যোগদান করার কর্তব্য থেকে দূরে সরে থাকার জন্য কখনও অনুমতি চাইবে না। আল্লাহ তাআলা প্রকৃত মুত্তাকী বান্দাহগণকে খুব ভাল করেই জানেন। অবশ্য সেসব লোক ওজর আপত্তি করতে পারে, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি যাদের আদৌ বিশ্বাস নেই—যাদের মনের মধ্যে সন্দেহ জমাট বেঁধে রয়েছে এবং নিজেদের সন্দেহের মধ্যে নিমজ্জিত থেকেই ইতস্তত করে।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৪৪-৪৫)

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلاَّ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلاَ يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلاَّ وَهُمْ كُسَالٰى وَلاَ يُنْفِقُوْنَ اِلاَّ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ۝(التوبة : ٥٤)

"আল্লাহর পথে তাদের দান শুধু এ জন্যই কবুল করা যায় না যে, মূলত আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি তাদের ঈমান নেই ; নামাযের জন্য তারা আসে বটে, কিন্তু মনক্ষুণ্ন হয়ে ; আর টাকা-পয়সাও তারা দান করে, কিন্তু বড়ই বিরক্তি সহকারে।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৫৪)

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ط نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ط اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ (التوبة : ٦٧)

"মুনাফিক পুরুষ আর মুনাফিক স্ত্রী সব একই দলের লোক—একে অন্যের সাহায্যকারী। এরা সকলেই মিলে অন্যায়ের আদেশ করে, ন্যায় ও সত্যকে নির্মূল করার চেষ্টা করে। আর আল্লাহর রাস্তায় অর্থ খরচ থেকে হাত গুটিয়ে রাখে। এরা সকলেই আল্লাহকে ভুলে গেছে। তাই আল্লাহ তাদেরকে ভুলে গেছেন। এসব মুনাফিক যে ফাসেক (আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘনকারী) তাতে সন্দেহ নেই।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৬৭)

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا ـ(التوبة : ٩٨)

"এই আরাব (মুনাফিকদের) অনেকেই আল্লাহর রাস্তায় কিছু খরচ করলেও তা করে একান্তভাবে ঠেকে—যেন জরিমানা আদায় করছে।"

هَاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ۗ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاۤءُ ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ ۝(محمد : ٣٨)

"জেনে রাখ, তোমাদের অবস্থা এতদূর খারাপ হয়ে গিয়েছে যে, তোমাদের আল্লাহর রাস্তায় কিছু খরচ করতে বললে তোমরা সেই জন্য মোটেই প্রস্তুত হও না বরং তোমাদের অনেকেই তখন কৃপণতা করতে থাকে। অথচ যে ব্যক্তি এসব কাজে কৃপণতা করে সেই কৃপণতায় তার নিজেরই ক্ষতি হয়। মূলত আল্লাহ একমাত্র ধনশালী আর তোমরা সকলেই দরিদ্র —তাঁরই মুখাপেক্ষী। আল্লাহর রাস্তায় যদি তোমরা আদৌ অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত না হও তবে এ অপরাধের অনিবার্য ফলস্বরূপ আল্লাহ তাআলা তোমাদের স্থানে এক ভিন্ন জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তারা নিশ্চয়ই তোমাদের মত (কৃপণ) হবে না।"–(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩৮)

মোটকথা, যাকাত ইসলামের একটি স্তম্ভ এবং এটাই তার মূল কথা। একে প্রচলিত সরকারী ট্যাক্সের মত মনে করা মারাত্মক ভুল। কারণ আসলে এটা ইসলামের প্রাণ, ইসলামের জীবনী শক্তি। যাকাত ফরয করার মূলে ঈমানের পরীক্ষা করাই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য। ক্রমাগত পরীক্ষা দিয়ে এক একজন মানুষ যেমন উন্নতি লাভ করতে থাকে এবং সর্বশেষ পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রী লাভ করে, অনুরূপভাবে আল্লাহও মানুষের ঈমান যাচাই করার জন্য কতগুলো পরীক্ষা নির্দিষ্ট করে দেন ; প্রত্যেক মানুষকেই এ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। একজন মানুষ যখন এরূপ পরীক্ষা দিয়ে চতুর্থ পরীক্ষা—অর্থাৎ অর্থদানের পরীক্ষায়ও সাফল্য লাভ করে, তখনই সে খাঁটি মুসলমান হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এটা নিশ্চয়ই সর্বশেষ পরীক্ষা নয়।

এরপরে আসে প্রাণের পরীক্ষা। সেই সম্পর্কেও আমি পরে আলোচনা করবো। কিন্তু ইসলামের সীমার মধ্যে আসার জন্য—অন্য কথায় আল্লাহর দলভুক্ত হবার যে কয়টি 'প্রবেশিকা পরীক্ষা' নির্দিষ্ট করা হচ্ছে, তার মধ্যে যাকাত হচ্ছে সর্বশেষ পরীক্ষা। বর্তমানে অনেকেই বলে বেড়াচ্ছে যে, টাকা-পয়সা খরচ বা দান করার অনেক ওয়াযই মুসলমানকে শুনান হয়েছে, বর্তমানে এই অভাব ও দারিদ্রের কঠিন মুহূর্তে তাদেরকে খানিকটা উপার্জন ও সঞ্চয় করার ওয়ায শুনানো উচিত ; কিন্তু তারা বুঝতে পারে না যে, যে জিনিসটির প্রতি তারা নাক ছিটকাচ্ছে তা হচ্ছে ইসলামের এই প্রাণ বস্তুটি। আর এ জিনিসটির অভাবই মুসলমানকে নৈতিক ও আর্থিক অধঃপতনের চরম সীমায় নিয়ে .পৌছিয়েছে। এই প্রাণ বস্তুটি তাদেরকে অধঃপতিত করেনি। তাদের সর্বব্যাপী পতন হয়েছে শুধু এজন্য যে, এই প্রাণ বস্তুটিই তাদের দেহ থেকে নির্গত হয়ে গেছে।

সমাজ জীবনে যাকাতের স্থান

কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে যাকাত-সদকা ইত্যাদির কথা বুঝার জন্য 'ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ' (আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা) বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন স্থানে আবার বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যা-ই খরচ করবে তা আল্লাহর কাছে 'করযে হাসানা' (ধার) হিসেবে মওজুদ থাকবে। এক কথায় এটা দ্বারা ঠিক আল্লাহকেই ধার দেয়া হয়, আর আল্লাহ মানুষের কাছে ঋণী হন। অনেক স্থানে একথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহর রাস্তায় তোমরা যা কিছু দেবে তার বিনিময় দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহর ; তিনি তোমাদের শুধু ততটুকু পরিমাণই ফিরিয়ে দেবেন না ; তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ দান করবেন।

কুরআন মজীদের উল্লেখিত কথাগুলো বাস্তবিকভাবেই প্রণিধানযোগ্য। আকাশ ও পৃথিবীর মালিক কি কখনও মুখাপেক্ষী হতে পারে ? মানুষের কাছ থেকে সেই মহান পবিত্র 'টাকা' ধার নেয়ার কি প্রয়োজন থাকতে পারে ? সেই রাজাধিরাজ সীমাসংখ্যাহীন ধন ভাণ্ডারের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ কি মানুষের কাছে নিজের প্রয়োজনে ধার চান ? কখনও নয়, তা হতেই পারে না। তাঁর দানেই দুনিয়ার জীব-জন্তু বস্তুনিচয় জীবন ধারণ করছে, তাঁর দেয়া জীবিকা দ্বারাই মানুষ বাঁচে। দুনিয়ার প্রত্যেক ধনী ও গরীবের কাছে যা কিছু আছে, তা সব তাঁরই দান। একজন অসহায় গরীব থেকে শুরু করে কোটিপতি পর্যন্ত প্রত্যেকেই তাঁর অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী। কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি মানুষের কাছে ধার চাবেন এবং নিজের জন্য মানুষের সামনে হাত প্রসারিত করবেন—তার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। মূলত মানুষেরই কল্যাণের জন্য, মানুষের কাজে ব্যয় করার জন্যই তিনি আদেশ করেন ; আর সে ব্যয়টাকেই তিনি তাঁর পথে খরচ কিংবা 'ধার' বলে গণ্য করেন। বস্তুত এটাও তাঁর আর এক কল্যাণ কামনার বাস্তব প্রকাশ—এটাও তাঁর এক প্রকার বড় অনুগ্রহ বিশেষ। তিনি বলেন, তোমরা তোমাদেরই সমাজের অভাবগ্রস্ত গরীব এবং মিসকিনদেরকে অর্থ দান কর, এর বিনিময় দেয়া বা আদায় করার দায়িত্ব আমার। কারণ তোমরা যেসব লোককে অর্থ সাহায্য কর, এর বিনিময় তারা কোথা থেকে দেবে ? এর প্রতিদান আমিই দান করবো। তোমরা ইয়াতীম, বিধবা, অসহায়, বিপদগ্রস্ত এবং নিসম্বল পথিক ভাইদেরকে যা কিছু দান করবে তার হিসেব আমার নামে লিখে রেখো এর তাগাদা তাদের কাছে নয় বরং আমার কাছে করো। আমি তা পরিশোধ করবো। তোমরা তোমাদের গরীব ভাইদের ধার দাও কিন্তু তাদের কাছ থেকে সুদ গ্রহণ করো না, এর তাগাদা

করে তাদেরকে অপ্রস্তুত ও বিব্রত করো না। তার ঋণ শোধ করতে না পারলে সে জন্য তাদেরকে 'সিভিল জেলে' পাঠিয়ো না, তাদের কাপড়-চোপড় এবং ঘরের আসবাবপত্র ক্রোক করো না, তাদের অসহায় সন্তানদেরকে ঘর থেকে বের করে আশ্রয়হীন করে দিও না। কারণ তোমাদের ঋণ আদায়ের দায়িত্ব তাদের নয়—আমার, তারা যদি মূল টাকা আদায় করে দেয়, তবে তাদের পক্ষ থেকে 'সুদ' আমি আদায় করবো আর তারা যদি আসল টাকাও না দিতে পারে, তাহলে আসল ও সুদ সবই আমি শোধ করবো। এভাবে নিজেদের সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে মানুষের উপকারার্থে তোমরা যা খরচ করবে, তার লাভ যদিও তোমারাই পাবে ; কিন্তু সেই অনুগ্রহ আমার ওপর করা হবে, আমিই তার লাভ সহ পূর্ণ হিসেব করে তোমাদেরকে ফেরত দেব।

একমাত্র দয়াময়, রাজাধিরাজ আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের যথার্থতা এখানেই। মানব জাতির কাছে যা কিছু আছে, তা সব তাঁরই দান—অন্য কোথাও থেকে বা অন্য কারো কাছ থেকে তোমরা তা পাও না। তাঁরই ভাণ্ডার থেকে তোমরা নিয়ে থাক, কিন্তু যা কিছু দাও, তাঁকে নয়—তোমাদেরই আত্মীয়, এগানা, ভাই, বন্ধু ও নিজ জাতির লোকদেরকেই দিয়ে থাক। কিংবা নিজেদের সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় কর, যার ফলও শেষ পর্যন্ত তোমরাই পেয়ে থাক। কিন্তু সেই মহান দাতার অসীম বদান্যতা লক্ষ্য কর, তিনি এই সকল দান সম্পর্কে বলেন যে, এটা তাঁকে ঋণ দেয়া হয়েছে, তাঁরই পথে খরচ করা হয়েছে, তাঁকে দেয়া হয়েছে—এর ফল আমিই তোমাদেরকে দেব। বস্তুত বদান্যতার এই অতুলনীয় পরাকাষ্ঠা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই পক্ষে শোভা পায়, কোন মানুষ এর ধারণাও করতে পারে না।

ভাবার বিষয় এই যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে দানশীলতা ও বদান্যতার উৎসাহ সঞ্চার করার জন্য এ পন্থা অবলম্বন করলেন কেন ? এই বিষয়ে যতই চিন্তা করা যায়, ইসলামের উন্নত শিক্ষার অন্তর্নিহিত পবিত্র ভাবধারা ততই সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় ; মন উদাত্ত কণ্ঠে বলে ওঠে —এই অতুলনীয় শিক্ষা আল্লাহ ছাড়া আর কারো হতে পারে না।

মানুষ যে স্বভাবতই কিছুটা যালেম এবং জাহেল হয়ে জন্মগ্রহণ করে, তা সকলেরই জানা কথা। তার দৃষ্টি অত্যন্ত সংকীর্ণ—বেশী দূর পর্যন্ত তা পৌঁছায় না। তাদের দিল খুবই ক্ষুদ্র, তার মনে বড় এবং উচ্চ ধারণার খুব কমই সংকুলান হয়ে থাকে। মানুষ ভয়ানক স্বার্থপর, কিন্তু সেই স্বার্থপরতা সম্পর্কেও কোন ব্যাপক ও বিরাট ধারণা তার মন-মস্তিষ্কে স্থান পায় না। মানুষ অবিলম্বেই সবকিছু পেতে চায় ঃ خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ প্রতিটি কাজের ফল এবং

পরিণাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লাভ করতে সে প্রয়াসী। যে ফল তার সামনে অবিলম্বে আসে এবং নিজের চোখ দ্বারা দেখতে পায়, তাই তার কাছে একমাত্র ফল ও পরিণাম। সুদূরপ্রসারী ফলাফল পর্যন্ত তার দৃষ্টি মোটেই পৌঁছায় না। উপরন্তু যে ফল খুব বড় আকারে সামনে আসে এবং যে ফলের ক্রিয়া বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছায়, মানুষ তা অনুভব পর্যন্ত করতে পারে না। বস্তুত এটা মানুষের এক স্বাভাবিক দুর্বলতা বিশেষ। এ দুর্বলতার কারণে মানুষ নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। আর তাও আবার যেসব স্বার্থ ছোট আকারে এবং খুব দ্রুত লাভ করা যায়, তারই প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। সে বলে আমি যা উপার্জন করেছি বা আমার বাপ-দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যা পেয়েছি তা একান্তভাবে আমার, অন্য কারো কোন অংশ বা অধিকার তাতে নেই। কাজেই আমি কেবল নিজের প্রয়োজনে নিজের ইচ্ছায় এবং নিজের আরাম আয়েশের কাজে খরচ করবো। কিংবা যেসব কাজের ফল অবিলম্বে আমার হাতে ফিরে পাব কেবল সেই কাজে নিয়োগ করবো। আমি যদি টাকা খরচ করি তবে এর বিনিময় আমার কাছে হয় বেশী টাকা আসতে হবে— নয়ত আমার বেশী করে আরামের ব্যবস্থা কোথা থেকে হবে। কিছু না হলেও অন্তত আমার খ্যাতি বা আমার মান-সম্মান বৃদ্ধি পাওয়া কিংবা কোন 'খেতাব' লাভ করা একান্তই আবশ্যক। মানুষ যেন আমার সামনে মাথা নত করে, লোকের মুখে যেন আমার নামের চর্চা হয়। এসব জিনিসের কোনটাই যদি আমি না পাই, তবে আমি টাকা খরচ করবো কেন ? আমার নিকটবর্তী কোন গরীব-দুঃখী বা ইয়াতীম মিসকিন যদি না খেয়ে মরে যায়, তবুও আমি কেন তাঁকে খাদ্য যোগাড় করে দেব ? তার প্রতি তার পিতার কর্তব্য ছিল নিজের সন্তানের জন্য কিছু রেখে যাওয়া। আমার পাড়ার কোন বিধবার যদি দুঃখে দিন কাটে তবে আমার তাতে কি আসে যায় ? তার জন্য তার স্বামীর চিন্তা করা উচিত ছিল। কোন প্রবাসী যদি সম্বলহীন হয়ে পড়ে, তবে তার সাথে আমার কি সম্পর্ক থাকতে পারে ? সে পথের ব্যবস্থা না করেই ঘর থেকে বের হয়ে বড় নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছে। অন্য কোন ব্যক্তি যদি দূরবস্থায় পড়ে তবে তার প্রতি আমার কী করণীয় থাকতে পারে ? আমার ন্যায় তাকেও আল্লাহ তাআলা হাত-পা দিয়েছেন। নিজের প্রয়োজন পরিমাণ উপার্জন করা তার নিজেরই কর্তব্য। আমি তার সাহায্য করবো কেন ? আর একান্তই আমি তাকে যদি কিছু টাকা-পয়সা দেই তবে ঋণ হিসেবেই দেব এবং আসল টাকার সাথে এর সুদও নিশ্চয়ই আদায় করবো। কারণ, বিনা পরিশ্রমে তো টাকা উপার্জিত হয়নি। সেই টাকা আমার কাছে থাকলে কত কাজেই না লাগাতে পারতাম —দালান-কোঠা তৈরি করতে পারতাম, মোটর গাড়ি কিনতে পারতাম কিংবা অন্য কোন লাভজনক কাজে খাটাতে পারতাম। সে যদি আমার টাকা দিয়ে

কোন উপকার লাভ করতে পারে, তবে আমি আমার টাকা দ্বারা কিছু না কিছু লাভ করতে পারব না কেন ? তা থেকে আমার অংশই বা আমি আদায় করবো না কেন ?

এরূপ স্বার্থপর মনোবৃত্তির কারণে প্রথমত মানুষ ধনপিশাচে পরিণত হয়। সে তা খরচ করলে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই করবে। যে কাজে কোন স্বার্থ দেখতে পাবে না, সেখানে এক পয়সাও খরচ করবে না। কোন গরীবের সাহায্য যদি সে করেও, তবে মূলত তা দ্বারা সেই গরীবের কোন সাহায্য হবে না, বরং তাকে আরো বেশী করে শোষণ করবে এবং তাকে যা দেবে তদপেক্ষা অনেক বেশী আদায় করবে। কোন মিসকীনকে কিছু দান করলে সে এই ব্যক্তির প্রতি নিজের অনুগ্রহ দেখিয়ে তাকে কাতর করে ছাড়বে এবং তাকে এতদূর অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবে যে, তার মধ্যে আত্মসম্মানবোধটুকুও অবশিষ্ট থাকতে দেবে না। কোন জাতীয় কাজে অংশ গ্রহণ করলে এ ধরনের মানুষ সর্বপ্রথম নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দেবে। যেসব কাজে নিজের স্বার্থ লাভের সম্ভাবনা থাকবে না, সেই কাজে একটি পয়সাও দিতে প্রস্তুত হবে না।

এ ধরনের মনোবৃত্তির পরিণাম কত ভয়াবহ তা ভেবে দেখেছেন কি ? এর ফলে গোটা সমাজ জীবনই যে চুরমার হয়ে যাবে তাই নয়, বরং শেষ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির অবস্থাও অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে পড়বে, সন্দেহ নেই। কিন্তু এদের দৃষ্টি অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং তারা অতীব মূর্খ বলে এটা থেকেও তাদের নিজেদেরই উপকারিতার আশা করে থাকে। এ ধরনের হীন মনোবৃত্তি যখনই মানুষের মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন সমাজের খুব অল্প সংখ্যক লোকের হাতে সমগ্র জাতীয় সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে এবং অসংখ্য লোক একেবারে নিরুপায় ও উপার্জনহীন হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। অর্থশালী লোক অর্থের বলে আরও বেশী পরিমাণ অর্থ শোষণ করে, গরীব লোকদের জীবন ক্রমশ আরও বেশী খারাপ হয়ে যায়। যে সমাজে দারিদ্র একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় সেই সমাজ নানাবিধ জটিল সমস্যায় সর্বব্যাপী ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়ায়। সামাজিক স্বাস্থ্য-ধৈর্য চূর্ণ হয়, নানা প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি সমাজ দেহে আক্রমণ করে, ফলে তারা কাজের ও উৎপাদনের শক্তি হারিয়ে ফেলে। তাদের মধ্যে মূর্খতা ও অশিক্ষা বৃদ্ধি পায়, নৈতিক স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। তারা নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য অপরাধ প্রবণ হতে বাধ্য হয় এবং শেষ পর্যন্ত লুট-তরাজ করতেও পশ্চাৎ পদ হয় না। সমাজে এক সর্বব্যাপী বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়, ধনী লোক গরীবদের হাতে নিহত হতে শুরু করে তাদের ঘর-বাড়ী লুণ্ঠিত হয়, অগ্নিদগ্ধ হয় এবং তারা চিরতরে ধ্বংস হতে বাধ্য হয়।

সমাজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণ তার সামাজিক বৃহত্তর কল্যাণের সাথে ওতপ্রোত জড়িত। একজনের কাছে যে অর্থ আছে তা যদি অন্য এক ভাইয়ের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হয় তবে এ অর্থই আবর্তিত হয়ে অভাবিতপূর্ব কল্যাণ নিয়ে পুনরায় তার হাতেই ফিরে আসবে। পক্ষান্তরে নিতান্ত সংকীর্ণ দৃষ্টির বশবর্তী হয়ে যদি সে তা নিজের কাছেই সঞ্চয় করে রাখে, কিংবা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থজনিত কাজে ব্যয় করে, তবে ফলত সে অর্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি ইয়াতীম শিশুকে আপনি যদি লালন-পালন করে এবং উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে উপার্জনক্ষম করে দেন, তবে তাতে সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। আপনিও তা থেকে অংশ লাভ করতে পারবেন। কারণ, আপনিও সেই সমাজেরই একজন লোক। হতে পারে সেই ইয়াতীমের বিশেষ যোগ্যতার ফলে আপনি যে অর্থ লাভ করেছেন তা কোন হিসেবের সাহায্যে হয়ত আপনি আদৌ জানতে পারেননি। কিন্তু প্রথমেই তার লালন-পালন করতে এবং তাকে শিক্ষা-দীক্ষা দিতে আপনি যদি অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, আমি তার সাহায্য করবো কেন, তার পিতারই কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে যাওয়া উচিত ছিল, তবে তো সে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবে, ছন্নছাড়া হয়ে নিরুদ্দেশে হাতড়িয়ে মরবে, অকর্মণ্য হয়ে যাবে এবং সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধি করার মত কোন যোগ্যতাই সে লাভ করতে পারবে না। বরং সে অপরাধ প্রবণ হয়ে একদা স্বয়ং আপনার ঘরেই সিঁদ কাটতে প্রস্তুত হবে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আপনি সমাজেরই এক ব্যক্তিকে অকর্মণ্য ও অপরাধ প্রবণ বানিয়ে কেবল তারই নয়—আপনার নিজেরও ক্ষতি সাধন করবেন। এই একটি মাত্র উদাহরণ সামনে রেখে দৃষ্টি প্রসারিত করলে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাবে যে, নিস্বার্থভাবে যে ব্যক্তি সামাজিক বৃহত্তর কল্যাণের জন্য অর্থ খরচ করে, বাহ্য দৃষ্টিতে তা তার নিজ পকেট থেকে নির্গত হয় বটে ; কিন্তু বাইরে এসে তাই বৃদ্ধি পেয়ে স্ফীত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাই অসংখ্য রূপ উপকার ও স্বার্থকতা নিয়ে আবার তার পকেটেই ফিরে যায়। আর যে ব্যক্তি স্বার্থপরতা ও দৃষ্টি সংকীর্ণতার দরুন টাকা-পয়সা কেবল নিজের হাতেই জমা রাখে—সামাজিক কল্যাণের কাজে মোটেই খরচ করে না, বাহ্য দৃষ্টিতে তার অর্থ তার নিজের বাক্সে থেকে যায় বা সুদ খেয়ে তাকে আরও স্ফীত করে তোলে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিজের নির্বুদ্ধিতার দরুনই নিজের সম্পদ নষ্ট করে—নিজেরই ধ্বংসের ব্যবস্থা করে।

আল্লাহ তাআলা এ তত্ত্ব কথাই বলেছেন নিম্নলিখিত আয়াতে ঃ

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ط -(البقرة : ٢٧٦)

"আল্লাহ সুদ নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং দানকে ক্রমবৃদ্ধি প্রাপ্ত করেন।"

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ج وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ - (الروم : ٣٩)

"মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি করবে বলে তোমরা যে সুদ দাও, মূলত আল্লাহর কাছে তাতে সম্পদ মোটেই বৃদ্ধি পায় না কিন্তু তোমরা যে যাকাত আদায় কর—একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভ করার উদ্দেশ্যে তা অবশ্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।"-(সূরা আর রূম ঃ ৩৯)

কিন্তু এ গভীর তত্ত্ব কথা বুঝতে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে মানুষের দৃষ্টি সংকীর্ণতা এবং চরম মূর্খতা বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা ইন্দ্রিয়ের দাস। যে টাকা তাদের পকেটে আছে তা দিয়ে তারা তা অনুভব করতে পারে এবং বুঝতে পারে যে, তা নিশ্চয়ই আছে। তাদের হিসেবের খাতায় যে পরিমাণ টাকা বেড়ে চলেছে তার ক্রম বৃদ্ধি সম্পর্কেও তারা নিসন্দেহ ; কিন্তু যে টাকা তাদের কাছ থেকে চলে যায় ; তা যে বাড়ছে এবং তাদের হাতে যে ফিরে আসতে পারে ; সে কথা মোটেই বুঝতে ও দেখতে পায় না। তারা শুধু বুঝে এত টাকা আমার হাত থেকে চলে গিয়েছে এবং তা চিরকালের জন্যই গেছে।

মূর্খতার এ বন্ধনকে মানুষ নিজের বুদ্ধি বা চেষ্টার দ্বারা অদ্যাবধি খুলতে পারেনি। সারা দুনিয়ার অবস্থাই এরূপ। একদিকে পুঁজিবাদীদের দুনিয়া—সকল কাজই সেখানে সুদ প্রথার ওপর চলছে এবং ধন-সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও সেই দেশে দুঃখ দারিদ্র আর অভাব অনটন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে এদের বিরোধী আর একটি দল ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠছে। তাদের মনে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। এরা পুঁজিবাদীদের ধন-ভাণ্ডার লুট তো নেবেই সেই সাথে মানুষের তাহযীব-তামাদ্দুনের গোটা ইমারতকেও ধূলিসাৎ করে দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠেছে।

মানুষ এ সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। এর সুষ্ঠু সমাধান করেছে মানুষের স্রষ্টা—মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ তাআলা। তিনি এসব মানুষের অন্যান্য যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানসহ যে কিতাব নাযিল করেছেন, তার নাম কুরআন মজীদ। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে মানুষকে আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনতে হবে। মানুষ যদি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে এবং সন্দেহাতীতরূপে জেনে নেয় যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমগ্র ধন-ভাণ্ডারের প্রকৃত মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা ; আর মানুষের সকল কাজের ব্যবস্থাপনা একান্তভাবে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, তার কাছে প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুর হিসেব বর্তমান আছে ; মানুষের ভাল বা মন্দ কাজের

পুরস্কার বা শাস্তি আখেরাতে ঠিক তদনুযায়ী হবে। তাহলে নিজের স্থূলদৃষ্টির ওপর নির্ভর না করে আল্লাহর ওপর ভরসা করে নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহর বিধান অনুসারে ব্যয়-ব্যবহার করা এবং লাভ-ক্ষতি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়া মানুষের পক্ষে খুবই সহজ হয়ে পড়ে। এরূপ ঈমান নিয়ে সে যা কিছু খরচ করবে তা একান্তভাবে আল্লাহর জন্যই খরচ করা হবে। তার হিসেবও আল্লাহর দফতরে যথাযথভাবে লিখিত হবে। তার এই খরচের খবর দুনিয়ার কোন মানুষ জানতে না পারলেও আল্লাহ তাআলা সেই সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত থাকেন। আর দুনিয়ার মানুষ তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করলেও আল্লাহ্ তার অনুগ্রহের কথা নিশ্চয়ই জানবেন এবং স্বীকার করবেন। উপরন্তু আল্লাহ্ নিজেই যখন তার প্রতিদান দেয়ার ওয়াদা করেছেন তখন পরকালেই হোক কিংবা ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই হোক—সেই ওয়াদা যে পূর্ণ হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য সাধারণ নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা ইসলামী শরীয়াতের এ নিয়ম করেছেন যে, প্রথমে তিনি ভাল এবং পুণ্য কাজের একটা সাধারণ হুকুম জারী করেন, যেন মানুষ নিজের জীবনে সাধারণভাবে ভাল ও কল্যাণকর পন্থা অবলম্বন করতে পারে। তারপর সেই ভাল কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য একটি বিশেষ পন্থা নির্দেশ করা হয়। সেই বিশেষ পন্থাটি সকলেরই যথাযথ রূপে পালন করা কর্তব্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আল্লাহকে স্মরণ করা একটি অত্যন্ত ভাল কাজ এবং সর্বাপেক্ষা অধিক ভাল কাজ। শুধু তাই নয়—বস্তুত সমস্ত ভাল কাজেরই মূল উৎস এটাই। সেজন্য আল্লাহকে সকল সময় ও সকল অবস্থায়ই স্মরণ করা এবং এক মুহূর্তও তাকে ভুলে না যাওয়ার জন্য তাঁর নির্দেশ রয়েছে ঃ

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ج (النساء : ١٠٣)

"দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে (সকল সময় ও সকল অবস্থায়ই) আল্লাহকে স্মরণ কর।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১০৩)

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ (الانفال : ٤٥)

"খুববেশী করে তাঁর স্মরণ করতে থাক, কারণ একাজেই তোমাদের কল্যাণ হবে বলে আশা করা যায়।"–(সূরা আল আনফাল ঃ ৪৫)

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ۝ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج

"আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে (আল্লাহর অস্তিত্বের) বহু নিদর্শন রয়েছে, বুদ্ধিমান এবং চিন্তাশীল লোকদের জন্য —যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে, আর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ও গঠন রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকে এবং (গভীরভাবে চিন্তা করার পর প্রত্যেকটি জিনিসের মাহাত্ম্য বুঝতে পেরে উদাত্ত কণ্ঠে) বলে উঠে—হে আল্লাহ ! তুমি এর কোন একটিও নিরর্থক সৃষ্টি করনি।"

–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০-১৯১)

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا۝

"যাদের দিলে আল্লাহর স্মরণ নেই, যারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যারা প্রত্যেকটি কাজের নির্দিষ্ট সীমালংঘন করে থাকে, তোমরা তাদের আনুগত্য বা অনুসরণ করো না।"-(সূরা আল কাহাফ ঃ ২৮)

এ আয়াতসমূহে এবং এ ধরনের আরও অনেক ও অসংখ্য আয়াতে পরিষ্কার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, হে মানুষ ! তোমরা সকল সময় সকল অবস্থায়ই আল্লাহকে স্মরণ কর। কারণ, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর স্মরণই মানুষের সকল কাজ-কর্ম সুষ্ঠু এবং সুন্দর করে দেয়। মানুষ যখনই এবং যে কাজেই তাঁকে ভুলে যাবে ; সেখানেই প্রবৃত্তি (নফসের খাহেস) এবং শয়তানের প্রতারণা তাকে পরাভূত করবে। এর অনিবার্য পরিণামে মানুষ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজেদের জীবন যাপনের ব্যাপারে সীমালংঘন করতে শুরু করবে।

এটা ছিল আল্লাহকে স্মরণ করার একটি সাধারণ নির্দেশ। অতপর আল্লাহকে স্মরণ করার একটি বিশেষ উপায় নির্ধারণ করা হয়েছে। সে জন্য দিন-রাতের মধ্যে পাঁচবার কয়েক রাকাআত করে নামায পড়া ফরয করা হয়েছে। এ নামাযসমূহে একবার পাঁচ-সাত মিনিটের বেশী সময় অতিবাহিত হয় না। পাঁচ মিনিট এখন, আর পাঁচ মিনিট তখন এভাবে আল্লাহকে স্মরণ করা ফরয করে দেয়ার অর্থ এই নয় যে, মানুষ শুধু নির্দিষ্ট সময়টুকুতেই আল্লাহর স্মরণ করবে। আর অন্যান্য সময় তাঁকে একেবারে ভুলে যাবে। বরং এর প্রকৃত অর্থ এই যে, অন্ততপক্ষে এতটুকু সময়ের জন্য তো মুসলমানকে আল্লাহর স্মরণের কাজে আত্মনিমগ্ন হতেই হবে। তারপর তারা নিজ নিজ কাজ করে যাবে এবং সেই অবস্থায়ও আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকবে।

ইসলামে যাকাতের ঠিক এই অবস্থা। এখানেও একটি বিশেষ হুকুম এবং একটি সাধারণ হুকুম রয়েছে। একদিকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, কৃপণতা ও মনের সংকীর্ণতা থেকে দূরে থাক, কারণ এটাই সকল অনর্থের মূল এবং সকল বিপর্যয়ের উৎস। তোমাদের নৈতিক জীবনে আল্লাহর রং ধারণ কর। কারণ তিনি প্রতিটি মুহূর্তে গোটা সৃষ্টিজগতের ওপর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমাত বর্ষণ করে থাকেন, যদিও তাঁর ওপর কারো বিশেষ কোন অধিকার বা দাবী নেই। আবার বলা হয়েছে, আল্লাহর রাস্তায় যত এবং যাকিছুই খরচ করতে পার, তা করতে থাক, নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করে যা উদ্বৃত্ত রাখতে পার রাখ এবং আল্লাহর অন্যান্য অভাবগ্রস্ত বান্দাদের প্রয়োজন মিটাবার জন্য যত পার দান কর। দ্বীনের খেদমত এবং আল্লাহর কালেমা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে জান-

মাল দিয়ে চেষ্টা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইও না। আল্লাহর প্রতি যদি তোমার ভালবাসা থাকে, তবে ধন-সম্পত্তির প্রেমকে সে জন্য উৎসর্গ কর।

আল্লাহর পথে অর্থ দান করার জন্য এটা সাধারণ হুকুম। কিন্তু সেই সাথে বিশেষ নির্দেশ এই যে, এত পরিমাণ অর্থ তোমাদের কাছে সঞ্চিত হলে তা থেকে কমপক্ষে এত পরিমাণ অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে। তোমাদের ক্ষেতে এত পরিমাণ ফসল হলে তা থেকে এত পরিমাণ আল্লাহর পথে অবশ্যই দান করবে। নির্দিষ্ট কয়েক রাকাআত মাত্র নামায ফরয করার অর্থ যেমন এই নয় যে, ঐ কয় রাকাআত মাত্র আদায় করলেই আল্লাহকে স্মরণ করার কর্তব্য সম্পন্ন হয়ে গেল, অতএব তা ভিন্ন অন্যান্য সময় আল্লাহকে ভুলে যেতে পারবে। অনুরূপভাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আল্লাহর রাস্তায় দান করা যে ফরয করা হয়েছে, তার অর্থও এটা নয় যে, যাদের কাছে এত পরিমাণ অর্থ আছে কেবল তারাই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে বাধ্য। আর যারা তদপেক্ষা কম অর্থের মালিক, তাদের মুঠি বন্ধ করে রাখবে। এমনকি, তার অর্থ এটাও নয় যে, ধনীদের ওপর যে পরিমাণ যাকাত ফরয হয়েছে, তারা কেবল সেই পরিমাণ অর্থ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেই নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে, অতপর কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি আসলে তাকে তাড়িয়ে দেবে—দ্বীন ইসলামের কোন বৃহত্তর কাজের তাগীদ আসলে বলবে, একমাত্র যাকাতই আমার প্রতি ফরয হয়েছিল, আমি তা আদায় করেছি। অতএব এখন আর আমার কাছে কিছুই পেতে পারে না। বস্তুত যাকাত ফরয করার অর্থ মোটেই এটা নয়। যাকাত ফরয করার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি অন্ততপক্ষে এই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অবশ্যই আল্লাহর পথে খরচ করতে বাধ্য। আর তার অধিক ব্যয় করার সামর্থ থাকলে তাও তাকে অবশ্যই করতে হবে।

আল্লাহর রাস্তায় অর্থ খরচ করার সাধারণ হুকুম এবং তার বিশ্লেষণ এখানে করা যাচ্ছে ঃ

কুরআন মজীদ কোন কাজের নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে তার অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতাও স্পষ্ট করে বলে দেয়। এটা কুরআন মজীদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর সাহায্যে মানুষ আল্লাহর আদেশের মূল লক্ষ্য ও যৌক্তিকতা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে।

কুরআন মজীদের শুরুতে যে আয়াতটি চোখে পড়ে তা এই ঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ ۚ فِيْهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ (البقرة : ٢-٣)

"এই কুরআন আল্লাহর কিতাব, এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। এটা সেই সব সত্যনিষ্ঠ মুত্তাকী লোকদেরকে সত্য পথের সন্ধান করে দেয়, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাসী, নামায কায়েম করে এবং আমার দেয়া জীবিকা থেকে (আমার পথে) খরচ করে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২-৩)

এ আয়াতে একটি মূলনীতি বলে দেয়া হয়েছে। পার্থিব জীবনে সোজা পথে চলার জন্য তিনটি জিনিস অপরিহার্য। প্রথম, ঈমান বিল গায়েব—অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন ; দ্বিতীয়, নামায কায়েম করা এবং তৃতীয়, আল্লাহ তাআলা যে রিযক দান করেছেন, তা থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ؕ(ال عمران : ٩٢)

"তোমাদের প্রিয় জিনিসগুলো আল্লাহর পথে অকাতরে খরচ না করা পর্যন্ত পুণ্যশীলতার উচ্চ মর্যাদা তোমরা কিছুতেই লাভ করতে পারো না।"

আবার বলা হয়েছে ঃ

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَامُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ج(البقرة : ٢٦٨)

"টাকা-পয়সা খরচ করলে শয়তান তোমাদেরকে গরীব হয়ে যাওয়ার ভয় দেখায় এবং তোমাদেরকে লজ্জাকর কাজ—কৃপণতার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।"

এরপর ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ـ

"আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর এবং নিজের হাতেই নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না (আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করলেই নিজকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা হয়)।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৫)

সর্বশেষ বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ج(الحشر : ٩)

"মনের সংকীর্ণতা হতে যারা বাঁচতে পারবে তাঁরাই পরম কল্যাণ লাভ করবে।"–(সূরা আল হাশর ঃ ৯)

উল্লেখিত আয়াতসমূহে থেকে পরিষ্কার জানতে পারা যায় যে, দুনিয়ায় মানুষের জীবন যাপনের দু'টি মাত্র পথ বিদ্যমান। একটি আল্লাহর পথ—যার পরিণামে চিরন্তন সুখ শান্তি এবং পরম কল্যাণ রয়েছে। এ পথে মানুষের দিল

উদার-উন্মুক্ত হয়ে থাকাই স্বাভাবিক। আল্লাহ্ তাকে কম কিংবা বেশী যে পরিমাণ রিযকই দান করেছেন, তা থেকে সে নিজের যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করবে, অন্যান্য ভাইদেরকেও যথাসম্ভব সাহায্য করবে এবং আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা বা আল্লাহর দ্বীন ইসলামকে কায়েম করার কাজেও ব্যয় করবে। অপরটি হচ্ছে শয়তানের পথ। এ পথে বাহ্য দৃষ্টিতে মানুষ খুব আনন্দ এবং সুখ দেখতে পায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ পথে ধ্বংস এবং বিপর্যয় ভিন্ন আর কিছুই নেই। এ পথে স্বাভাবিকভাবেই অর্থ-সম্পদ শোষণ করে সঞ্চয় করতে চেষ্টা করে এবং অর্থের জন্য মন ও প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আর তা করতেও প্রস্তুত হয় না। একান্তই যদি খরচ করে, তবে তা কেবল নিজের প্রয়োজন এবং নিজের মনের লালসা চরিতার্থ করার জন্য মাত্র।

আল্লাহর পথের যাত্রীদেরকে আল্লাহর রাস্তায় ধন-সম্পদ খরচ করার যে নিয়ম ও পন্থা বলে দেয়া হয়েছে, এখানে ধারাবাহিকভাবে তা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

এক ঃ সর্বপ্রথম কথা এই যে, কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই খরচ করবে, কারো প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা বা দুনিয়ায় নাম ও খ্যাতি লাভ করার জন্য খরচ করবে না।

وَمَا تُنْفِقُوْنَ الاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ ط (البقرة : ٢٧٢)

"তোমরা যা কিছু খরচ কর, তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ছাড়া তোমাদের যেন আর কিছুই লক্ষ্য না থাকে।"—(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭২)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى لا كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ط (البقر : ٢٦٤)

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা তোমাদের দান-খয়রাতকে অনুগ্রহ প্রকাশ করে এবং মনঃকষ্ট দিয়ে সেই ব্যক্তির ন্যায় নষ্ট করে দিও না—যে ব্যক্তি কেবল পরকে দেখাবার জন্য খরচ করে এবং আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে না। তার দান-খয়রাত ঠিক তেমনি যেমন একটি প্রস্তর খণ্ডের ওপরে মাটি পড়ে আছে, এমতাবস্থায় তার ওপর যদি প্রবল বৃষ্টিপাত হয় তবে সমস্ত মাটিই ধুয়ে-মুছে প্রস্তর খণ্ডটি একেবারে ছাফ ও মাটিহীন হয়ে যাবে।"—(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৪)

দুই ঃ কাউকে কিছু দান করলে তার কাছে অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং এমন কোন কাজ করতে পারবে না যাতে তার মনে কিছুমাত্র কষ্ট লাগতে পারে ঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لاَيُتْبِعُوْنَ مَااَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلاَ اَذًى لا لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ط -(البقرة : ٢٦٢-٢٦٣)

"আল্লাহর পথে যারা খরচ করে এবং খরচ করার পর নিজের অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং কাউকে মনঃকষ্ট দেয় না, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বড়ই 'সওয়াব' আছে এবং কোন প্রকার ভয় ও ক্ষতির আশংকা তাদের নেই। কিন্তু যেসব দানের পর কষ্ট দেয়া হয় সেসব দান অপেক্ষা প্রার্থীকে নম্রতার সাথে ফিরিয়ে দেয়া এবং 'ভাই, ক্ষমা কর' বলে বিদায় করাই উত্তম।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬২-২৬৩)

তিন ঃ আল্লাহর পথে সবসময়ই ভাল জিনিস দান করা উচিত। বেছে বেছে কেবল খারাপটাই যেন দেয়া না হয়। গরীবকে দেয়ার জন্য যারা ছিন্ন জামা-কাপড় তালাশ করে এবং কোন দরিদ্রকে খাওয়াবার জন্য নিকৃষ্টতর খাদ্য প্রদান করে, আল্লাহর কাছ থেকে তারা অনুরূপ নিকৃষ্ট ফলই পাবে ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ص وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ - (البقرة : ٢٦٧)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমরা তোমাদের জন্য মাটির বুক থেকে যা নির্গত ও উৎপন্ন করেছি, তা থেকে ভাল ভাল জিনিস আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর—আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য নিকৃষ্ট মাল তালাশ করে ফিরো না।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৭)

চার ঃ যতদূর সম্ভব আল্লাহর রাস্তায় গোপনভাবেই খরচ করতে হবে, লোক দেখানোর বিন্দুমাত্র ভাব যেন তাতে স্থান না পায়। প্রকাশ্যভাবে খরচ করায় যদিও দোষের কিছু নেই কিন্তু তবুও গোপনে খরচ করা উত্তম ঃ

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ج وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ط (البقرة : ٢٧١)

"প্রকাশ্যভাবে খরচ করলে তা ভাল ; কিন্তু লুকিয়ে গরীবদের দান করলে তোমাদের পক্ষে অতি ভাল এবং তাতে তোমাদের গুনাহ দূর হয়ে যাবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭১)

পাঁচ ঃ নির্বোধ ও অজ্ঞ লোকদেরকে তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ কখনও দেয়া যাবে না। কারণ অধিক অর্থ পেয়ে তাদের বিভ্রান্ত হয়ে যাওয়ার এবং তাদের হাতে সম্পদ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছা এটা যে, খাদ্য ও বস্ত্র সকল মানুষকেই দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, সে যত বড় পাপী আর আল্লাহদ্রোহী হোক না কেন। কিন্তু মদপান, গাঁজা, আফিম খাওয়া এবং জুয়া খেলার জন্য কাউকে এক পয়সাও দেয়া যেতে পারে না।

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ -

"তোমাদের ধন-সম্পত্তিকে আল্লাহ তাআলা জীবনযাপনের উপায় করে দিয়েছেন, কাজেই তা কখনও অজ্ঞ-মূর্খদের হাতে ছেড়ে দিও না। অবশ্য তা দ্বারা তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করে দিতে হবে।"

ছয় ঃ কারো প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তাকে ধার দেয়া হলে বার বার তাগাদা করে তাকে বিরক্ত করো না। তা আদায় করার জন্য তাকে যথেষ্ট অবকাশ দিতে হবে। আর তা ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তার অক্ষমতা যদি নিসন্দেহে জানা যায় এবং ঋণদাতারও যদি ক্ষমা করার মত সঙ্গতি থাকে, তবে তাকে মাফ করে দেয়াই বাঞ্ছনীয় ঃ

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ط وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ (البقرة : ٢٨٠)

"ঋণী ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা খারাপ হলে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত তাকে অবশ্যই সময় দিতে হবে। আর তাকে ক্ষমা করে দেয়া আরও ভাল—অবশ্য যদি তোমরা এর স্বার্থকতা বুঝতে পার।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৮০)

সাত ঃ মানুষকে দান করারও একটা সীমা আছে। সেই সীমা কখনও লংঘন করা যেতে পারে না। নিজেকে এবং নিজের সন্তান-সন্তুতিকে বঞ্চিত করে পরকে দান করার আদেশ আল্লাহ তাআলা করেননি—তাঁর উদ্দেশ্যও তা নয়। আল্লাহর ইচ্ছা এই যে, সহজ ও সাধারণভাবে জীবনযাপনের জন্য যা কিছুর প্রয়োজন হবে তা তো খরচ করতেই হবে, তারপরে যা উদ্বৃত্ত থাকবে তা হতেই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلِ الْعَفْوَ ط -(البقرة : ٢١٩)

"তারা জিজ্ঞেস করে ঃ কি খরচ করবো ? (হে নবী ! আপনি) বলে দিন যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা, তাই খরচ করবে।"-(সূরা বাকারা ঃ ২১৯)

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ○

"আল্লাহর নেক বান্দাহ তারাই—যারা খরচ করে ; কিন্তু অনর্থক খরচ করে না এবং খুব বেশী কার্পণ্যও করে না। বরং এই দু প্রান্তসীমার মধ্যবর্তী পন্থাই হয় তাদের আদর্শ।"-(সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৭)

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ○ (بنى اسرايل : ٢٩)

"তোমাদের (দানের) হাত গুটিয়ে একেবারে গলার সাথে বেঁধে নিও না এবং তা বেশী ছড়িয়েও দিও না, কারণ তার ফলে তোমাকে অনুতপ্ত এবং লোকদের কাছে তিরস্কৃত হতে হবে।"-(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৯)

আট ঃ এ দানের উপযুক্ত পাত্র কে ? সর্বশেষে একথাও জেনে নেয়া আবশ্যক। তার এক পূর্ণ তালিকাও আল্লাহ তাআলা পাক কালামে পেশ করেছেন। কে কে আপনার সাহায্য পেতে পারে এবং আপনার উপার্জনে আল্লাহর তরফ থেকে কার কার অধিকার নির্ধারিত হয়েছে, এ তালিকা দৃষ্টে তা পরিষ্কাররূপে বুঝতে পারা যায়।

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ -(بنى اسرائيل : ٢٦)

"গরীব নিকটাত্মীয়দেরকে তাদের প্রাপ্য দাও এবং মিসকীন ও গরীব প্রবাসীকেও।"-(বনী ইসরাঈল ঃ ২৬)

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ج -(البقرة : ١٧٧)

"তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যারা নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, পথিক ও প্রার্থীকে এবং দাস ও কয়েদীদের মুক্তি বিধানের জন্য অর্থ দান করে, তারা আল্লাহর প্রিয়।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭)

وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِذِى

الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ (النساء : ٣٦)

"নিজের পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, চলার সাথী, প্রবাসী এবং নিজের দাস-দাসীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৩৬)

وَيُطعِمُونَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّه مِسكِينًا وَّيَتِيمًا وَّاَسِيرًا ○ اِنَّمَا نُطعِمُكُم لِوَجهِ اللّٰهِ لَانُرِيدُ مِنكُم جَزَاءً وَّلَا شُكُورًا ○ اِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَومًا عَبُوسًا قَمطَرِيرًا ○ (الدهر : ٨ـ١٠)

"আল্লাহর নেক বান্দাহগণ ইয়াতীম, মিসকীন এবং কয়েদীকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও প্রেম লাভ করার উদ্দেশ্যে খাদ্যদান করে। তারা বলে যে, আমরা তোমাদেরকে শুধু আল্লাহর জন্য খানা খাইয়ে থাকি। আমরা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় ও কৃতজ্ঞতা চাই না। আমরা কেবল আল্লাহর কাছে সেই দিনেরই ভয় করছি, যে দিনের কঠিন বিপদে মানুষের মুখ শুকিয়ে যাবে এবং কপালে ভাঁজ পড়ে যাবে।"–(সূরা আদ দাহর ঃ ৮-১০)

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○ (الذّريت : ١٩)

"এবং তার ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত জনের অধিকার রয়েছে।"

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ز يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ج لَايَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِه عَلِيْمٌ ○

"যারা সকল সময়ে আল্লাহর কাজে লিপ্ত থাকে বলে নিজেদের জীবিকা উপার্জনের জন্য কোন কাজ করতে পারে না, দান-খয়রাত তাদেরই প্রাপ্য। তাদের আত্মসম্মান জ্ঞান দেখে অন্তত মূর্খ লোকেরা তাদেরকে ধনী বলে মনে করে। কিন্তু তোমরা তাদের বেশ ও রূপ দেখেই বুঝতে পার, তারা কত কষ্ট করছে। তোমাদের নিজেদেরই অগ্রসর হয়ে তাদের দান করা উচিত। কারণ, তারা মানুষকে জড়িয়ে ধরে সাহায্য চাওয়ার মত লোক নয়, গোপনভাবে তোমরা তাদেরকে যা কিছু দেবে আল্লাহ তা নিশ্চয় জানবেন এবং তিনি তার বিনিময় নিশ্চয়ই দেবেন।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৩)

যাকাত আদায়ের নিয়ম

পূর্বের প্রবন্ধে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার সাধারণ হুকুম বিবৃত হয়েছে। এখন যাকাত প্রসংগে যাবতীয় হুকুম বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে।

যাকাত সম্পর্কে কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা তিন স্থানে ভিন্ন ভিন্নভাবে হুকুম দিয়েছেন। সূরা আল বাকরায় বলা হয়েছে ঃ

اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ص

"তোমরা নিজেরা যে পবিত্র ধন-সম্পদ উপার্জন করেছো এবং জমি থেকে যে ফসল আমি তোমাদেরকে দান করেছি—এসব কিছু থেকে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৭)

সূরা আল আনআমেও এ প্রসংগে বলা হয়েছে যে, আমিই তোমাদের জন্য যমীনে বাগিচা এবং ক্ষেত-খামার তৈরি করেছি। অতএব ঃ

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖۤ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ز (الانعام : ١٤١)

"(বাগান এবং ক্ষেতে) যখন ফল বা ফসল ফলবে তখন তোমারা তা থেকে নিজেদের খাবার সংগ্রহ কর এবং ফল বা ফসল কাটার দিন তা থেকে আল্লাহর প্রাপ্য আদায় করো।"-(সূরা আল আনআম ঃ ১৪১)

এ উভয় আয়াতেই জমির ফসলের যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের মতে প্রাকৃতিক সম্পদ-কাঠ, ঘাস এবং বাঁশ ইত্যাদি ভিন্ন সকল প্রকার শস্য তরকারী ও ফলে আল্লাহর পাওনা রয়েছে এবং তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। হাদীস শরীফে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, বৃষ্টি, নদী ও সমুদ্রের পানি থেকে যেসব ফসল জন্মে তাতে মোট ফসলের এক-দশমাংশ আল্লাহর প্রাপ্য এবং যে জমিতে মানুষকে কৃত্রিম উপায়ে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয়েছে তাতে আল্লাহর অংশ নির্ধারিত হয়েছে মোট ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ। এ উভয় প্রকার অংশই শস্য কর্তনের সাথে সাথেই আদায় করা ওয়াজিব।

এরপর সূরা তাওবায় বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ٧

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا

جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ط هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ○ (التوبة : ٣٤-٣٥)

"যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা থেকে আল্লাহর রাস্তায় মোটেই খরচ করে না, তাদেরকে কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দাও। সেই দিনের আযাবের কথা জানিয়ে দাও যেদিন সোনা ও রূপা আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের ললাটে, পাঁজরে ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। আর তাদেরকে বলা হবে যে, এটাই হচ্ছে তোমাদের নিজেদের জন্য সঞ্চিত সেই ধন-সম্পদ। তোমরা যা কিছু সঞ্চয় করেছিলে এখন তারই স্বাদ গ্রহণ করো।" -(সূরা আত তাওবা ঃ ৩৪-৩৫)

অতপর বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط

"যাকাত আল্লাহর নির্ধারিত ফরয। এটা দেয়া হবে ফকীর, মিসকীন এবং যাকাত উসুলকারী কর্মচারীদেরকে, ভিন্ন ধর্মের লোকদের মন জয় করা, দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ লোকদের মুক্তির ব্যবস্থা করা, ঋণী লোকদের ঋণ শোধ করা, আল্লাহ নির্ধারিত সার্বজনীন কাজে এবং নিঃস্ব পথিকদের সাহায্যার্থেও এটা খরচ করা হবে।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ৬০)

এরপর আল্লাহ বলেছেন ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ -(التوبة : ١٠٣)

"তাদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত উসুল করে তাদেরকে পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন করে দাও।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ১০৩)

উল্লেখিত তিনটি আয়াত থেকেই জানা যায় যে, যেসব সম্পদ সঞ্চয় করা হবে এবং পরিমাণে বৃদ্ধি করা হবে তা থেকে যদি আল্লাহর পথে খরচ করা না হয়, তবে তা নাপাক হবে, তা পবিত্র করার একমাত্র উপায় হচ্ছে তা থেকে আল্লাহর প্রাপ্য অংশ 'উপযুক্ত' লোকদের মধ্যে বন্টন করা। হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, সোনা ও রূপা সঞ্চয়কারীদের সম্পর্কে যখন এ আযাবের সংবাদ আসলো, তখন মুসলমান জনসাধারণ অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কারণ

এ আয়াত অনুসারে তারা মনে করেছিল যে, কারো কাছে এক পয়সাও জমা রাখা অন্যায়, সব খরচ করে দিতে হবে। অবশেষে হযরত উমার ফারুক (রা) নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে মুসলমানদের এ উৎকণ্ঠার কথা জানালেন। হযরত রাসূলে করীম (সা) উত্তরে ইরশাদ করলেন : 'আল্লাহ তোমাদের প্রতি যাকাত এজন্যই ফরয করেছেন যে, তা আদায় করলে অবশিষ্ট ধন তোমাদের জন্য পবিত্র ও হালাল হয়ে যাবে। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকেও এরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলে পাক (সা) বলেছেন, তোমার মাল থেকে যখন যাকাত আদায় করে দিলে, তখন তোমার প্রতি যা অবশ্য কর্তব্য (ওয়াজিব) ছিল তা তুমি আদায় করলে।

উল্লেখিত আয়াত থেকে শুধু সোনা-রূপার যাকাতের নির্দেশ জানতে পারা যায় ; কিন্তু হাদীস থেকে জানা যায় যে, ব্যবসায়ের পণ্য, উট, গরু-ছাগলেরও যাকাত আদায় করতে হয়। রূপার সাড়ে বায়ান্ন তোলায় এবং স্বর্ণের সাড়ে সাত তোলায় যাকাত ফরয হয়। চল্লিশটি ছাগল এবং ত্রিশটি গরুতে যাকাত দিতে হবে এবং ব্যবসায়ের পণ্যের মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমান হলে যাকাত দিতে হবে। অর্থাৎ এ নির্দিষ্ট পরিমাণ যার কাছে বর্তমান থাকবে এবং এভাবে তার একটি বছর সময় অতীত হবে, তাকে এর চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত বাবদ আদায় করতে হবে। হানাফী মাযহাবের ইমামগণ বলেছেন যে, আলাদা আলাদাভাবে সোনা ও রূপার যাকাত ফরয হওয়ার নির্দিষ্ট পরিমাণ যদি বর্তমান না থাকে, কিন্তু দু'টিরই সমষ্টিগত মূল্য যাকাতের পরিমাণ (নেসাব) পর্যন্ত পৌঁছে তবে তা থেকেও যাকাত আদায় করতে হবে।

হযরত উমার ও ইবনে মাসউদ (রা)-এর মতে সোনা রূপার অলংকারের যাকাত আদায় করা ফরয। ইমাম আবু হানীফা (র)-ও এ মত-ই গ্রহণ করেছেন। হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, রাসূলে পাক (সা) দু'জন স্ত্রীলোকের হাতে স্বর্ণের কংকন দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তারা যাকাত আদায় করে কিনা। একজন উত্তরে বললো—না। হযরত (সা) বললেন, আজ যাকাত আদায় না করলে কিয়ামতের দিন তোমার হাতে আগুনের কংকন পরতে তুমি রাজী হবে কি ? হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর কাছে 'পাঁজেব' নামক এক প্রকার স্বর্ণের অলংকার ছিল। তিনি রাসূলে পাক (সা)-এর কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এটা কি সঞ্চিত ধনের শামিল ? হযরত (সা) উত্তর করলেন, এর পরিমাণের ওপর যদি যাকাত ফরয হয় আর তা থেকে যাকাত আদায় করা হয় ; তবে ওটা নিষিদ্ধ সঞ্চয় নয়। এ উভয় হাদীস থেকে জানা যায় যে, সোনা-রূপার অলংকার হলেও তাতে যাকাত ফরয হবে—যেমন

মওজুদ সোনা-রূপার ওপর ফরয হয়। অবশ্য হীরা-জহরত বা আংটির কারুকার্যের জন্য যাকাত দিতে হয় না।

কালামে পাকে যাকাত পাবার যোগ্য আট শ্রেণীর লোকের উল্লেখিত হয়েছে। এখানে তাদের বিবরণ দেয়া যাচ্ছে ঃ

গরীব ঃ যাদের কাছে কিছু না কিছু ধন-সম্পদ আছে কিন্তু তা তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, খুবই টানাটানির ভেতর দিয়ে যাদের জীবন অতিবাহিত হয়, তদুপরি কারো কাছে কিছু চাইতেও পারে না, এরা গরীব। ইমাম জুহুরী, ইমাম আবু হানীফা, ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, আবুল হাসান করখী এবং অন্যান্য ফকীহগণ এদেরকেই ফকীর বা গরীব বলে অভিহিত করেছেন।

মিসকীন ঃ যেসব লোকের অবস্থা আরও খারাপ, পরের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়, নিজের পেটের অন্নও যারা যোগাড় করতে পারে না তারা মিসকীন। যারা সক্ষম কিন্তু বেকার অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে হযরত উমার (রা) তাদেরকেও মিসকীনের মধ্যে গণ্য করেছেন।

যাকাত বিভাগের কর্মচারী ঃ ইসলামী রাষ্ট্র যাকাত আদায়ের জন্য যাদেরকে কর্মচারী নিযুক্ত করবে, তাদেরকেও যাকাতের অর্থ থেকেই বেতন দেয়া হবে।

যাদের মন রক্ষা করতে হয় ঃ ইসলামের সহায়তার জন্য কিংবা ইসলামের বিরোধিতা বন্ধ করার জন্য যাদেরকে টাকা দেয়ার প্রয়োজন তারা এর অন্তর্ভুক্ত। সেই সকল নও-মুসলিমও এর অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে সমস্যা মুক্ত করা একান্ত অপরিহার্য। নও-মুসলিমগণ অমুসলিম জাতির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে মুসলমানদের সাথে মিলিত হবার কারণে বেকার সমস্যা বা আর্থিক অনটনে পড়ে গেলে তাদের সাহায্য করা মুসলমানদের একটি জাতীয় কর্তব্য। এমনিক তারা ধনী হলেও তাদেরকে যাকাত দেয়া উচিত। এতে তারা ইসলামের ওপর অধিকতর আস্থাবান হবে। হোনাইনের যুদ্ধে জয়ের পর হযরত নবী করীম (সা) নও-মুসলিমদেরকে গনীমাতের বহু সম্পদ দান করেছেন। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগে একশ' উট পড়েছিল। আনসারগণ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে রাসূলে পাক (সা) বললেন ঃ 'এরা সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে আমি তাদেরকে খুশী করতে চাই।' এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম জুহরী বলেছেন, যেসব ইয়াহুদী-খৃষ্টান মুসলমান হবে বা অন্য কোন ধর্মাবলম্বী ইসলাম কবুল করবে, তারা ধনী হলেও তাদের যাকাত দেয়া হবে।[১]

১. এ বিষয়ে ইসলামী আইনের বিস্তৃত বিবরণ দেয়া এখানে সম্ভব নয়। এজন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা 'তাওবা'র তাফসীর দ্রষ্টব্য।

গোলাম ও কয়েদীদের মুক্তি বিধান ঃ যে ব্যক্তি দাসত্ব শৃংখলে বন্দী হয়ে আছে এবং যে মুক্তি পেতে চায়, তাকেও যাকাতের অর্থ দেয়া যায়। উক্ত অর্থের বিনিময়ে সে মালিকের দাসত্ব শৃংখল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবে। বর্তমান যুগে দাস প্রথার প্রচলন নেই। তাই আমি মনে করি যেসব লোক কোন ব্যাপারে জরিমানা আদায় করতে অক্ষম বলে কয়েদ ভুগতে বাধ্য হয়, যাকাতের অর্থ দিয়ে তাদের মুক্তি বিধান করা যেতে পারে—করলে তাও এ বিভাগেই গণ্য।

ঋণী ব্যক্তির ঋণ শোধ ঃ যেসব লোক ঋণী অথবা ঋণ আদায় করার সম্বল যাদের নেই, তাদেরকেও যাকাতের টাকা দ্বারা ঋণ ভার থেকে মুক্তি দেয়া যাবে। কিন্তু তাই বলে একজনের কাছে হাজার টাকা থাকলেও সে যদি একশ' টাকার ঋণ হয় তাহলে তাকে কিছুতেই যাকাত দেয়া যাবে না। তবে যে ব্যক্তির ঋণ শোধ করার পর যাকাত ফরয হতে পারে, এ পরিমাণ অর্থ যদি তার কাছে না থাকে তবে তাকে যাকাত দেয়া যেতে পারে। ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ এটাও বলেছেন যে, যারা অপচয় এবং বিলাসিতা ও কু-কাজ করে ঋণী হয়, তাদেরকে যাকাত দেয়া মাকরূহ। কারণ এমতাবস্থায় তাদেরকে যাকাত দিলে সে ধন-সম্পদের আরও অপচয় করবে এবং যাকাত নিয়ে ঋণ শোধ করার ভরসায় সে আরও অধিক ঋণ গ্রহণ করবে।

আল্লাহর পথে ঃ আল্লাহর পথে শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক। মুসলমানদের সমস্ত নেক কাজেই যাকাতের টাকা ব্যয় করা যেতে পারে। কিন্তু বিশেষ করে এর অর্থ হচ্ছে—আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের সাহায্য করা। নবী করীম (সা) বলেছেন যে, ধনী ব্যক্তির পক্ষে যাকাত গ্রহণ জায়েয নয় কিন্তু ধনী ব্যক্তিই যদি জিহাদের জন্য সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, তবে তাকেও যাকাত দিতে হবেঃ কারণ এই যে, এক ব্যক্তি ধনী হতে পারে ; কিন্তু জিহাদের জন্য যে বিরাট ব্যয় আবশ্যক, তা সে শুধু নিজের অর্থ দ্বারা পূরণ করতে পারে না। তার এ কাজের জন্য তাকে যাকাতের টাকা সাহায্য করা যাবে।

পথিক-প্রবাসী ঃ পথিক বা প্রবাসীর নিজ বাড়ীতে যত ধন-সম্পদ থাকুক না কেন, কিন্তু পথে বা প্রবাসে সে যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে তবে তাকে যাকাতের টাকা দিতে হবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, ওপরে যে আট শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করা হলো তাদের মধ্যে কাকে কোন অবস্থায় যাকাত দেয়া উচিত আর কোন অবস্থায় না দেয়া কর্তব্য—এ সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা যাচ্ছে ঃ

এক ঃ কোন ব্যক্তি নিজের পিতা বা পুত্রকে যাকাত দিতে পারে না, স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে না। এ সম্পর্কে ইসলামী শরীয়াতবিদগণ সম্পূর্ণ একমত। কোন কোন ফিকাহ্ শাস্ত্রকার এটাও বলেছেন যে, যেসব নিকটাত্মীয়ের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তোমার ওপর ; যারা শরীয়াত অনুসারে তোমার উত্তরাধীকারী, তুমি তাদেরকে যাকাত দিতে পার না ; অবশ্য দূরবর্তী আত্মীয় তোমার যাকাত পাবার অধিকারী হবে। বরং অন্যান্য লোকদের অপেক্ষা তাদের অধিকার বেশী স্বীকৃত হবে। কিন্তু ইমাম আওজায়ী বলেছেন যে, যাকাত দেবার জন্য কেবল নিজের আত্মীয় এগানই তালাশ করো না।

দুই ঃ যাকাত কেবল মুসলমানই পেতে পারে। অমুসলমানগণ যাকাত পেতে পারে না। যাকাতের সংজ্ঞা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَاءِكُمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَاءِكُمْ "যাকাত তোমাদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তোমাদের গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে।" অমুসলমান গরীবকে সাধারণ দান-খয়রাত অবশ্যই দেয়া হবে। বরং সাধারণ দানের ক্ষেত্রে মুসলমান-অমুসলমানের মধ্যে পার্থক্য করে মুসলমানকে দেয়া এবং অমুসলমানকে না দেয়া আদৌ সমীচীন নয়।

তিন ঃ ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন যে, প্রত্যেক এলাকার যাকাত সেই এলাকার গরীবদের মধ্যেই বন্টন করতে হবে। এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাকাতের অর্থ প্রেরণ করা ঠিক নয়। কিন্তু কোন এলাকায় যাকাত গ্রহণ করার মত লোকই যদি না থাকে কিংবা অন্য এলাকায় যদি এমন কোন বিপদ এসে পড়ে, যে জন্য দূরবর্তী এলাকা থেকে যাকাতের অর্থ সেখানে প্রেরণ করা অত্যন্ত জরুরী বোধ হয়, যথা—প্লাবণ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ; তবে তদনুযায়ী যাকাত বন্টন করা কোন দোষের কাজ নয়। ইমাম মালেক ও ইমাম সুফিয়ান সাওরীর মতও প্রায় এরূপ। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাকাত প্রেরণ একেবারেই অসংগত বা নাজায়েয নয়।

চার ঃ কোন কোন লোকের মতে যার দু' বেলা খাবার ব্যবস্থা আছে, তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা উচিত নয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, যার কাছে দশ টাকা মওজুদ আছে, অন্য একজনের মতে যার কাছে সাড়ে বার টাকা আছে তার যাকাত নেয়া উচিত নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা এবং হানাফী মাযহাবের অন্যান্য আলেমগণ বলেছেন যে, যার কাছে পঞ্চাশ টাকার কম নগদ সম্পত্তি থাকবে সে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে। বাড়ী ঘরের জিনিসপত্র এবং ঘোড়া ও চাকর এর মধ্যে গণ্য হবে না। অর্থাৎ এসব দ্রব্যাদি থাকা সত্ত্বেও যার

পঞ্চাশ টাকার কম সম্পত্তি আছে, সে যাকাত পেতে পারে। এ ব্যাপারে একটি জিনিস হলো আইন আর অপরটি হলো ফযীলতের মান। এ দু'টি জিনিসের মধ্যে পার্থক্য আছে।

ফযীলতের মান সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যার সকাল ও সন্ধ্যার খাদ্যের ব্যবস্থা আছে সে যদি লোকদের কাছে প্রার্থনা করে তবে সে নিজের জন্য আগুন সঞ্চয় করে। অন্য হাদীসে নবী করীম (সা) বলেছেন, মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করা অপেক্ষা কাঠ কেটেও যদি নিজের অন্ন সংস্থান করা হয়, তবে তাই আমার কাছে অধিক মনোনীত। তৃতীয় একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, যার কাছে খাদ্য আছে কিংবা যার উপার্জন করার শক্তি আছে তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা উচিত নয়। মানুষের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগাবার জন্যই এটা হযরতের শিক্ষা—এটা আইন নয় আইনের একটি শেষ সীমা নির্দেশ করা হয়েছে এবং কতদূর পর্যন্ত মানুষ যাকাত নিতে পারে তা বলে দেয়া হয়েছে। একটি হাদীসে রাসূলে পাক (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَاِنْ جَاءَ عَلَى الْفَرَسِ -

"ভিক্ষাপ্রার্থী ঘোড়ায় চড়ে আসলেও তাকে ভিক্ষা দিতে হবে।"

এক ব্যক্তি হযরতের কাছে জিজ্ঞেস করলো, 'আমার কাছে দশ টাকা থাকলে আমি মিসকীনদের মধ্যে গণ্য হবো ? হযরত বললেন, হাঁ। একবার দু' ব্যক্তি হযরতের কাছে যাকাত চেয়েছিল। হযরত (সা) তাদেরকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন এবং বললেন ঃ 'তোমরা নিতে চাইলে আমি তোমাদেরকে দেব বটে, কিন্তু মূলত ধনী এবং সক্ষম লোকদের এতে কোন অংশ নেই।' এসব হাদীস থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, যাকাত ফরয হওয়ার নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ যাদের নেই তারাও গরীবদের মধ্যে গণ্য হয় এবং তাদেরকেও যাকাত দেয়া যেতে পারে। বলাবাহুল্য যাকাত পাওয়ার প্রকৃত অধিকারী কেবল যথার্থ অভাবগ্রস্ত লোক হতে পারে।

যাকাতের জরুরী নিয়ম-কানুন এখানে বর্ণিত হলো ; কিন্তু এ প্রসংগে একটি অত্যন্ত জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ কথার দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমি বিশেষ আবশ্যক বলে মনে করি। কারণ যে কথাটি আমি বলতে চাই, বর্তমান মুসলমানগণ তা ভুলে গেছে। তা এই যে, ইসলামের সমস্ত কাজই দলগত ও সমষ্টিগতভাবে সম্পন্ন করতে হয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যমূলক বিচ্ছিন্নতা ইসলাম সমর্থন করে না। মসজিদ থেকে দূরে অবস্থিত কোন মুসলমান যদি একাকী নামায পড়ে, তবে নামায হবে বটে ; কিন্তু ইসলামী শরীয়াতে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে—মুসলমান জামায়াতের

সাথেই নামায আদায় করুক, এটাই শরীয়াতের কাম্য। কালামে পাকে এ দিকে ইংগিত করে বলা হয়েছে ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا ـ(التوبة : ١٠٣)

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা হযরত রাসূলে করীম (সা)-কে মুসলমানদের কাছ থেকে যাকাত উসুল করতে আদেশ দিয়েছেন। মুসলমানদেরকে স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় করতে বলা হয়নি। উপরন্তু যাকাত আদায়ের কর্মচারীদের জন্যও যাকাতের অর্থ অংশ নির্দিষ্ট করার অর্থ এই যে, মুসলমানদের ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান সকলের কাছ থেকে যাকাত আদায় করবে এবং সমষ্টিগতভাবে তা খরচ করবে। নবী করীম (সা)-ও একথা বলেছেন ঃ

اُمِرْتُ اَنْ اَخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ اَغْنِيَاءِ كُمْ وَاَرُدُّهَا فِىْ فُقَرَاءِ كُمْ ـ

অর্থাৎ তোমাদের ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে তোমাদের গরীবদের মধ্যে বন্টন করার জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি। নবী করীম (সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও যাকাত আদায়ের এ পদ্ধতি কার্যকর ছিল। ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মকর্তাগণ সমস্ত যাকাত উসুল করতেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে তা রীতিমত বন্টন করা হতো।

পঞ্চম অধ্যায়
হজ্জের হাকীকত

بسم الله الرحمن الرحيم

হজ্জের গোড়ার কথা

আরবী ভাষায় 'হজ্জ' অর্থ যিয়ারতের সংকল্প করা। যেহেতু খানায়ে কা'বা যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানরা পৃথিবীর চারদিক থেকে নির্দিষ্ট কেন্দ্রের দিকে চলে আসে, তাই এর নাম রাখা হয়েছে 'হজ্জ'। কখন কিভাবে হজ্জের সূচনা হয়েছিল, সেই ইতিহাস অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষাপ্রদ। গভীর মনোযোগের সাথে সেই ইতিহাস অধ্যয়ন করলে হজ্জের কল্যাণকারিতা হৃদয়ঙ্গম করা পাঠকের জন্য সহজ হবে।

কি মুসলমান, কি খৃষ্টান—হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নাম কারো অজানা নয়। দুনিয়ায় তিন ভাগের দু' ভাগেরও বেশী লোক তাঁকে 'নেতা' বলে স্বীকার করে। হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা)—এই তিনজন শ্রেষ্ঠ নবীই তাঁর বংশজাত, তাঁর প্রজ্জ্বলিত আলোকবির্তকা থেকে সমগ্র দুনিয়ায় সত্যের জ্যোতি বিস্তার করেছে। চার হাজার বছরেরও বেশীকাল পূর্বে তিনি ইরাকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন সমগ্র দুনিয়ার মানুষ আল্লাহকে ভুলে বসেছিল। পৃথিবীর একজন মানুষও তাঁর প্রকৃত মালিক ও প্রভুকে জানতো না এবং তাঁর সামনে বন্দেগী ও আনুগত্যের ভাবধারায় মস্তক অবনত করতো না। যে জাতির মধ্যে তাঁর জন্ম হয়েছিল সে জাতির লোকেরা যদিও তদানীন্তন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উন্নত জাতি ছিল ; কিন্তু পথভ্রষ্ট হওয়ার দিক দিয়েও তারাই ছিল অগ্রনেতা। সৃষ্ট জীব কখনও মা'বুদ বা উপাস্য হতে পারে না। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিল্প-ভাস্কর্যে চরম উন্নতি লাভ করা সত্ত্বেও এ সহজ কথাটি তারা বুঝতে পারতো না। তাই তারা আকাশের তারকা এবং (মাটি বা পাথর নির্মিত) মূর্তির পূজা করতো। জ্যোতিষ শাস্ত্র, ভাল-মন্দ জানার জন্য 'ফাল' গ্রহণ, অজ্ঞাত কথা বলা, যাদু বিদ্যা প্রয়োগ এবং দোআ তাবীয ও ঝাড়-ফুঁকের খুবই প্রচলন ছিল। বর্তমানকালের হিন্দু পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণগণের মত তখনকার সমাজে ঠাকুর-পুরোহিতেরও একটি শ্রেণী ছিল। তারা মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করতো, অপর লোকের পক্ষ থেকে পূজা করে দিত, বিপদ-আপদে বা আনন্দে-খুশীতে তারা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করতো এবং 'অজ্ঞাত' কথা বলে লোকদেরকে প্রতারিত করতো। সাধারণ লোকেরা এদেরকেই ভাগ্য নির্ধারক বলে মনে করতো। তারা এদেরই অংগুলি নির্দেশে ওঠা-বসা করতো এবং চুপচাপ থেকে নিতান্ত অন্ধের ন্যায় তাদের মনের লালসা পূর্ণ করে যেতো।

কারণ তারা মনে করতো যে, দেবতাদের ওপরে এসব পূজারীর কর্তৃত্ব রয়েছে। এরা খুশী হলে আমাদের প্রতি দেবতাদের অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। অন্যথায় আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। এ পূজারী দলের সাথে তৎকালীন রাজা-বাদশাহদের গোপন যোগাযোগ ছিল। জনসাধারণকে দাসানুদাস বানিয়ে রাখার ব্যাপারে রাজা-বাদশাহ ও পূজারীগণ পরস্পর সাহায্য করতো। একদিকে সরকার পূজারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো এবং অন্যদিকে পূজারীগণ জনগণের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দিত যে, রাজা-বাদশাহরাও 'আল্লাহর' মধ্যে গণ্য ; তারা দেশ ও প্রজাদের একচ্ছত্র মালিক, তাদের মুখের কথাই আইন এবং প্রজাদের জান-মালের ওপর তাদের 'যা ইচ্ছা' করার অধিকার আছে। শুধু এতটুকুই নয়, রাজা-বাদশাহের সামনে (সিজদায় মাথা নত করা সহ) তাদের বন্দেগীর যাবতীয় অনুষ্ঠানই পালন করা হতো—যেন প্রজাদের মন-মগযের ওপর তাদের প্রভুত্বের ছাপ স্থায়ীভাবে অংকিত হয়ে যায়।

এহেন পরিবেশের মধ্যে এবং এ জাতির কোন এক বংশে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্ম। আরও মজার ব্যাপার এই যে, যে বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল, সেই বংশটাই ছিল পেশাদার ও বংশানুক্রমিক পূজারী। তাঁর বাপ-দাদা ছিলেন আপন বংশের পণ্ডিত-পুরোহিত ব্রাহ্মণ। কাজেই একজন ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করা সম্ভব, হযরত ইবরাহীম (আ)-ও ঠিক তাই লাভ করলেন। সেই ধরনের কথা-বার্তা শৈশবকাল হতেই তাঁর কানে প্রবেশ করতো। তিনি তার ভাই-ভগ্নীদের মধ্যে পীর ও পীরযাদাদের মতো আড়ম্বর এবং বড়লোকী চাল-চলন দেখতে পেতেন। স্থানীয় মন্দিরের পৌরহিত্যের মহাসম্মানিত গদি তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। সেই গদিতে বসলে তিনি অনায়াসেই 'জাতির নেতা' হয়ে বসতে পারতেন। তাঁর গোটা পরিবারের জন্য চারদিক থেকে যেসব ভেট-বেগাড় আর নযর-নিয়াজ এসে জড়ো হতো, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্যও তা বর্তমান ছিল। দেশের লোক নিজেদের চিরকালীন অভ্যাস অনুসারে তাঁর সামনে এসে হাত জোড় করে বসার এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা ভরে মাথানত করার জন্য প্রস্তুত ছিল। দেবতার সাথে সম্পর্ক পেতে অজ্ঞাত কথা বলার ভান করে তিনি সাধারণ কৃষক থেকে তদানীন্তন বাদশাহ পর্যন্ত সকলকে আজ্ঞানুবর্তী গোলাম বানিয়ে নিতে পারতেন। এই অন্ধকারে যেখানে সত্য জ্ঞানসম্পন্ন সত্যের অনুসারী একজন মানুষ কোথাও ছিল না সেখানে একদিকে তাঁর পক্ষে সত্যের আলো লাভ করা যেমন সম্ভবপর ছিল না তেমনি ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক উভয় দিক দিয়েই এ বিরাট স্বার্থের ওপর পদাঘাত করে নিছক সত্যের জন্য দুনিয়া জোড়া বিপদের গর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হওয়াও কোন সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তাঁকে 'স্বতন্ত্র মাটি' দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছিল। জ্ঞান হওয়ার সাথে সাথেই তিনি ভাবতে শুরু করলেন চন্দ্র, সূর্য, তারকা নিতান্ত গোলামের মতই উদয়-অস্তের নিয়ম অনুসরণ করছে, মূর্তি তো মানুষের নিজের হাতে পাথর দিয়ে গড়া, দেশের বাদশাহ আমাদের ন্যায় একজন সাধারণ মানুষ, এরা রব হতে পারে কেমন করে ? যেসব জিনিস নিজের ইচ্ছায় একটুও নড়তে পারে না, নিজের সাহায্য করার ক্ষমতাও যেসবের মধ্যে নেই, জীবন ও মৃত্যুর ওপর যাদের বিন্দুমাত্র হাত নেই, তাদের সামনে মানুষ কেন মাথা নত করবে ? মানুষ কেন তাদের দাসত্ব ও পূজা-উপাসনা করবে ? প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য তাদের কাছে প্রার্থনা কেন করবে ? তাদের শক্তিকে কেন ভয় করবে ? এবং তাদের গোলামীই বা কেন করবে ? আকাশ ও পৃথিবীতে যত কিছুই আমরা দেখতে পাই, যেসব জিনিস সম্পর্কে কোন না কোন ভাবে আমরা ওয়াকিফহাল, তার মধ্যে একটি জিনিসও স্বাধীন নয়, নিরপেক্ষ নয়, অক্ষয়-চিরস্থায়ীও নয়। এদের প্রত্যেকটিরই অবস্থা যখন এরূপ তখন এরা মানুষের 'রব বা প্রভু' কিরূপে হতে পারে ? এদের কেউই যখন আমাকে সৃষ্টি করেনি, আমার জীবন-মৃত্যু ও লাভ-ক্ষতির এখতিয়ার যখন এদের কারো হাতে নেই, আমার রিযক ও জীবিকার চাবিকাঠি যখন এদের কারো হাতে নয়, তখন এদের কাউকেও আমি 'রব' বলে স্বীকার করবো কেন ? এবং তার সামনে মাথা নত করে দাসত্ব ও উপাসনাই বা কেন করবো ? বস্তুত আমার 'রব' কেবল তিনিই হতে পারেন যিনি সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন, সকলেই যার মুখাপেক্ষী এবং যার হাতে সকলেরই জীবন-মৃত্যু ও লাভ-ক্ষতির উৎস নিহিত রয়েছে। এসব কথা ভেবে হযরত ইবরাহীম (আ) জাতির উপাস্য মূর্তিগুলোকে পূজা না করে বরং পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করলেন এবং এ সিদ্ধান্তে পৌছেই তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ

اِنِّیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ -

"তোমারা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বলে মনে কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ۝ (الانعام : ٧٩)

"আমি সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বিশেষভাবে কেবল সেই মহান সত্তাকেই ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য নির্দিষ্ট করলাম, যিনি সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই।"

এ বিপ্লবাত্মক ঘোষণার পর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ওপর বিপদ-মুসিবতের পাহাড় ভেংগে পড়লো। পিতা বললেন, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করবো, বাড়ী হতে তাড়িয়ে দেব। সমগ্র জাতি বলে ওঠলো আমরা কেউ তোমাকে আশ্রয় দেব না। স্থানীয় সরকারও তার বিরুদ্ধে লেগে গেল, বাদশাহর সামনে মামলা দায়ের করা হলো, কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) একাকী এবং নিঃসংগ হয়েও সত্যের জন্য সকলের সামনেই মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন। পিতাকে বিশেষ সম্মানের সাথে বললেন ঃ "আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি। আপনি তা আদৌ জানেন না। কাজেই আমি আপনাদের কথা শুনবো না, তার পরিবর্তে আমার কথা আপনাদের সকলের শোনা উচিত।"

জাতির লোকদের হুমকির উত্তরে নিজ হাতে সবগুলো মূর্তি ভেংগে ফেলে তিনি প্রমাণ করলেন যে, তোমরা যাদের পূজা করো, তাদের কোন ক্ষমতা নেই। বাদশাহর প্রকাশ্য দরবারে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন ঃ "তুমি আমার 'রব' নও, আমার 'রব' তিনিই যাঁর মুষ্টিতে তোমার আমার সকলেরই জীবন ও মৃত্যু নিহিত রয়েছে এবং যাঁর নিয়মের কঠিন বাঁধনে চন্দ্র, সূর্য সবই বন্দী হয়ে আছে।" রাজ দরবার থেকে শেষ পর্যন্ত ফায়সালা হলো, ইবরাহীম (আ)-কে জীবন্ত জ্বালিয়ে ভস্ম করা হবে। কিন্তু ইবরাহীম (আ)-এর দিল ছিল পর্বত অপেক্ষা অধিকতর শক্ত—একমাত্র আল্লাহর ওপরেই ছিল তাঁর ভরসা। তাই এ ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতেও তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে প্রস্তুত হলেন। অতপর আল্লাহ তাআলা যখন তাঁকে কাফেরদের অগ্নিকুণ্ড হতে মুক্তি দিয়েছিলেন তখন তিনি জন্মভূমি, জাতি, আত্মীয়-বান্ধব সবকিছু পরিত্যাগ করে শুধু নিজের স্ত্রী ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে সাথে নিয়ে পথে পথে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যাঁর জন্য ঘরে পৌরোহিত্যের গদি অপেক্ষা করছিলো, সেই গদিতে বসে যিনি গোটা জাতির পীর হয়ে যেতে পারতেন এবং সেই গদিকে যিনি বংশানুক্রমিকভাবে নিজের সম্পত্তি বানিয়ে নিতে পারতেন, তিনি নিজের ও নিজের সন্তান সন্ততির জন্য নির্বাসন, সহায়-সম্বল হীনতার নিদারুণ দুঃখ-মসিবতকেই শ্রেয় মনে করে গ্রহণ করলেন। কারণ দুনিয়াবাসীকে অসংখ্য 'মিথ্যা রবের' দাসত্ব নিগড়ে বন্দী করে সুখের জীবন যাপন করা তিনি মাত্রই বরদাশত করতে পারলেন না। বরং তার পরিবর্তে তিনি একমাত্র প্রকৃত রবের দাসত্ব কবুল করে সমগ্র দুনিয়াকে সেই দিকে আহ্বান জানাতে লাগলেন এবং এ 'অপরাধে' (?) তিনি কোথাও একটু শান্তিতে বসবাস করতে পারলেন না।

জন্মভূতি থেকে বের হয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিসর এবং আরব দেশসমূহে ঘুরতে-ফিরতে লাগলেন। এই ভ্রমণ ব্যাপদেশ তাঁর ওপর অসংখ্য বিপদ এসেছে, ধন-সম্পদ বা টাকা-পয়সা তাঁর সাথে কিছু

ছিল না। বিদেশে গিয়েও তিনি রুযি-রোযগার করার জন্য একটু চিন্তা-ভাবনা করেননি। রাত-দিন তিনি কেবল একটি চিন্তা করতেন, দুনিয়ার মানুষকে অসংখ্য রবের গোলামীর নাগপাশ থেকে মুক্ত করে কিরূপে একমাত্র আল্লাহর বান্দায় পরিণত করা যেতে পারে। এই খেয়াল ও চিন্তা-ভারাক্রান্ত মানুষটিকে যখন তাঁর পিতা এবং নিজ জাতি মোটেই সহ্য করলো না, তখন তাঁকে আর কে বরদাশত করতে পারে? কোন্ দেশের লোক তাঁকে আদর-অভ্যর্থনা জানাবে? সকল স্থানে সেই একই ধরনের মন্দিরের পুরোহিত আর খোদায়ীর দাবীদার রাজা-বাদশাহরাই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল এবং সর্বত্র একই ধরনের অজ্ঞ-মূর্খ জনসাধারণ বাস করতো, যারা এই 'মিথ্যা খোদাদের' গোলামীর জালে বন্দী হয়েছিল। এদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কি করে শান্তিতে দিন কাটাতে পারে, যিনি নিজের রব ছাড়া অন্য কারো গোলামী করতে প্রস্তুত ছিলেন না। যিনি অন্য লোকদেরও বলে বেড়াতেন যে, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কেউ মালিক, মনিব ও প্রভু নেই, সকলের প্রভুত্ব ও খোদায়ীর আসন চূর্ণ করে কেবলমাত্র আল্লাহর বান্দারূপে জীবনযাপন কর। ঠিক এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ) কোথাও শান্তিতে বসবাস করতে পারেননি। বছরের পর বছর ধরে তিনি উদভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। কখনও কেনানের জনপদে, কখনও মিসরে এবং কখনও আরবের মরুভূমিতে গিয়ে পৌঁছেছেন। এভাবেই তাঁর গোটা যৌবনকাল অতিবাহিত হয়ে গেল, কালো চুল সাদা হয়ে গেল।

জীবনের শেষ ভাগে নব্বই বছর বয়স পূর্ণ হতে যখন মাত্র চারটি বছর বাকী ছিল এবং সন্তান লাভের কোন আশাই যখন ছিল না তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে সন্তান দান করলেন। কিন্তু তখনও এই আল্লাহর বান্দা এতটুকু চিন্তিত হয়ে পড়েননি যে, নিজের জীবনটা তো আশ্রয়হীনভাবে কেটে গেছে, এখন অন্তত ছেলে-পেলেদেরকে একটু রুজী-রোযগারের যোগ্য করে তুলি। না, এসব চিন্তা তাঁর মনে উদয় হয়নি। বরং এই বৃদ্ধ পিতার মনে একটি মাত্র চিন্তাই জেগেছিল, তা এই যে, যে কর্তব্য সাধনে তিনি নিজের জীবন অতিবাহিত করেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর সেই কর্তব্য পালন করার এবং তাঁর দাওয়াত চারদিকে প্রচার করার মত লোকের বিশেষ অভাব রয়েছে। ঠিক এ জন্য তিনি আল্লাহর কাছে সন্তান কামনা করেছিলেন এবং আল্লাহ যখন তাঁকে সন্তান দান করলেন, তখন তিনি তাকে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কাজ চালিয়ে যাবার উপযোগী করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। এই 'পূর্ণ মানুষ'টির জীবন একজন সত্যিকার মুসলমানের আদর্শ জীবন ছিল। যৌবনের সূচনাতেই—বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই যখন তিনি তাঁর রবকে চিনতে পারলেন তখন আল্লাহ তাঁকে বলেছিলেন ঃ أَسْلِمْ –ইসলাম গ্রহণ কর—স্বেচ্ছায় আমার কাছে

আত্মসমর্পণ কর, আমার দাসত্ব স্বীকার করো। তিনি তখন উত্তরে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন ঃ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ –আমি ইসলাম কবুল করলাম, আমি সারাজাহানের প্রভুর উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করলাম, নিজেকে তাঁর কাছে সোপর্দ করলাম। সমগ্র জীবন ভরে একথা ও এ ওয়াদাকে এই সাচ্চা মানুষটি সবদিক দিয়ে পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। তিনি রাব্বুল আলামীনের জন্য শত শত বছরের পৈতৃক ধর্ম এবং তার যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান ও আকীদা-বিশ্বাস পরিত্যাগ করেছেন। পৌরহিত্যের গদিতে বসলে তিনি যেসব সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারতেন তা সবই তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। নিজের বংশ-পরিবার, নিজের জাতি ও মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন। নিজের জীবনকে উপেক্ষা করে আগুনের বুকে ঝাঁপ দিয়েছেন। দেশত্যাগ ও নির্বাসনের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন, দেশের পর দেশ পরিভ্রমণ করেছেন, নিজের জীবনের এক একটি মুহূর্তকে রাব্বুল আলামীনের দাসত্ব আনুগত্যের কাজে এবং তাঁর দ্বীন ইসলামের প্রচারে কাটিয়েছেন। বৃদ্ধ বয়সে যখন সন্তান লাভ হলো তখন তাঁর জন্যও এ ধর্ম এবং এ কর্তব্যই নির্ধারিত করলেন। কিন্তু এসব কঠিন পরীক্ষার পর আর একটি শেষ ও কঠিন পরীক্ষা অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ) সবকিছু অপেক্ষা রাব্বুল আলামীনকেই বেশী ভালবাসেন কিনা, তার ফায়সালা হতে পারতো না। সেই কঠিন এবং কঠোর পরীক্ষাও সামনে এসে পড়লো। বৃদ্ধ বয়সে একেবারে নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর তাঁর যে সন্তান লাভ হয়েছিল, সেই একমাত্র সন্তানকেও আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করতে পারেন কিনা, তারই পরীক্ষা নেয়া হলো। হযরত ইবরাহীম (আ) এ পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হলেন এবং আল্লাহর নির্দেশ লাভ করার সাথে সাথে যখন তিনি নিজের পুত্রকে নিজের হাতে যবেহ করতে প্রস্তুত হলেন, তখন চূড়ান্তরূপে ঘোষণা করা হলো যে, এখন তুমি প্রকৃত মুসলিম হওয়ার দাবীকে সত্য বলে প্রমাণ করেছো। আল্লাহর কাছেও তাঁর এই কুরবানী কবুল হলো এবং তাকে বলে দেয়া হলো যে, এখন তোমাকে সারা দুনিয়ার ইমাম বা নেতা বানিয়ে দেয়া যেতে পারে—এখন তুমি সেই জন্য সম্পূর্ণরূপে যোগ্য হয়েছো। কুরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়াতে একথাই বলা হয়েছে ঃ

وَاِذِ ابْتَلٰۤى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ

اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ۝

"এবং যখন ইবরাহীমকে তার 'রব' কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা করলেন এবং সে সেই পরীক্ষায় ঠিকভাবে উত্তীর্ণ হলো তখন তাকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, আমি তোমাকে সমগ্র মানুষের ইমাম (অগ্রবর্তী নেতা) নিযুক্ত

করছি। তিনি বললেন, আমার বংশধরদের প্রতিও কি এই হুকুম? আল্লাহ তাআলা বললেন ঃ যালেমদের জন্য আমার ওয়াদা প্রযোজ্য নয়।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ১২৪)

এভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দুনিয়ার নেতৃত্ব দান করা হলো এবং তাঁকে ইসলামের বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের 'নেতা' নিযুক্ত করা হলো। এখন এ আন্দোলনকে অধিকতর সম্প্রসারিত করার জন্য এবং বিভিন্ন এলাকায় দায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য তাঁর কয়েকজন সহকর্মী একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়লো। এ ব্যাপারে তিন ব্যক্তি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর 'দক্ষিণ হাত' স্বরূপ কাজ করেছেন। একজন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত (আ), দ্বিতীয় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ) যিনি—আল্লাহ তাঁর জীবন চান জানতে পেরে অত্যন্ত খুশী ও আগ্রহের সাথে—যবেহ হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন এবং তৃতীয় হচ্ছেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র হযরত ইসহাক (আ)।

ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি 'সাদুম' (ট্রান্স জর্দান) এলাকায় বসালেন। এখানে সেকালের সর্বাপেক্ষা ইতর—লম্পট জাতি বাস করতো। সেখানে একদিকে সেই জাতির নৈতিকতার সংস্কার সাধন এবং সেই সাথে দূরবর্তী এলাকা-সমূহেও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোই ছিল তাঁর কাজ। ইরান, ইরাক এবং মিসরের ব্যবসায়ী দল এই এলাকা দিয়েই যাতায়াত করতো। কাজেই এখানে বসে উভয় দিকেই ইসলাম প্রচারের কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করা তাঁর পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হয়েছিল।

কনিষ্ঠ পুত্র হযরত ইসহাক (আ)-কে তিনি কেনান বা ফিলিস্তিন এলাকায় রাখলেন। এটা সিরিয়া ও মিসরের মধ্যবর্তী স্থান, তদপুরি এটা সমুদ্রো-পকূলবর্তী এলাকা বলে এখান থেকেই অন্যান্য দেশ পর্যন্ত ইসলামের আওয়াজ পৌঁছানো সহজ ছিল। এ স্থান থেকেই হযরত ইসহাক (আ)-এর পুত্র হযরত ইয়াকুব (আ) যার নাম ছিল ইসরাঈল এবং পৌত্র হযরত ইউসুফ (আ)-এর মারফতে ইসলামী আন্দোলন মিসর পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-কে হিজাযের মক্কা নগরীতে বসালেন এবং দীর্ঘকাল যাবত নিজেই তাঁর সাথে থেকে আরবের কোণে কোণে ইসলামের শিক্ষা বিস্তার করেছিলেন। তারপর এখানেই পিতা-পুত্র দু'জনে মিলে ইসলামী আন্দোলনের বিশ্ববিখ্যাত কেন্দ্র খানায়ে কা'বা প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহ তাআলা নিজেই এ কেন্দ্র নির্দিষ্ট করেছিলেন, নিজেই এটা গড়ে তোলার স্থান ঠিক করেছিলেন। খানায়ে কা'বা সাধারণ মসজিদের ন্যায় নিছক

ইবাদাতের স্থান নয়, প্রথম দিন থেকেই এটা দ্বীন ইসলামের বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের প্রচার কেন্দ্ররূপে নির্ধারিত হয়েছিল। এই কা'বা ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, পৃথিবীর দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ থেকে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী সকল মানুষ এখানে এসে মিলিত হবে এবং সংঘবদ্ধভাবে এক আল্লাহর ইবাদাত করবে, আবার এখান থেকেই ইসলামের বিপ্লবী পয়গাম নিয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবে। বিশ্ব মুসলিমের এ সম্মেলনেরই নাম হলো 'হজ্জ'। এই ইবাদাত কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা কি করে হলো, কোন সব পূত ভাবধারা এবং দোআ প্রার্থনা সহকারে পিতা-পুত্রে মিলে এ ইমারত তৈয়ার করেছিলেন আর 'হজ্জ' কিভাবে শুরু হলো তার বিস্তারিত বিবরণ কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ○ فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا (ال عمران : ٩٦-٩٧)

"মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তা মক্কার ঘর তাতে সন্দেহ নেই। এটা অত্যন্ত পবিত্র, বরকতপূর্ণ এবং সারা দুনিয়ার জন্য হেদায়াতের কেন্দ্রস্থল। এতে আল্লাহর প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বর্তমান রয়েছে, 'মাকামে ইবরাহীম' রয়েছে এবং যে-ই এখানে প্রবেশ করবে সে-ই নিরাপদে থাকবে।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৬-৯৭)

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ط

"আমরা মানুষের জন্য কিরূপে বিপদশূন্য ও শান্তিপূর্ণ হেরেম তৈরী করেছি তা কি তারা দেখতে পায়নি ? অথচ তার চারপাশে লোক লুণ্ঠিত ও ছিনতাই হয়ে যেতো।"-(সূরা আল আনকাবূত ঃ ৬৭)

অর্থাৎ আরবের চারদিকে যখন লুঠ-তরাজ, মার-পিট এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অশান্তির সয়লাব বয়ে যেত তখনও এই হেরেমে সর্বদা শান্তি বিরাজ করতো। এমন কি দুর্ধর্ষ মরু বেদুঈন যদি এর সীমার মধ্যে তার পিতৃহন্তাকে দেখতে পেত, তবুও এর মধ্যে বসে তাকে স্পর্শমাত্র করতে সাহস পেত না।

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ط وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى ط وَعَهِدْنَآ اِلٰى اِبْرٰهِمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ○ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط

"এবং স্মরণ কর, যখন আমরা এ ঘরকে লোকদের কেন্দ্র ও নিরাপদ আশ্রয় স্থল বানিয়েছিলাম এবং ইবরাহীমের ইবাদাতের স্থানকে 'মুসাল্লা' (জায়নামায) বানাবার নির্দেশ দিয়েছিলাম আর তাওয়াফকারী, অবস্থানকারী এবং নামাযীদের জন্য আমার ঘরকে পাক ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। পরে যখন ইবরাহীম দোয়া করলো, হে পালনকর্তা ! আপনি এই শহরকে শান্তিপূর্ণ জনপদে পরিণত করুন এবং এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী তাদের জন্য ফল-মূল দ্বারা জীবিকার সংস্থান করে দিন।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ১২৫-১২৬)

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ط رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ص وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ج اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ (البقرة . ١٢٧-١٢٩)

"এবং স্মরণ কর, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এই ঘরের ভিত্তি স্থাপনকালে দোয়া করছিল ঃ পরওয়ারদিগার ! আমাদের এই চেষ্টা কবুল কর, তুমি সবকিছু জান এবং সবকিছু শুনতে পাও। পরওয়ারদিগার ! তুমি আমাদের দু'জনকেই মুসলিম—অর্থাৎ তোমার অনুগত কর এবং আমাদের বংশাবলী থেকে এমন একটি জাতি তৈরী কর যারা একান্তভাবে তোমারই অনুগত হবে। আমাদেরকে তোমার ইবাদাত করার পন্থা বলে দাও, আমাদের প্রতি ক্ষমার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়। পরওয়ারদিগার! তুমি সে জাতির প্রতি তাদের মধ্য থেকে এমন একজন রাসূল পাঠাও যিনি তাদেরকে তোমার বাণী পড়ে শুনাবে, তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞানের শিক্ষা দিবে এবং তাদের চরিত্র সংশোধন করবে। নিশ্চয় তুমি সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন এবং বিজ্ঞ।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১২৭-১২৯)

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ○ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ج فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ج وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ

بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ○

"এবং স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম দোয়া করেছিল ঃ হে আল্লাহ ! এ শহরকে শান্তিপূর্ণ বানিয়ে দাও, আমাকে এবং আমার সন্তানকে মূর্তিপূজার শিরক থেকে বাঁচাও। হে আল্লাহ ! এ মূর্তিগুলো অসংখ্য লোককে গোমরাহ করেছে। অতএব, যে আমার পন্থা অনুসরণ করবে সে আমার, আর যে আমার পন্থার বিপরীত চলবে—তখন তুমি নিশ্চয়ই বড় ক্ষমাশীল ও দয়াময়। পরওয়ারদিগার ! আমি আমার বংশধরদের একটি অংশ তোমার এই মহান ঘরের নিকট, এ ধূসর মরুভূমিতে এনে পুনর্বাসিত করেছি—এ উদ্দেশ্যে যে, তারা নামাযের ব্যবস্থা কায়েম করবে। অতএব, হে আল্লাহ ! তুমি লোকদের মনে এতদূর উৎসাহ দাও যেন তারা এদের দিকে দলে দলে চলে আসে এবং ফল-মূল দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর। হয়ত এরা তোমার কৃতজ্ঞ বান্দা হবে।"–(সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৫-৩৭)

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ○ وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ○ لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ○ (الحج : ٢٦-٢٨)

"এবং স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমের জন্য এই ঘরের স্থান ঠিক করেছিলাম —একথা বলে যে, এখানে কোন প্রকার শিরক করো না এবং আমার ঘরকে তাওয়াফকারী ও নামাযীদের জন্য পাক-সাফ করে রাখ। আর লোকদেরকে হজ্জ করার জন্য প্রকাশ্যভাবে আহ্বান জানাও—তারা যেন তোমার কাছে আসে, পায়ে হেঁটে আসুক কিংবা দূরবর্তী স্থান থেকে কৃশ উটের পিঠে চড়ে আসুক। এখানে এসে তারা যেন দেখতে পায় তাদের জন্য দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণের কত সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর দেয়া জন্তুগুলোকে আল্লাহর নামে কুরবানী করবে, তা থেকে নিজেরাও খাবে এবং দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদেরও খেতে দেবে।"–(সূরা আল হজ্জ ঃ ২৬-২৮)

'হজ্জ' শুরু হওয়ার এটাই গোড়ার ইতিহাস। এটাকে ইসলামের পঞ্চম রোকন (স্তম্ভ) হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, দুনিয়ায় যে নবী বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন, মক্কা-ই ছিল তাঁর প্রধান কার্যালয় (Head Quarter) পবিত্র কা'বাই ছিল এর প্রধান কেন্দ্র—যেখান থেকে ইসলাম দুনিয়ার দূরবর্তী অঞ্চলে প্রচারিত হতো। আর দুনিয়ায় যারাই এক আল্লাহর বন্দেগী করতে চাবে এবং বাস্তব কর্মজীবনে তাঁর আনুগত্য করে চলবে, তাঁরা যে জাতি আর যে দেশেরই অধিবাসী হোক না কেন, সকলেই একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে প্রতি বছর এসে সমবেত হবে, এজন্য 'হজ্জ' করার পন্থা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়া যাবে যে, চাকা যেমন নিজ অক্ষের চতুর্দিকে ঘোরে, মুসলমানদের জীবনও তেমনি আপন কেন্দ্রেরই চতুর্দিকে আবর্তিত হয়—এই গূঢ় রহস্যেরই বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে হজ্জ।

হজ্জের ইতিহাস

কিভাবে এবং কোন উদ্দেশ্যে হজ্জ শুরু হয়েছিল সে কথা পূর্বের প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। হযরত ইবরাহীম (আ) মক্কায় ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-কে এখানে বসিয়েছিলেন, যেন তার পরে তিনি এ আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারেন, একথাও পূর্বের প্রবন্ধে বলা হয়েছে। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পর তার বংশধরগণ কতকাল দ্বীন ইসলামের পথে চলেছে তা আল্লাহ তাআলাই অবগত আছেন। কিন্তু পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই তারা যে পূর্ববর্তী মহাপুরুষদের শিক্ষা ও প্রদর্শিত পথ ভুলে গিয়েছিল এবং অন্যান্য 'জাহেল' জাতির ন্যায় সর্বপ্রকার গুমরাহী ও পাপ-প্রথার প্রচলন করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। যে কা'বা ঘরকে কেন্দ্র করে এককালে এক আল্লাহর ইবাদাতের দাওয়াত ও প্রচার শুরু হয়েছিল, সেই কা'বা ঘরে শত শত মূর্তি স্থাপন করা হলো। এমনকি, মূর্তি পূজা বন্ধ করার সাধনা ও আন্দোলনে যে হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর সারাটি জীবন অতিবাহিত হয়েছিল তাদের মূর্তি নির্মাণ করেও কা'বা ঘরে স্থাপন করা হয়েছিল। তাওহিদী ধর্মের অগ্রনেতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পরবর্তী বংশধরগণ লাত, মানাত, হুবাল, নসর, ইয়াগুস, উজ্জা, আসাফ, নায়েলা আরও অসংখ্য নামের মূর্তি প্রস্তুত করেছিল এবং সে সবের পূজা করছিল। চন্দ্র, বুধ, শুক্র, শনি ইত্যাদি গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা করতো। ভূত-প্রেত, ফেরেশতা এবং মৃত পূর্বপুরুষদের 'আত্মা'র পূজাও করতো। তাদের মূর্খতা এতদূর প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছিল যে, ঘর থেকে বের হবার সময় নিজেদের বংশের মূর্তি না পেলে পথ চলার সময় যে কোন রঙীন পাথর দেখতে পেতো তারা তারই পূজা শুরু করতো। পাথর না পেলে পানি ও মাটির সংমিশ্রণে একটি প্রতিমূর্তি বানিয়ে তার ওপর ছাগ দুগ্ধ ছিটিয়ে দিলেই তাদের মতে সেই নিষ্প্রাণ পিণ্ডটি খোদা হয়ে যেত এবং এরই পূজা করতো। যে পৌরোহিত্য ও ঠাকুরবাদের বিরুদ্ধে তাদের 'পিতা' হযরত ইবরাহীম (আ) সমগ্র ইরাকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তা-ই আবার তাদের ঘরে প্রবেশ করেছিল, কা'বাকে তারা মূর্তিপূজার আড্ডাখানা বানিয়ে নিজেরাই সেখানকার পুরোহিত সেজেছিল। হজ্জকে তারা 'তীর্থযাত্রা'র অনুরূপ বানিয়ে তাওহীদ প্রচারের কেন্দ্রস্থল কা'বা ঘর থেকে মূর্তিপূজার প্রচার শুরু করেছিল এবং পূজারীদের সর্বপ্রকার কলা-কৌশল অবলম্বন করে আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা লোকদের কাছ থেকে 'নযর-নিয়ায ও ভেট-বেগাড়' আদায় করতো। এভাবে ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) যে মহান কাজ শুরু

করেছিলেন এবং যে উদ্দেশ্যে তারা হজ্জ প্রথার প্রচলন করেছিলেন, তা সবই বিনষ্ট হয়ে গেল।

এই ঘোর জাহেলী যুগে হজ্জের যে চরম দুর্গতি হয়েছিল একটি ব্যাপার থেকে তা স্পষ্টরূপে অনুমান করা যায়। মক্কায় একটি বার্ষিক মেলা বসতো, আরবের বড় বড় বংশ ও গোত্রের কবি কিংবা 'কথক' নিজ নিজ গোত্রের খ্যাতি, বীরত্ব, শক্তি, সম্মান ও বদান্যতার প্রশংসায় আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলতো এবং পারস্পরিক গৌরব ও অহংকার প্রকাশের ব্যাপারে রীতিমত প্রতিযোগিতা করতো। এমন কি অপরের নিন্দার পর্যায়ও এসে যেত। সৌজন্য ও বদান্যতার ব্যাপারেও পাল্লা দেয়া হতো। প্রত্যেক গোত্র-প্রধান নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য ডেগ চড়াতো এবং একে অন্যকে হেয় করার উদ্দেশ্যে উটের পর উট যবেহ্ করতো। এ অপচয় ও অপব্যয়ের মূলে তাদের একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল ; তা এই যে, এ সময় কোন বদান্যতা করলে মেলায় আগত লোকদের মাধ্যমে আরবের সর্বত্র তাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে এবং কোন্ গোত্রপতি কতটি উট যবেহ করেছিল এবং কত লোককে খাইয়েছিল ঘরে ঘরে তার চর্চা শুরু হবে। এসব সম্মেলনে নাচ-গান, মদ পান, ব্যভিচার এবং সকল প্রকার নির্লজ্জ কাজ-কর্মের অনুষ্ঠান বিশেষ জাঁক-জমকের সাথে সম্পন্ন হতো। এ উৎসবের সময় এক আল্লাহর দাসত্ব করার কথা কারো মনে জাগ্রত হতো কিনা সন্দেহ। কা'বা ঘরের চতুর্দিকে তাওয়াফ করা হতো। কিন্তু তার পদ্ধতি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। নারী-পুরুষ সকলেই উলংগ হয়ে একত্রে ঘুরতো আর বলতো আমরা আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় যাব, যেমন অবস্থায় আমাদের মা আমাদেরকে প্রসব করেছে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে 'ইবাদাত' করা হতো, একথা ঠিক ; কিন্তু কিভাবে ? খুব জোরে হাততালি দেয়া হতো, বাঁশি বাজান হতো, শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হতো। আল্লাহর নামও যে সেখানে নেয়া হতো না, এমন নয়। কিন্তু কিরূপে ? তারা বলতো ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ

اِلاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ

"আমি এসেছি, হে আমার আল্লাহ ! আমি এসেছি, তোমার কেউ শরীক নেই ; কিন্তু যে তোমার আপন, সে তোমার অংশীদার। তুমি তারও মালিক এবং তার মালিকানারও মালিক।"

আল্লাহর নামে সেখানে কুরবানীও দেয়া হতো। কিন্তু তার পন্থা ছিল কত নিকৃষ্ট ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ। কুরবানীর রক্ত কা'বা ঘরের দেয়ালে লেপে দিত এবং এর

গোশত কা'বার দুয়ারে ফেলে রাখতো। কারণ, তাদের ধারণা মতে আল্লাহ এসব রক্ত ও গোশত তাদের কাছ থেকে কবুল করছেন (নাউযুবিল্লাহ)। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময়ই হজ্জের চার মাসে রক্তপাত হারাম করে দেয়া হয়েছিল এবং এ সময় সকল প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালের লোকেরা এ নিষেধ অনেকটা মেনে চলেছে বটে ; কিন্তু যুদ্ধ করতে যখন ইচ্ছা হতো, তখন তারা এক বছরের নিষিদ্ধ মাসগুলোকে 'হালাল' গণ্য করতো এবং পরের বছর তার 'কাযা' আদায় করতো।

এছাড়া অন্যান্য যেসব লোক নিজ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিল তারাও নিতান্ত মূর্খতার কারণে আশ্চর্য রকমের বহু রীতিনীতির প্রচলন করেছিল। একদল লোক কোন সম্বল না নিয়ে হজ্জে যাত্রা করতো এবং পথে পথে ভিক্ষা মেগে দিন অতিবাহিত করতো। তাদের মতে এটা খুবই পুণ্যের কাজ ছিল। মুখে তারা বলতো—"আমরা আল্লাহর ওপর তায়াক্কুল করেছি, আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার জন্য যাচ্ছি—দুনিয়ার সম্বল নেয়ার প্রয়োজন কি ?" হজ্জে গমনকালে ব্যবসা করা কিংবা কামাই-রোযগারের জন্য শ্রম করাকে সাধারণত নাজায়েয বলেই ধারণা করা হতো। অনেক লোক আবার হজ্জের সময় পানাহার পর্যন্ত বন্ধ করে দিত এবং এরূপ করাকেও তারা ইবাদাত বলে মনে করতো। কোন কোন লোক হজ্জে যাত্রা করলে কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ করে দিত। এর নাম ছিল 'হজ্জে মুছমিত' বা 'বোবা হজ্জ'। এভাবে আরও যে কত প্রকার ভ্রান্ত ও কুপ্রথার প্রচলন হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ লিখে সময় নষ্ট করতে চাই না।

এরূপ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা কম-বেশী দু' হাজার বছর পর্যন্ত ছিল। এ দীর্ঘ সময়ে আরব দেশে কোন নবীর আবির্ভাব হয়নি, আর কোন নবীর প্রকৃত শিক্ষাও সেই দেশে পৌঁছেনি। অবশেষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া পূর্ণ হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসলো। তিনি কা'বা ঘর প্রতিষ্ঠার সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন ঃ "হে আল্লাহ ! এ দেশে একজন নবী এ জাতির মধ্য থেকেই প্রেরণ কর, যে এসে তাদেরকে তোমার বাণী শুনাবে ; জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবে এবং তাদের নৈতিক চরিত্র সংশোধন করবে।" এ দোয়া আল্লাহর কাছে মঞ্জুর হয়েছিল, তাই তাঁরই অধস্তন পুরুষে একজন 'কামেল ইনসান' আবির্ভূত হলেন, যাঁর পাক নাম মুহাম্মাদ (সা) ইবনে আবদুল্লাহ।

হযরত ইবরাহীম (আ) যেরূপ পূজারী ও পুরোহিতের বংশে জন্মলাভ করেছিলেন, এই 'কামেল ইনসান' হযরত মুহাম্মাদ (সা)-ও অনুরূপ এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—শতাব্দীকাল ধরে যারা কা'বা ঘরের পৌরোহিত্য

করে আসছিল। একচ্ছত্রভাবে হযরত ইবরাহীম (আ) যেরূপ আপন বংশের পৌরোহিত্যবাদের ওপর আঘাত হেনেছিলেন, শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-ও ঠিক তেমনি প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন নিজ বংশীয় পৌরোহিত্য ও পণ্ডিতগিরির ওপর। শুধু তাই নয়, তাঁর আঘাতে তা একেবারে মূলোৎপাটিত হয়েছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) যেমন বাতিল মতবাদ ও সমগ্র মিথ্যা খোদায়ী ধ্বংস করা এবং এক আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করেছিলেন, শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-ও তাই করেছিলেন। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রচারিত প্রকৃত ও নির্মল দ্বীন ইসলামকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। একুশ বছরের চেষ্টায় তার এসব কাজ যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন আল্লাহ তাআলার হুকুমে কা'বা ঘরকেই তিনি সমগ্র দুনিয়ায় এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীদের কেন্দ্ররূপে স্থাপনের কথা ঘোষণা করলেন এবং দুনিয়ার সকল দিক থেকেই হজ্জ করার জন্য কা'বা ঘরে এসে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানালেন ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً ط وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○(ال عمران : ٩٧)

"মানুষের ওপর আল্লাহর হক এই যে, এ কা'বা ঘর পর্যন্ত আসার সামর্থ যাদের আছে তারা হজ্জ করার জন্য এখানে আসবে। যারা কুফরী করবে (অর্থাৎ সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করতে আসবে না), তারা জেনে রাখুক যে, আল্লাহ সৃষ্টিজগতের মুখাপেক্ষী নন।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৭)

এভাবে নব পর্যায়ে হজ্জ প্রবর্তন করার সাথে সাথে জাহেলী যুগে দু' হাজার বছর যাবত প্রচলিত যাবতীয় কুসংস্কার একেবারে বন্ধ করা হলো। কা'বা গৃহের মূর্তিগলো ভেংগে ফেলা হলো। আল্লাহ ছাড়া মূর্তির যে পূজা সেখানে হতো তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হলো। মেলা এবং সকল প্রকার তামাশা ও উৎসব নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো। আল্লাহর ইবাদাত করার সঠিক এবং স্বাভাবিক পদ্ধতি প্রচলন করা হলো, আল্লাহর আদেশ হলো ঃ

وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ ج وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ○

"(আল্লাহর স্মরণ এবং ইবাদাত করার,) যে পন্থা আল্লাহ তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, ঠিক তদনুযায়ী আল্লাহর স্মরণ (ও ইবাদাত) কর যদিও এর পূর্বে তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে (অর্থাৎ স্মরণ ও ইবাদাত করার সঠিক পন্থা জানতে না)।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৮)

সকল অন্যায় ও বাজে কর্মতৎপরতা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হলো ঃ

فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ لا وَلاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ ط (البقرة : ١٩٧)

"হজ্জ উপলক্ষে কোনরূপ ব্যভিচার, অশ্লীলতা, আল্লাহদ্রোহিতা, ফাসেকী কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বা যুদ্ধ-বিগ্রহ করা যাবে না।"

কাব্য আর কবিত্বের প্রতিযোগিতা, পূর্বপুরুষদের কাজ-কর্মের কথা নিয়ে গৌরব-অহংকার এবং পরের দোষ-ত্রুটি প্রচার করা বা গালাগাল দেয়া বন্ধ করা হলো ঃ

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَ كُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ط

"হজ্জের অনুষ্ঠানগুলো যখন সম্পন্ন হয়ে যাবে তখন তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণ যেভাবে বাপ-দাদার স্মরণ করতো ঠিক অনুরূপ কিংবা তদপেক্ষা বেশী করে তোমরা আল্লাহর স্মরণ কর।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২০০)

শুধু লোকদের দেখাবার জন্য বা খ্যাতি অর্জন করার যেসব বদান্যতা ও দানশীলতার গৌরব করা হতো তা সবই বন্ধ হলো এবং তদস্থলে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আমলের পশু যবেহ করার রীতি প্রচলিত হলো। কারণ এর ফলে গরীব হাজীদেরও কুরবানীর গোশত খাওয়ার সুযোগ মিলত।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا ج اِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ○ (الاعراف : ٣١)

"খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় করো না ; কারণ আল্লাহ তাআলা অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ৩১)

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ط (الحج : ٣٦)

"খালেছ আল্লাহর উদ্দেশ্যেই এবং তারই নামে এ জন্তুগুলোকে যবেহ কর। যবেহ করার পর যখন প্রাণ একেবারে বের হয়ে যাবে, তখন নিজেরাও তা খাও এবং ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্ত প্রার্থীকেও খেতে দাও।"
–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩৬)

কুরবানীর পশুর রক্ত খানায়ে কা'বার দেয়ালে মর্দন করা এবং গোশত নিক্ষেপ করার কুপ্রথা বন্ধ হলো। পরিষ্কার বলে দেয়া হলো ঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط

"এসব পশুর রক্ত বা গোশত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, তোমাদের তাকওয়া এবং পরহেযগারীই আল্লাহর কাছে পৌঁছতে পারে।"

-(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩৭)

উলংগ হয়ে তাওয়াফ করা একেবারে নিষিদ্ধ হয়ে গেল এবং বলা হলো ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ -(الاعراف : ٣٢)

"হে নবী ! আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য যেসব সৌন্দর্যবর্ধক জিনিস (অর্থাৎ পোশাক-পরিচ্ছদ) মনোনীত করেছেন, তা কে হারাম করলো ?"-(সূরা আল আরাফ ঃ ৩২)

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَايَامُرُ بِالْفَحْشَآءِ ط -(الاعراف : ٦٨)

"হে নবী ! আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ কখনও নির্লজ্জতার হুকুম দেন না।"-(সূরা আল আরাফ ঃ ৬৮)

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ -(الاعراف : ٣١)

"হে আদম সন্তান ! সকল ইবাদাতের সময় তোমাদের সৌন্দর্য গ্রহণ (পোশাক পরিধান) কর।"-(সূরা আল আরাফ ঃ ৩১)

হজ্জের নির্দিষ্ট মাসগুলোকে উল্টিয়ে দেয়া এবং নিষিদ্ধ মাসকে যুদ্ধের জন্য 'হালাল' মনে করাকে বিশেষ কড়াকড়ির সাথে বন্ধ করা হলো ঃ

اِنَّمَا النَّسِىْٓءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِئُوْا عِدَّةَ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَاحَرَّمَ اللّٰهُ ط

"নাসী কুফরীকে অধিকতর বাড়িয়ে দেয় (কুফরীর সাথে স্পর্ধাকে যোগ করে)। কাফেরগণ এভাবে আরও অধিক গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়। এক বছর এক মাসকে হালাল মনে করে আবার দ্বিতীয় বছর তার বদলে আর একটি মাসকে হারাম বেঁধে নেয়—যেন আল্লাহ্র নিষিদ্ধ মাসগুলোর সংখ্যা সমান থাকে। কিন্তু এরূপ কাজ করলে আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসকেই হালাল করা হয়।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ৩৭)

সম্বল না নিয়ে হজ্জযাত্রা করা নিষিদ্ধ হলো এবং পরিষ্কার বলে দেয়া হলো ঃ

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ز (البقرة : ١٩٧)

"হজ্জ গমনকালে সম্বল অবশ্যই নেবে। কারণ, (দুনিয়ার সফরের সম্বল না নেয়া আখেরাতের সম্বল নয়) আখেরাতের উত্তম সম্বল তো হচ্ছে তাকওয়া।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৭)

হজ্জের সময় ব্যবসা করা বা অন্য কোন উপায়ে রুজি-রোযগার করা নিতান্ত অপরাধের কাজ, আর এসব না করাকেই বড় পুণ্যের কাজ মনে করা হতো। আল্লাহ তাআলা এ ভুল ধারণার প্রতিবাদ করে নাযিল করলেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ ط (البقرة : ١٩٨)

"(হজ্জে গমনকালে) ব্যবসা করে আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ কিছু কামাই রোযগার করলে তাতে কোন অপরাধ নেই।"–(সূরা বাকারা ঃ ১৯৮)

'বোবা' হজ্জ এবং 'ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত' হজ্জ হতেও মানুষকে বিরত রাখা হলো। শুধু তাই নয়, এছাড়া জাহেলী যুগের আরও অসংখ্য কুসংস্কার নির্মূল করে দিয়ে তাকওয়া, আল্লাহর ভয়, পবিত্রতা এবং অনাড়ম্বরতাকে মানবতার পূর্ণাংগ আদেশ বলে ঘোষণা করা হলো, হজ্জযাত্রীদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো যে, তারা যেন ঘর থেকে বের হবার সময় নিজেদেরকে সকল প্রকার পার্থিব সম্পর্ক থেকে মুক্ত করে নেয়, নফসের খাহেশ ও লালসা যেন ত্যাগ করে, হজ্জগমন পথে স্ত্রী-সহবাসও যেন না করে, গালাগাল, কুৎসা রটানো, অশ্লীল উক্তি প্রভৃতি জঘন্য আচরণ থেকে যেন দূরে সরে থাকে। কা'বায় পৌছার যত পথ আছে, প্রত্যেক পথেই একটি স্থান নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সেই স্থান অতিক্রম করে কা'বার দিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে এহরাম বেঁধে গরিবানা পোশাক পরিধান করে নেবে। এতে আমীর গরীব সকলেই সমান হবে, পৃথক পৃথক কওম, গোত্র প্রভৃতির পার্থক্য ঘুচে যাবে। এবং সকলেই এক বেশে— নিতান্ত দরিদ্রের বেশে এক আল্লাহর সামনে বিনয় ও নম্রতার সাথে উপস্থিত হবে। এহরাম বাঁধার পর মানুষের রক্তপাত করা তো দূরের কথা, পশু শিকার করাও নিষিদ্ধ। মানুষের মধ্য থেকে পশু স্বভাব দূর করে শান্তিপ্রিয়তার গুণ সৃষ্টি এবং মানুষকে আধ্যাত্মিক ভাবধারায় মহীয়ান করে তোলাই এর মূল উদ্দেশ্য। হজ্জের চার মাসকালের মধ্যে যেন কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ না হয়, এজন্য এ চারটি মাসকে 'হারাম' করে দেয়া হয়েছে। এর ফলে কা'বা গমনের সমস্ত পথ নিরাপদ হবে ; হজ্জ যাত্রীদের পথে কোনরূপ বিপদের আশংকা থাকবে না। এরূপ পবিত্র ভাবধারা সহকারে তারা 'হেরেম শরীফে' প্রবেশ করবে—কোনরূপ রং-তামাশা, নাচ-গান এবং মেলা আর খেলা দেখার উদ্দেশ্যে নয়। এখানে প্রতি পদে পদে আল্লাহর স্মরণ—আল্লাহর নামের যিকর, নামায, ইবাদাত ও কুরবানী এবং কা'বা ঘরের প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করতে হয়। আর এখানে একটি মাত্র আওয়াযই মুখরিত হয়ে উঠে, 'হেরেম শরীফের' প্রাচীর আর পাহাড়ের চড়াই উৎরাইয়ের প্রতিটি পথে উচ্চারিত হয় ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ ـ

"তোমার ডাকেই হাজির হয়েছি, হে আল্লাহ ! আমি এসেছি, তোমার কোন শরীক নেই, আমি তোমারই কাছে এসেছি। সকল তা'রীফ প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। সব নেয়ামত তোমারই দান, রাজত্ব আর প্রভুত্ব সবই তোমার। তুমি একক— কেউ তোমার শরীক নেই।"

এরূপ পূত-পবিত্র এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠাপূর্ণ হজ্জ সম্পর্কে বিশ্বনবী ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ ـ

"যে ব্যক্তি খাঁটিভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করে এবং এ ব্যাপারে সকল প্রকার লালসা এবং ফাসেকী থেকে দূরে থাকে, সে সদ্যজাত শিশুর মতই (নিষ্পাপ হয়ে) ফিরে আসে।"

অতপর হজ্জের কল্যাণ ও কার্যকারিতা বর্ণনা করার পূর্বে হজ্জ কি রকমের ফরয, তা বলা আবশ্যক। আল্লাহ্ কালামে পাকে বলেন ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ط وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ٥ (ال عمران : ٩٧)

"আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌছার মত সামর্থ যার আছে, হজ্জ করা তার ওপর আল্লাহর একটি অনিবার্য নির্দিষ্ট 'হক'। এতদসত্ত্বেও যে তা অমান্য করবে সে কাফের এবং আল্লাহ দুনিয়া জাহানের মুখাপেক্ষী নন।"

এ আয়াতেই হজ্জ করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করাকে পরিষ্কার কুফরী বলা হয়েছে। নবী করীম (সা) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তার মধ্যে দু'টি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

مَنْ مَّلَكَ زَادًا وَّرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ اَنْ يَّمُوْتَ يَهُوْدِيًا اَوْ نَصْرَانِيًا ـ

"আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌছার জন্য পথের সম্বল এবং বাহন যার আছে সে যদি হজ্জ না করে, তবে এ অবস্থায় তার মৃত্যু ইহুদী ও নাসারার মৃত্যুর সমান বিবেচিত হবে।"

مَنْ لَّمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ اَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَاِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا ـ

"যার কোন প্রকাশ্য অসুবিধা নেই, কোন যালেম বাদশাও যার পথ রোধ করেনি এবং যাকে কোন রোগ অসমর্থ করে রাখেনি—এতদসত্ত্বেও সে যদি হজ্জ না করেই মরে যায়, তবে সে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হয়ে মরতে পারে।"

হযরত ওমর ফারুক (রা) এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ "সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যারা হজ্জ করে না, তাদের ওপর জিযিয়া কর আরোপ করতে ইচ্ছা হয়; কারণ তারা মুসলমান নয়, মুসলমান নয়।"

আল্লাহ তাআলার উল্লেখিত ইরশাদ এবং রাসূলে করীম (সা) ও তাঁর খলিফার এ ব্যাখ্যা দ্বারা প্রত্যেকেই বুঝতে পারেন যে, হজ্জ করা সামান্য ফরয নয় তা আদায় করা না করা মুসলমানদের ইচ্ছাধীন করে দেয়া হয়নি। বস্তুত যেসব মুসলমানের কা'বা পর্যন্ত যাওয়া আসার আর্থিক সামর্থ আছে, শারীরিক দিক দিয়েও যারা অক্ষম নয় তাদের পক্ষে জীবনের মধ্যে একবার হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য। তা না করে কিছুতেই মুক্তি নেই। দুনিয়ার যে কোণেই বাস করুক না কেন এবং যার ওপর ছেলে-মেয়ে ও কারবার কিংবা চাকরি-বাকরির যত বড় দায়িত্বই অর্পিত হোক না কেন, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও একজন মুসলমান যদি হজ্জকে এড়াতে চায় এবং অসংখ্য ব্যস্ততার অজুহাতে বছরের পর বছর তাকে ক্রমাগত পিছিয়ে দেয়—সময় থাকতে আদায় না করে, তবে তার ঈমান আছে কিনা সন্দেহ। আর যাদের সমগ্র জীবনও হজ্জ আদায় করার কর্তব্য পালনের কথা মনে জাগে না, দুনিয়ার দিকে দিকে, দেশে দেশে ঘুড়ে বেড়ায় —ইউরোপ-আমেরিকা যাতায়াতকালে হেজাযের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে—কা'বা ঘর যেখান থেকে মাত্র কয়েক ঘন্টার পথ, তবুও হজ্জ আদায় করার খেয়ালও তাদের মনে জাগ্রত হয় না—তারা কিছুতেই মুসলমান নয় ; মুসলমান বলে দাবী করার কোনই অধিকার তাদের নেই, দাবী করলেও সেই দাবী হবে মিথ্যা। আর যারা তাদেরকে মুসলমান মনে করে, তারা কুরআন শরীফের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ, জাহেল। এসব লোকের মনে যদি মুসলিম জাতির জন্য দরদ থাকে তবে থাকতে পারে ; কিন্তু তার কোনই সার্থকতা নেই। কারণ তাদের হৃদয়-মনে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর বিধানের প্রতি ঈমানের কোন অস্তিত্ব নেই, একথা স্বতঃসিদ্ধ।

হজ্জের বৈশিষ্ট্য

কুরআন শরীফের যেখানে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে হজ্জের জন্য সাধারণ দাওয়াত দেয়ার হুকুমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে এর প্রথম কারণ হিসেবে বলা হয়েছে ঃ لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ –মানুষ এসে দেখুক যে, এই হজ্জব্রত উদযাপনে তাদের জন্য কি কি কল্যাণ নিহিত রয়েছে অর্থাৎ হজ্জের সময় আগমন করে কা'বা শরীফে একত্রিত হয়ে তারা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করবে যে, তা তাদের জন্য বস্তুতই কল্যাণকর। কেননা, এতে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তা মানুষ নিজ চোখে দেখেই অনুধাবন করতে পারে। একটি বর্ণনা হতে জানা যায় যে, হযরত ইমাম আবু হানিফা (র) হজ্জ করার পূর্ব পর্যন্ত ঠিক বুঝতে পারেননি যে, ইসলামী ইবাদাতসমূহের মধ্যে কোনটি সর্বোত্তম ; কিন্তু যখনই তিনি হজ্জ করে তার অন্তনির্হিত কল্যাণ প্রত্যক্ষ করলেন, তখন স্পষ্ট কণ্ঠে বলে ওঠলেন, 'হজ্জ-ই সর্বোত্তম ইবাদাত'।

এখানে হজ্জের বৈশিষ্ট্য ও কল্যাণকারিতা সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাচ্ছে। দুনিয়ার মানুষ সাধারণত দু' প্রকারের ভ্রমণ করে থাকে। এক প্রকারের ভ্রমণ করা হয় রুযি-রোযগারের জন্য, আর এক প্রকারের ভ্রমণ হয় আনন্দ-স্ফূর্তি লাভ ও অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে। এ উভয় প্রকারের সফরেই মানুষের নিজের স্বার্থ ও প্রবৃত্তিই তাকে ভ্রমণে বের হতে উদ্বুদ্ধ করে। নিজের গরযেই ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে, নিজের কোন পার্থিব উদ্দেশ্যেই সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন হতে দূরে চলে যায়। আর এ ধরনের সফরে সে টাকা-পয়সা যা কিছুই খরচ করে নিজের উদ্দেশ্য লাভের জন্যই করে থাকে। কাজেই এসব সফরে মানুষকে আসলে কিছুই কুরবানী বা আত্মত্যাগ করতে হয় না। কিন্তু হজ্জ উপলক্ষে যে সফর করা হয় তা উল্লেখিত সফর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এটা নিজের কোন গরযে কিংবা নিজের প্রবৃত্তির লালসা পূরণ করার জন্য করা হয় না ; বস্তুত এটা করা হয় খালেছভাবে আল্লাহ তাআলার জন্য এবং আল্লাহর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূর্ণ করার মানসে। এজন্যই মানুষের মনে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর প্রেম ভালবাসা ও আল্লাহর ভয় জাগ্রত না হবে এবং আল্লাহর নির্ধারিত ফরযকে ফরয বলে মনে না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এ সফরে যাওয়ার জন্য কিছুতেই উদ্যোগী হতে পারে না। কাজেই যে ব্যক্তি একটি দীর্ঘকালের জন্য নিজের ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে এবং নিজের কারবারে ক্ষতি, অর্থ ব্যয় ও সফরের কষ্ট স্বীকার করে হজ্জের জন্য বের হবে, তার এভাবে বের হওয়াই প্রমাণ করে যে, তার মনে আল্লাহর ভয় ও ভালবাসা আছে। আল্লাহর ফরযকে সে ফরয বলে মনে করে এবং মানসিকভাবে সে

এতদূর প্রস্তুত যে, বাস্তবিকই যদি কখনো আল্লাহর পথে বের হওয়ার প্রয়োজন হয় তখন সে অনায়াসেই গৃহ ত্যাগ করতে পারবে। কষ্ট স্বীকার করতে পারবে, নিজের ধন-সম্পদ এবং আরাম-আয়েশ সবকিছু আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কুরবান করতে পারবে।

এ পবিত্র ইচ্ছা নিয়ে যখন সে হজ্জের সফরে যাবার জন্য তৈরী হয় তখন তার স্বভাব-প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের হয়ে যায়। তার অন্তরে বাস্তবিকই আল্লাহর প্রেমের উদ্দীপনা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। বস্তুত সে সেই দিকের জন্য পাগল হয়ে ওঠে, তার মনে তখন নেক ও পবিত্র ভাবধারা ছাড়া অন্য কিছুই জাগ্রত হতে পারে না।

সে পূর্বকৃত যাবতীয় গুনাহ থেকে তাওবা করে, সকলের কাছে ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চায়, পরের হক যা এ যাবত আদায় করেনি তা আদায় করে, কারণ ঋণের বোঝা নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হওয়া সে মোটেই পসন্দ করে না। সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় চিন্তা থেকে তার মন পবিত্র হয়ে যায়। স্বভাবতই তার মনের গতি মঙ্গলের দিকেই নিবদ্ধ হয়, সফরে বের হওয়ার পর সে যতই অগ্রসর হতে থাকে ততই তার হৃদয়-মনে পুণ্য ও পূত ভাবধারার তরংগ খেলে ওঠে। তার কোন কাজ যেন কারো মনে কোনরূপ আঘাত না দেয়, আর যারই যতটুকু উপকার করা যায় সেই সমস্ত চিন্তা এবং চেষ্টাই সে করতে থাকে। অশ্লীল ও বাজে কথা-বার্তা, নির্লজ্জতা, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা এবং ঝগড়া-ফাসাদ ইত্যাদি কাজ থেকে তার প্রকৃতি স্বভাবতই বিরত থাকে। কারণ সে আল্লাহর 'হারাম শরীফের' যাত্রী তাই অন্যায় কাজ করে এ পথে অগ্রসর হতে সে লজ্জিত না হয়ে পারে না। তার সফরটাই যে ইবাদাত, এই ইবাদাতের কাজে যুলুম, আর পাপ কাজের কি অবকাশ থাকতে পারে ? অতএব দেখা যাচ্ছে যে, অন্যান্য সকল প্রকার সফর থেকে এ সফর সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষের মনকে এ সফর প্রতিনিয়ত পূত-পবিত্র করতে থাকে। সত্য বলতে গেলে এটা একটি বিরাট সংশোধনকারী কোর্স বিশেষ, প্রত্যেক হজ্জযাত্রী মুসলমানকেই এ অধ্যায় অতিক্রম করতে হয়।

সফরের একটি অংশ সমাপ্ত করার পর এমন একটি স্থান সামনে আসে যেখানে পৌঁছে প্রত্যেক মক্কাযাত্রী মুসলমান 'এহরাম' বাঁধতে বাধ্য হয়। এটা না করে কেউ সামনে অগ্রসর হতে পারে না। এই 'এহরাম' কি ? একটি সিলাই না করা লুংগী, একখানি চাদর এবং সিলাইবিহীন জুতা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এর অর্থ এই যে, এতকাল তুমি যাই থাক না কেন, কিন্তু এখন তোমাকে ফকিরের বেশেই আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। কেবল বাহ্যিক ফকীরই নয়, প্রকৃতপক্ষে অন্তরেও ফকীর হতে চেষ্টা কর। রঙীন কিংবা জাঁকজমকপূর্ণ

সকল পোশাক খুলে রাখ, সাদাসিধে ও দরবেশ জনোচিত পোশাক পরিধান কর। মোজা পরবে না, পা উন্মুক্ত রাখ, কোন প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করবে না, চুল কেট না, সকল প্রকার অলংকার ও জাঁকজমক পরিহার কর। স্বামী-স্ত্রী সংগম হতে দূরে থাক, যৌন উত্তেজক কোন কাজ করো না, শিকার করো না। আর কোন শিকারীকে শিকারের কাজে সাহায্য করো না। বাহ্যিক জীবনে যখন এরূপ বেশ ধারণ করবে তখন মনের ওপরও তার গভীর ছাপ মুদ্রিত হবে, ভিতর হতেও তোমার মন সত্যিকারভাবে 'ফকির' হবে। অহংকার ও গৌরব দূরীভূত হবে, গরীবানা ও শান্তি-প্রিয়তার ভাব ফুটে ওঠবে। পার্থিব সুখ-সম্ভোগে লিপ্ত হওয়ার ফলে তোমার আত্মা যতখানি কলংকিত হয়েছিল তা দূর হয়ে যাবে এবং আল্লাহর বন্দেগী করার পবিত্র ভাবধারা তোমার জীবনের ভিতর ও বাইর উভয় দিককেই মহীয়ান করো তুলবে।

'এহরাম' বাঁধার সাথে সাথে হাজীকে একটি বিশেষ দোয়া বার বার পড়তে হয়। প্রত্যেক নামাযের পর, পথের প্রত্যেক চড়াই-উৎরাইয়ের সময়, কাফেলার সাথে মিলিত হবার সময় এবং প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠার সময়। দোআটি এই ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ ـ

বস্তুত হযরত ইবরাহীম (আ) সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে আল্লাহর আদেশে (হজ্জ করার জন্য) যে সার্বজনীন আহ্বান জানিয়েছিলেন, তার জবাবেই এ দোয়া পাঠ করার নিয়ম হয়েছে। পঁয়তাল্লিশ শত বছর আগে আল্লাহর এ আহ্বানকারী ডেকে বলেছিলেন ঃ "আল্লাহর বান্দাগণ ! আল্লাহর ঘরের দিকে আস, পৃথিবীর প্রতি কোণ থেকে ছুটে আস। পায়ে হেটে আস, কিংবা যানবাহনে চড়ে আস।" এর জবাব স্বরূপ আজ পর্যন্ত 'হারাম শরীফের' প্রতিটি মুসাফির উচ্চৈস্বরে বলে ওঠেছে ঃ "আমি এসেছি, হে আল্লাহ, আমি হাজির হয়েছি। কেউ তোমার শরীক নেই, আমি কেবল তোমারই আহ্বানক্রমে এসেছি, সব তারীফ প্রশংসা তোমারই দান, কোন কিছুতেই তোমার কেউ শরীক নেই।"

এভাবে 'লাব্বায়েকের' প্রত্যেকটি ধ্বনির মারফত হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর আমল থেকে প্রচলিত ইসলামী আন্দোলনের সাথে 'হাজী'র নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সাড়ে চার হাজার বছরের দূরত্ব মাঝখান হতে সরে গিয়ে একাকার হয়ে যায়। মনে হয় যেন এদিক থেকে ইবরাহীম (আ) আল্লাহর তরফ থেকে ডাকছেন, আর ওদিক থেকে প্রত্যেক হাজীই তার জবাব দিচ্ছে—জবাব দিতে দিতে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যতই সামনে

অগ্রসর হয় ততই তার মনে প্রাণে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আধ্যাত্মিক ভাবের ঝর্ণাধারা অধিকতর বেগে প্রবাহিত হতে থাকে। পথের প্রত্যেক চড়াই-উৎরাইয়ের সময় তার কানে আল্লাহর আহ্বান ধ্বনিত হয়, আর সে তার জবাব দিতে দিতে অগ্রসর হয়। কাফেলার পর কাফেলা আসে, আর প্রত্যেকেই প্রেমিক পাগলের ন্যায় এই পয়গাম শুনে বলে উঠে ঃ "আমি এসেছি, আমি হাজির হয়েছি।" প্রতিটি নূতন প্রভাত তার কাছে বন্ধুর পয়গাম বহন করে আনে, আর উষার ঝলকে চোখ খোলার সাথে সাথেই আমি এসেছি, 'হে আল্লাহ ! আমি হাজির হয়েছি', বলে আওয়াজ দিতে থাকে। মোটকথা বারবার দেয়া এ আওয়াজ এহরামের গরীবানা পোশাক, সফরের অবস্থা এবং প্রত্যেকটি মঞ্জিলে কা'বা ঘরের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য নৈকট্যের ভাব উন্মাদনায় এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি হয় যে, হাজী আল্লাহর অতল স্পর্শ গভীর প্রেমে আত্মমগ্ন হয়ে যায় এবং সেই এক বন্ধুর স্মরণ ভিন্ন তার জীবনের কোথাও অন্য কিছুর অস্তিত্ব থাকে না।

এ অবস্থার ভিতর দিয়ে হাজী মক্কায় উপনীত হয় এবং সেখানে পৌঁছেই সোজা আসল লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যায়। বন্ধুর আস্তানাকে চুম্বক করে। তারপর নিজের আকীদা-বিশ্বাস, ঈমান, মতবাদ, দ্বীন ও ধর্মের কেন্দ্রস্থলের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে এবং যতবার প্রদক্ষিণ করে ততবারই আস্তানাকে চুম্বন করে।[১] প্রত্যেক বারের তাওয়াফ কা'বা ঘরের কালো পাথর[২] চুমু দিয়ে শুরু ও শেষ করা হয়। এরপর 'মাকামে ইবরাহীম' নামক স্থানে দু' রাকাআত নামায পড়তে হয়। এখান থেকে বের হয়ে 'সাফা' পর্বতে আরোহণ এবং এখান থেকে যখন কা'বা ঘরের দিকে তার দৃষ্টি পড়ে, তখন সে উচ্চৈস্বরে বলে ওঠে ঃ

لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

১. পবিত্র কা'বা ঘরে সংস্থাপিত 'হাজরে আসওয়াদ' (কালো পাথর) চুম্বন করে এ ঘর চুম্বন করতে হয়। এ চুম্বনের বিরুদ্ধে অনেক নির্বোধ ব্যক্তি এরূপ অভিযোগ তোলেন যে, এটাও এক প্রকার মূর্তি পূজা। অথচ এটা বন্ধুর আস্তানা চুম্বন ছাড়া অন্য কিছুই নয়। পবিত্র কা'বা গৃহের তাওয়াফ করার সময়ের প্রতি তাওয়াফের শেষে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা হয় অথবা অন্তত পক্ষে তার প্রতি ইংগিত করা হয়। এতে এ কালো পাথরের পূজার সাথে তিলমাত্র কোন সম্পর্ক নেই। এ প্রসংগে হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর একটি বহুল প্রচারিত উক্তি রয়েছে। তিনি এ পাথরকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ "আমি জানি তুমি একখানি পাথর মাত্র। হযরত রাসূলে করীম (সা) তোমাকে চুম্বন না করলে আমি কিছুতেই তোমাকে চুম্বন করতাম না।"

২. মুসলমানদের প্রাণ কেন্দ্র কা'বা ঘরের আস্তানা চুম্বন করার রীতি হযরত ইবরাহীম (আ) ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) সকলেই প্রচলন করেছিলেন এবং সে জন্য এ পাথরখানাকেই নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল। এছাড়া এ কালো পাথরের অন্য কোন বৈশিষ্ট্য নেই, যে জন্য একে চুম্বন করা যেতে পারে।-অনুবাদক

"আল্লাহ ছাড়া আর কেউ মা'বুদ নেই, আমরা অন্য কারো বন্দেগী করি না ; আমরা কেবল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই আনুগত্য স্বীকার করি—কাফেরদের কাছে এটা যতই অসহনীয় হোক না কেন।"

অতপর 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়দ্বয়ের মধ্যস্থলে দৌঁড়াতে হয়। এর দ্বারা হাজী একথা প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহর নৈকট্য এবং তার সন্তোষ হাসিল করার উদ্দেশ্যে সবসময় এমন করে দৌঁড়াতে প্রস্তুত থাকবে। এ দৌড়ের সময়ও তার মুখ থেকে উচ্চারিত হতে থাকে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَسْتَعْمِلْنِىْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَتَوَفَّنِىْ عَلٰى مِلَّتِهٖ وَاَعِذْنِىْ مِنْ مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ -

"হে আল্লাহ ! আমাকে তোমার নবীর আদর্শ ও রীতিনীতি অনুসারে কাজ করার তাওফীক দাও। তোমার নবীর পথেই যেন আমার মৃত্যু হয় এবং সত্য পথভ্রষ্টকারী ফেতনা থেকে আমাকে রক্ষা কর।"

কখনো কখনো এই দোয়া পড়া হয় ঃ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ -

"হে রব ! ক্ষমা কর, দয়া কর, আমার যেসব অপরাধ সম্পর্কে তুমি অবহিত তা মাফ করে দাও। তোমার শক্তি সবচেয়ে বেশী, দয়াও অতুলনীয়।"

এরপর হাজী যেন আল্লাহর সৈনিকে পরিণত হয়। তাই পাঁচ ছয় দিন পর্যন্ত তাকে ক্যাম্পে জীবন কাটাতে হয়। একদিন 'মিনা'র ছাউনীতে অতিবাহিত করতে হয়, পরের দিন আরাফাতে অবস্থান করতে হয় এবং সেনাপতির 'খুতবার' নির্দেশ শুনতে হয়। রাতে মুজদালিফায় গিয়ে ক্যাম্প স্থাপন করতে হয়। দিন শেষে আবার 'মিনায়' ফিরে যেতে হয় এবং এখানে পাথর টুকরা নিক্ষেপ করে 'চাঁদমারী' করতে হয়। আবরাহা বাদশার সৈন্য-সামন্ত কা'বা ঘর ধ্বংস করার জন্য এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। প্রত্যেকটি পাথর নিক্ষেপ করার সাথে সাথে আল্লাহর সিপাহী বলে ওঠে ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَحِزْبِهٖ –"আল্লাহ মহান। শয়তান ও তাঁর অনুসারীদের মুখ ধূলায় মলিন হোক।" এবং اَللّٰهُمَّ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ –"হে আল্লাহ ! তোমার গ্রন্থের সত্যতা ঘোষণার ও তোমার নবীর আদেশ অনুসরণের তাওফীক দাও।"

পাথর টুকরা দিয়ে চাঁদমারী করার অর্থ একথা প্রকাশ করা যে, হে আল্লাহ ! তোমার দ্বীন ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য কিংবা তোমার আওয়াজকে স্তব্ধ করার জন্য যে-ই চেষ্টা করবে, আমি তোমার বাণীকে উন্নত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার বিরুদ্ধে এমনি করে লড়াই করবো। তারপর এ স্থানেই কুরবানী করা হয়। এটা দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জীবন বিসর্জন দেয়ার ইচ্ছা ও বাসনার বাস্তব এবং সক্রিয় প্রমাণ উপস্থিত করা হয়। এরপর সেখান থেকে কা'বার দিকে যাত্রা করা হয়—যেন ইসলামের মুজাহিদগণ কর্তব্য সমাধা করে বিজয়ীর বেশে 'হেড কোয়ার্টারের' দিকে ফিরে যাচ্ছে। তাওয়াফ এবং দু' রাকাআত নামায পড়ার পর এহরাম খোলা হয়। এহরাম বাঁধার কারণে যেসব কাজ হারাম হয়েছিল এখন তা হালাল হয়ে যায়, হাজীর জীবন এখন স্বাভাবিক গতিতে চলতে থাকে। এ জীবন শুরু হওয়ার পর আবার তাকে 'মিনায়' গিয়ে ক্যাম্প গাড়তে হয় এবং পরের দিন পাথরের সেই তিনটি স্তম্ভের ওপর আবার কংকর দ্বারা চাঁদমারী করতে হয়। এটাকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় 'জুমরাত'। এটা আবরাহা বাদশার মক্কা আক্রমণকারী ফৌজের পশ্চাদপসরণ ও তাকে পরাভূত করার প্রতীক মাত্র। রাসূলে করীম (সা)-এর জন্মের বছর হজ্জের সময়ই আল্লাহর ঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে আবরাহা এসেছিল। আল্লাহর তরফ থেকে আসমানী পাখী কংকর নিক্ষেপ করেই তাদেরকে নাস্তানাবুদ করে দেয়। তৃতীয় দিবসে পুনরায় সেই স্তম্ভগুলোর ওপর পাথর নিক্ষেপ করার পর হাজী মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে এবং সাতবার তার দ্বীনের কেন্দ্র কা'বা ঘরের তাওয়াফ করে। এ তাওয়াফকে বিদায়ী তাওয়াফ বলা হয়। এটা সম্পন্ন হলেই হজ্জের কাজ সমাপ্ত হয়।[১]

হজ্জের নিয়ত এবং সে জন্য প্রস্তুতি ও যোগাড় যন্ত্র থেকে শুরু করে পুনরায় নিজ বাড়িতে ফিরে আসা পর্যন্ত কমবেশী তিন মাস কাল ধরে হাজীর মন-মগযে কত বিরাট ও গভীর খোদায়ী ভাবধারা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে ওপরের এই বিস্তারিত আলোচনা থেকে তা অনুমান করা খুবই সহজ। এ কাজে শুরু থেকেই সময়ের কুরবানী করতে হয়, অর্থের কুরবানী করতে হয়, সুখ-শান্তি ত্যাগ করতে হয়, অসংখ্য পার্থিব সম্পর্ক-সম্বন্ধ ছিন্ন করতে হয়। হাজীর নিজের মনের অনেক ইচ্ছা-বাসনা স্বাদ-আস্বাদনকে উৎসর্গ করতে হয়। আর এ

---

১. সাধারণত মনে করা হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করার সময় শয়তানের প্রতারণা দেখে তিনি তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মুক্তিপণ হিসেবে যে দুম্বা কুরবানীর জন্য পাঠান হয়েছিল তা ছুটে পালাচ্ছিলো দেখে হযরত ইবরাহীম (আ) পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন, তারই স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ হজ্জ পালনের সময় পাথর নিক্ষেপ একটি অপরিহার্য কর্তব্য বলে গণ্য হয়েছে। কিন্তু জুমরাতের কারণ যে এটাই, এরূপ কথা কোন সহীহ হাদীসে উল্লিখিত হয়নি।

সবকিছুই তাকে করতে হয় কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য—নিজস্ব কোন স্বার্থ তাতে স্থান পেতে পারে না। তারপর এ সফরে তাকওয়া-পরহেযগারীর সাথে সাথে আল্লাহর স্মরণ এবং আল্লাহর দিকে মনের ঔৎসুক্য ও আগ্রহ যত বৃদ্ধি পায়, তাও মানুষের মনের ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে, বহুদিন পর্যন্ত সেই প্রভাব স্থায়ী হয়ে থাকে। 'হারাম শরীফে' কদম রেখে হাজী প্রত্যেক পদে পদে সেসব মহামানবদের অতীত কর্মধারার স্পষ্ট নিদর্শন দেখতে পায়। যাঁরা আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্য করে এবং আল্লাহর দ্বীন ইসলামকে কায়েম করতে গিয়ে নিজেদের যথাসর্বস্ব কুরবানী করেছেন, যারা সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, নানা প্রকার দুঃখ-লাঞ্ছনা অকাতরে সহ্য করেছেন, নির্বাসন দণ্ড ভোগ করেছেন, অসংখ্য যুলুম বরদাশত করেছেন, কিন্তু আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম না করা পর্যন্ত তাঁরা এতটুকু ক্লান্তিবোধ করেননি। যেসব 'বাতিল' শক্তি মানুষকে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করতে বাধ্য করছিল, তাঁরা তাদের সকলেরই মস্তক চূর্ণ করে দ্বীন ইসলামের পতাকা উন্নত করে ধরেছেন।

এসব সুস্পষ্ট নিশানা ও বরকত মণ্ডিত নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করে একজন আল্লাহ বিশ্বাসী ব্যক্তি প্রবল ইচ্ছা-বাসনা, সাহস ও আল্লাহর পথে জিহাদ করার যে প্রাণস্পর্শী শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে, তা অন্য কোন জিনিস থেকে গ্রহণ করতে পারে না। কা'বা ঘরের তাওয়াফ করায় দ্বীন ইসলামের কেন্দ্র বিন্দুর সাথে হাজীর নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। হজ্জ সম্পর্কীয় অন্যান্য কার্যাবলী দ্বারা হাজীর জীবনকে সৈনিকের ট্রেনিং দিয়ে গঠন করা হয়। নামায, রোযা এবং যাকাতের সাথে এসবকে মিলিয়ে যাচাই করলে পরিষ্কার মনে হবে যে, ইসলাম এসব কিছুর সাহায্যে কোন এক বিরাট উদ্দেশ্যে মানুষকে ট্রেনিং দান করে। এর জন্যই মক্কা পর্যন্ত যাতায়াতের সামর্থ সম্পন্ন প্রত্যেক মুসলমানদের প্রতি হজ্জ ফরয করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, প্রতি বছরই অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যক মুসলমান ইসলামের এই প্রাণ কেন্দ্রে আসবে এবং ট্রেনিং লাভ করে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের দিকে ফিরে যাবে।

অতপর আরো একটি দিক লক্ষ্য না করলে হজ্জের কল্যাণ ও স্বার্থকতা পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করা যাবে না। এক একজন মুসলমান কখনো একাকী হজ্জ করে না। দুনিয়ার সমগ্র মুসলমানের জন্যই হজ্জ করার একটি তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুসলমান একত্রিত হয়ে একই সময়ে হজ্জ করে। ওপরের কথা দ্বারা আপনি শুধু এতটুকু বুঝতে পারেন যে, আলাদাভাবে একজন মুসলমান হজ্জ করলে তার ওপর তার কতখানি প্রভাব পড়া সম্ভব। পরবর্তী প্রবন্ধের মারফতে আপনি বিস্তারিতরূপে জানতে পারবেন যে, দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য হজ্জের একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়ে হজ্জের

কল্যাণ কত লক্ষগুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে। একটি কাজে দু'টি ফল নয়, কয়েক হাজার ফল লাভের সুযোগ করে দেয়া একমাত্র ইসলামেরই এক অতুলনীয় কীর্তি। নামায আলাদাভাবে পড়ারও ফায়দা কম নয়। কিন্তু তার সাথে জামায়াতে শামিল হয়ে ইমামের পিছনে নামায পড়ার শর্ত করে দিয়ে এবং জুমুয়া ও দু' ঈদের নামায জামায়াতের সাথে পড়ার নিয়ম করে তার ফায়দা অসংখ্য গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে রোযা রাখায় রোযাদারদের মন ও চরিত্র গঠন কাজ কম সাধিত হতো না। কিন্তু সকল মুসলমানের জন্য একটি মাসকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করে তার ফায়দা এত পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে, যা গুণে শেষ করা যায় না। এক একজন লোকের ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় করার উপকারিতাও কম নয় ; কিন্তু বায়তুলমালের মারফত যাকাত দেয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে তার উপকারিতা এতদূর বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম না হওয়া পর্যন্ত সঠিকভাবে এর ধারণাও করা যায় না। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনেই সকল মুসলমানের যাকাত 'বায়তুলমালে' জমা করা হয় এবং সুসংবদ্ধভাবে প্রাপকের মধ্যে বন্টন করা হয়। ফলে তাতে সমাজের অভাবগ্রস্ত লোকদের অপূর্ব কল্যাণ সাধিত হয়। হজ্জের ব্যাপারেও তাই। একাকী হজ্জ করলেও হাজার হাজার মানুষের জীবনে বিরাট বিপ্লব সূচিত হতে পারে। কিন্তু দুনিয়ার মুসলমানকে একত্রিত হয়ে হজ্জ করার রীতি করে দিয়ে সীমাহীন কল্যাণ লাভের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।

হজ্জের বিশ্ব সম্মেলন

যেসব মুসলমানের ওপর হজ্জ ফরয হয় অর্থাৎ যারা কা'বা শরীফ পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারে এমন লোক দু' একজন নয়। প্রত্যেক এলাকায় তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম হয় না। বলতে গেলে প্রত্যেক শহরে কয়েক হাজার এবং প্রত্যেক দেশে কয়েক লক্ষ পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রত্যেক বছরই এদের অধিকাংশ লোকই হজ্জ করার ইচ্ছা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়। দুনিয়ার যেসব জায়গায় মুসলমান বসবাস করে, তথায় হজ্জের মৌসুম নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে ইসলামী যিন্দেগীর এক নতুন চেতনা কিরূপ জেগে ওঠে, তা সত্যই লক্ষ্য করার মত। প্রায় রমযান থেকে শুরু করে যিলকদ মাস পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গা থেকে শত শত লোক হজ্জ যাত্রায় আয়োজন করে রওয়ানা হয়। আর ওদিকে মহররম মাসের শেষ দিক থেকে সফর, রবিউল আউয়াল তথা রবিউস্‌সানী পর্যন্ত হাজীদের প্রত্যাবর্তনের ধারা চলতে থাকে। এ ছয় মাসকাল পর্যন্ত সকল মুসলিম লোকালয় এক প্রকার ধর্মীয় ভাবধারায় সরগরম হয়ে থাকে। যারা হজ্জে গমন করে আর হজ্জ করে ফিরে আসে, তারা তো ধর্মীয় ভাবধারায় নিমগ্নই হয়ে থাকে ; কিন্তু যারা হজ্জে গমন করে না, হাজীদের রওনা করাতে, এক একটি ষ্টেশন থেকে তাদের চলে যাওয়া আবার ফিরে আসার সময় তাদের অভ্যর্থনা করায় এবং তাদের কাছে হজ্জের বিস্তারিত অবস্থা শুনার ব্যাপারে তারাও কিছুটা হজ্জে গমনের আনন্দ লাভ করে থাকে।

এক একজন হাজী যখন হজ্জে গমনের নিয়ত করে, সেই সাথে তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় এবং পরহেযগারী, তাওবা-ইসতেগফার এবং উন্নত ও পবিত্র চরিত্রের ভাবধারা জেগে ওঠে। সে তার প্রিয় আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট সকল লোকের কাছে বিদায় চায়। নিজের সব কাজ-কারবারের চূড়ান্ত রূপ দিতে শুরু করে। এতে মনে হয় যে, সে এখন আর আগের মানুষ নয়, আল্লাহর দিকে তার মনের আকর্ষণ হওয়ায় দিল পবিত্র হয়ে গেছে। এভাবে এক একজন হাজীর এ পরিবর্তনে তার চারপাশের লোকদের ওপর কত গভীর প্রভাব পড়ে তা অনুমান করা যায়। এরূপ প্রত্যেক বছরই যদি দুনিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে গড়ে এক লক্ষ লোকও এই হজ্জ সম্পন্ন করে, তবে তাদের এ গতিবিধি ও কার্যকলাপের প্রভাব আরো কয়েক লক্ষ লোকের চরিত্রের ওপর না পড়ে পারে না। তারপর হাজীদের কাফেলা যে স্থান অতিক্রম করে, তাদেরকে দেখে তাদের সাথে সাক্ষাত করে 'লাব্বাইকা' আওয়ায শুনে সেখানকার কত মানুষের দিল অলৌকিক ভাবধারায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কত মানুষের লক্ষ্য আল্লাহর ঘরের দিকে ফিরে যায়। আর কত লোকের নিদ্রিত

আত্মা হজ্জ করার উৎসাহে জেগে ওঠে। এসব লোক যখন আবার নিজ নিজ দেশের দিকে—দুনিয়ার বিভিন্ন দিকে হজ্জের প্রাণস্পর্শী ভাবধারা বিস্তার করে প্রত্যাবর্তন করে এবং দলে দলে মানুষ তাদের সাথে সাক্ষাত করতে আসে, তাদের কাছ থেকে আল্লাহর ঘরের আলোচনা শুনে কত অসংখ্য মানুষের মনে এবং অসংখ্য পরিমণ্ডলে ইসলামী ভাবধারা জেগে ওঠে।

এ জন্যই আমি বলতে চাই যে, রযমান মাস যেরূপ বিশ্ব মুসলিমের জন্য তাকওয়া ও পরহেযগারীর মৌসুম তেমনি হজ্জের মাসও বিশ্ব ইসলামী পুনর্জাগরণের মৌসুম। মহান বিজ্ঞ আল্লাহ এ ব্যবস্থা এ জন্য করেছিলেন যেন বিশ্ব ইসলামী আন্দোলন শ্লথ না হয়ে যায়। পবিত্র কা'বাকে বিশ্বের কেন্দ্রভূমি হিসেবে এমনভাবে স্থাপন করেছেন যেন মানব দেহের মধ্যে হৃদয়ের অবস্থান। দেহ যতই রোগাক্রান্ত হোক না কেন যতদিন হৃদয়ের স্পন্দন থেমে না যায় এবং সমগ্র দেহে রক্ত সঞ্চালনের পদ্ধতি বন্ধ হয়ে না যায় ততদিন যেমন মানুষের মৃত্যু হয় না সেরূপ হজ্জের এ সম্মেলন ব্যবস্থাও যতদিন থাকবে ততদিন ইসলামী আন্দোলনও চলতে থাকবে।

একটু চোখ বন্ধ করে চিন্তা করলেই আপনাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে, পৃথিবীর দূর দূরান্তের অঞ্চল থেকে আগত অসংখ্য মানুষ যাদের আকার-আকৃতি, দৈহিক রং ও ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও যখনই কেন্দ্রের নিকটবর্তী হয় সবাই নির্দিষ্ট স্থানে এসে নিজ নিজ পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে ফেলে এবং সকলে একই ধরনের অনাড়ম্বর 'ইউনিফরম' পরিধান করে। এহরামের এ 'ইউনিফরম' ধারণ করার পর পরিষ্কার মনে হয় যে, দুনিয়ার হাজার হাজার জাতির মধ্য থেকে এই যে লক্ষ লক্ষ ফৌজ আসছে, এরা বিশ্বের বাদশাহ ও যমীন-আসমানের রাজাধিরাজ এক আল্লাহ তাআলারই ফৌজ। এরা দুনিয়ার হাজার হাজার জাতি ও কাওম থেকে ভর্তি হয়েছে। এরা সকলে একই বাদশাহর ফৌজ। এদের সকলের ওপর একই সম্রাটের আনুগত্য ও গোলামীর চিহ্ন লেগে আছে, একই বাদশার আনুগত্যের সূত্রে এরা সকলেই পরস্পর বিজড়িত রয়েছে এবং একই রাজধানীর দিকে, মহাসম্রাটের সামনে উপস্থিত হবার জন্য ছুটে চলেছে। একই 'ইউনিফরম' পরিহিত এ সিপাহী 'মীকাত' অতিক্রম করে যখন সামনে অগ্রসর হয়, তখন সকলের কণ্ঠ থেকে এ একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে ঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

উচ্চারণের কণ্ঠ বিভিন্ন—কিন্তু সকলের কণ্ঠে একই ধ্বনি। কেন্দ্র যত নিকটবর্তী হয়, ব্যবধান ততই কমে যায়। বিভিন্ন দেশের কাফেলা পরস্পর

মিলিত হয় এবং সকলেই একত্রিত হয়ে একই পদ্ধতিতে নামায পড়ে, সকলের পোশাক এক, সকলেরই ইমাম এক, একই গতিবিধিতে ও একই ভাষায় সকলের নামায পড়া, সকলেই এক 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনির ইঙ্গিতে ওঠা-বসা করে, রুকূ'-সিজদা করে, সকলে একই আরবী ভাষায় কুরআন পড়ে এবং শুনে। এভাবে সমবেত লক্ষ লক্ষ জনতার ভাষা, জাতি, দেশ, বংশ ও গোত্রের কৃত্রিম বৈষম্য চূর্ণ হয়ে একাকার হয়ে যায়। সমগ্র মানুষের সমন্বয়ে 'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী' একটি বিরাট জামায়াত রচিত হয়। তারপর এ বিরাট আন্তর্জাতিক জামায়াত একই আওয়ায 'লাব্বাইকা লাব্বাইকা' ধ্বনি করতে করতে চলতে থাকে। পথের প্রত্যেক চড়াই উৎরাইয়ে যখন এ আওয়ায উত্থিত হয়, যখন নামাযের সময়ে এবং প্রভাতে এ শব্দ অনুরণিত হয়ে ওঠে, যখন কাফেলাসমূহ পরস্পর মিলিত হবার সময় এ শব্দই ধ্বনিত হয়ে ওঠে তখন চারদিকে এক আশ্চর্য রকম পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সে পরিবেশে মানুষ নিজেকে ভুলে যায়, এক অচিন্তনীয় ভাবধারায় সে মত্ত হয়ে পড়ে, 'লাব্বাইকা' ধ্বনির আকর্ষণে সে এক ভাবজগতে ছুটে যায়। অতপর কা'বায় পৌঁছে দুনিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সমাগত জনসমুদ্রের একই পোশাকে নির্দিষ্ট কেন্দ্র বিন্দুর চারদিকে প্রদক্ষিণ করা, সকলের একই সাথে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়ানো, সকলের মিনায় উপস্থিত হয়ে তাবু জীবনযাপন করা এবং তথায় এক ইমামের কণ্ঠে ভাষণ (খোতবা) শ্রবণ করা, তারপর মুযদালিফায় তাবুর নীচে রাত্রি যাপন করা, আবার মিনার দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন করা, সকলে মিলে আকাবায় পাথর দ্বারা চাঁদমারী করা, তারপর সকলের কুরবানী করা, সকলের একই সাথে কা'বায় ফিরে এসে তার তাওয়াফ করা, সকলের একই কেন্দ্রে একত্রিত হয়ে নামায পড়া—এসব কাজে যে পবিত্র পরিবেশ ও আধ্যাত্মিক মনোভাবের সৃষ্টি হয়, দুনিয়ার অন্য কোন ধর্মে বা জীবন ব্যবস্থায় তার তুলনা নেই।

তারপর দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্য থেকে আগত অসংখ্য মানুষের একই কেন্দ্রে সম্মিলিত হওয়া এমন নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং ঐক্যভাবের সাথে একত্রিত হওয়া এমন পবিত্র উদ্দেশ্য ও ভাবধারা এবং নির্মল কাজ-কর্ম সহকারে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা প্রকৃতপক্ষে আদম সন্তানের জন্য এটা এক বড় নিয়ামত। এ নিয়ামত ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্মই দিতে পারেনি। দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির পরস্পর মিলত হওয়ার কোন নতুন কথা নয় চিরকালই এরূপ হয়েছে। কিন্তু তাদের এ সম্মেলন হয় যুদ্ধের ময়দানে একে অপরের গলা কাটার জন্যে। অথবা সন্ধি সম্মেলনে বিজিত দেশগুলোকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেবার জন্যে কিংবা বিশ্বজাতি সম্মেলনে এক একটি জাতির বিরুদ্ধে ধোঁকা ও প্রতারণার ষড়যন্ত্র, যুলুম এবং বেঈমানীর জাল ছড়াবার জন্য ; অথবা

পরের ক্ষতি সাধন করে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করার মতলবে। সমগ্র জাতির জনসাধারণের নির্মল মন, সচ্চরিত্রতা ও পবিত্র মনোভাব নিয়ে এবং প্রেম ভালবাসা, নিষ্ঠা, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ঐক্যভাব সহকারে একত্রিত হওয়া। চিন্তা, কর্ম এবং উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণ একাগ্রতার সাথে মিলিত হওয়া—তাও আবার একবার মিলিত হয়েই ক্ষান্ত না হওয়া বরং চিরকালের জন্য প্রত্যেক বছর একই কেন্দ্রে একত্রিত হওয়া বিশ্বমানবতার প্রতি এতবড় নিয়ামত দুনিয়ায় ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম ব্যবস্থাই দিতে পেরেছে কি? বিশ্ব শান্তি স্থাপনে জাতিসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ মিটিয়ে দেয়া এবং লড়াই ঝগড়ার পরিবর্তে ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আর কেউ পেশ করতে পেরেছে কি? ইসলাম শুধু এতটুকু করেই ক্ষান্ত হয়নি ; সে আরো অনেক কল্যাণকর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে।

বছরের চারটি মাস হজ্জ ও ওমরার কাজ সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ইসলাম কা'বা যাতায়াতের এ চারটি মাস সমস্ত পথেই শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এটা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি রক্ষা করার এক স্থায়ী ব্যবস্থা। দুনিয়ার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ইসলামের হাতে আসলে হজ্জ ও ওমরার কারণে একটি বছরের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সময় চিরকালের জন্য যুদ্ধ এবং রক্তারক্তির হাত থেকে দুনিয়া রক্ষা পেতে পারে।

ইসলাম দুনিয়ার মানুষকে একটি হেরেম দান করেছে। এই হেরেম কিয়ামত পর্যন্ত শান্তির কেন্দ্রস্থল। এখানে মানুষ মারা তো দূরের কথা, কোন জন্তুও শিকার করা যেতে পারে না। এমনকি এখানকার ঘাসও কেটে ফেলার অনুমতি নেই। এখানকার কোন কাঁটাও চূর্ণ করা যায় না, কারো কোন জিনিস এখানে পড়ে থাকলে তা স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। ইসলাম পৃথিবীর বুকে একটি শহর প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ শহরে কারো কোন হাতিয়ার নিয়ে প্রবেশ করার অনুমতি নেই। এখানে খাদ্যশস্য বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সঞ্চয় করে রাখা এবং তার ফলে মূল্য বৃদ্ধির কারণ সৃষ্টি করা পরিষ্কার আল্লাহদ্রোহিতা। এখানে যারা অন্যের ওপর যুলুম করে তাদেরকে আল্লাহ্ পাক এই বলে সাবধান করে দিয়েছেন ঃ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ –আমরা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেব।"

ইসলাম সমগ্র পৃথিবীর একটি কেন্দ্র নির্ধারিত করেছে। এ কেন্দ্রের পরিচয় প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ – "যারা আল্লাহর প্রভুত্ব ও বাদশাহী এবং হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা)-এর নবুয়াত ও নেতৃত্ব স্বীকার করে ইসলামী ভ্রাতৃসংঘে প্রবেশ করবে, ইসলামের এ কেন্দ্রে তাদের সকলেরই সমান অধিকার থাকবে।" আমেরিকার বাসিন্দা হোক কি আফ্রিকার, চীনের বাসিন্দা হোক কি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের, সে যদি মুসলমান হয়

তবেই মক্কা শরীফে তার অধিকার মক্কার আসল বাসিন্দাদের অনুরূপ হবে। সমগ্র হারাম শরীফের এলাকা মসজিদের ন্যায়। মসজিদে গিয়ে যে মুসলমান নিজের জন্য কোন স্থান করে নেয়, সে স্থান তারই হয়ে যায় ; কেউ তাকে সেই স্থান থেকে বিতাড়িত করতে পারে না, কেউ তার কাছে ভাড়া চাইতে পারে না। কিন্তু সে যদি সারা জীবনও সেই স্থানে বসে থাকে, তবুও সেই স্থানকে নিজের মালিকানা স্বত্ব বলে দাবী করতে এবং তা বিক্রি করতে পারে না। এর জন্য সে ভাড়াও চাইতে পারে না। এভাবে সেই ব্যক্তি যখন সেই স্থান থেকে চলে যাবে তখন অন্য কেউ এসে সেখানে আসন করে নিতে পারে, যেমন পূর্বের লোকটি পেরেছিল। 'হারাম শরীফের' অবস্থাও ঠিক এরূপ।

হযরত নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ مَكَّةُ مُنَاخٌ لِمَنْ سَبَقَ "মক্কা নগরের যে স্থানে এসে যে ব্যক্তি প্রথমে অবতরণ করবে সেই স্থান তারই হবে।" এখানকার বাড়ী-ঘরের ভাড়া আদায় করা জায়েয নয়। হযরত উমর ফারুক (রা) এখানকার লোকদের ঘরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের দুয়ার বন্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, যাতে লোকেরা তাদের প্রাঙ্গণে এসে অবস্থান করতে পারে। কোন কোন ফকীহ এতদূরও বলেছেন যে, মক্কা নগরীর বাড়ী ঘরের কেউ মালিক নয়, তা উত্তরাধিকার নীতি অনুসারে বন্টনও হতে পারে না। এসব সুযোগ-সুবিধা এবং আযাদীর মূল্যবান নিয়ামত দুনিয়ার মানুষ ইসলাম ভিন্ন অন্য কোথাও পেতে পারে কি ?

এহেন হজ্জ সম্পর্কেই বলা হয়েছিল ঃ তোমরা এটা করে দেখ এতে তোমাদের জন্য কত বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তার সমস্ত কল্যাণকে গুণে গুণে বলার শক্তি আমার নেই। কিন্তু তবুও এ পর্যন্ত তার যে কিঞ্চিত বিবরণ ওপরে পেশ করেছি তা থেকে এ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যাবে।

কিন্তু এসব কথা শুনার পর আমার নিজের মনের দুঃখের কথাও খানিকটা শুনুন। বংশানুক্রমিক মুসলমান হীরক খনির অভ্যন্তরে ভূমিষ্ঠ শিশুর মত। এ শিশু যখন জন্ম মুহূর্ত থেকেই চারদিকে কেবল হীরক দেখতে পায় এবং হীরক খণ্ড নিয়ে খেলা করতে থাকে, তখন তার দৃষ্টিতে হীরকের ন্যায় মহামূল্যবান সম্পদও সাধারণ পাথরের মতই মূল্যহীন হয়ে যায়। বংশীয় মুসলমানদের অবস্থাও ঠিক এরূপ। সমগ্র জগত যে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত এবং যা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই তারা নানা প্রকার দুঃখ-মুসিবতে নিমজ্জিত রয়েছে, আর বিশ্ব মানব যার সন্ধান করতে ব্যাকুল রয়েছে, সেই মূল্যবান নিয়ামতসমূহ বর্তমান মুসলমানরা বিনামূল্যে লাভ করেছে, এজন্য তালাশ-অনুসন্ধান এবং খোঁজাখুঁজির জন্য একবিন্দু পরিশ্রমও তাদের করতে হয়নি। এসব ছাড়াই তারা

এটা পেয়েছে শুধু এ জন্য যে, সৌভাগ্যবশত তারা মুসলিম পরিবারে জন্মলাভ করেছে। যে কালেমায়ে তাওহীদ মানব জীবনের সমগ্র জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে দিতে পারে, শিশুকাল থেকেই তা তাদের কানে প্রবেশ করছে, মানুষকে প্রকৃত মানুষ বানাতে এবং লোকদের পরস্পরের ভাই ও দরদী বন্ধুতে পরিণত করার জন্য নামায-রোযা স্পর্শমণি অপেক্ষাও বেশী মূল্যবান। এরা জন্মলাভ করেই বাপ-দাদার উত্তরাধিকার হিসেবে এটা লাভ করেছে। যাকাত ইসলামী সমাজের এক অতুলনীয় ব্যবস্থা, এদ্বারা শুধু মনের 'নাপাকীই' দূর হয় না, দুনিয়ার অর্থব্যবস্থাও সুষ্ঠুতা লাভ করে—যা থেকে বঞ্চিত হয়ে দুনিয়ার মানুষ একে অপরের বুকের রক্ত শুষে নিচ্ছে। এটা মুসলমানগণ প্রত্যক্ষ করছে। কিন্তু মুসলমানরা তা বিনাব্যয়ে এবং বিনা শ্রমে লাভ করেছে। এটা ঠিক তেমনিভাবে, যেমন খুব বড় চিকিৎসকের সন্তান ঘরে বসেই বড় বড় রোগের তালিকা বিনামূল্যে লাভ করে থাকে। অথচ এর জন্য অন্যান্য মানুষ অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে সন্ধান করে বেড়ায়। হজ্জও একটি বিরাট ব্যবস্থা, সমগ্র দুনিয়ায় এর কোন তুলনা নেই। পৃথিবীর কোণায় কোণায় ইসলামী আন্দোলনের আওয়ায পৌঁছাবার জন্য এবং আন্দোলনকে চিরকালের তরে জীবিত রাখার জন্য এটা অপেক্ষা শক্তিশালী উপায় আর কিছুই হতে পারে না। বস্তুত দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে পৃথিবীর প্রতিটি কোণ থেকে এক আল্লাহর নামে টেনে এনে নির্দিষ্ট একটি কেন্দ্রে একত্রিত করে দেয়া এবং অসংখ্য বংশ গোত্র ও জাতিকে এক আল্লায় বিশ্বাসী, সদুদ্দেশ্য সম্পন্ন ও সৌহার্দপূর্ণ ভ্রাতৃসংঘে সম্মিলিত করে দেবার জন্য এটা অপেক্ষা উন্নততর কোন পন্থা আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। যুগ-যুগান্তর থেকে জীবন্ত ও প্রচলিত এ ব্যবস্থাও মুসলমানগণ নিজেদের সম্পদ হিসেবে লাভ করেছে বিনা চেষ্টায় এবং বিনা শ্রমে। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা এই যে, মুসলমান বিনাশ্রমে প্রাপ্ত এ মূল্যবান সম্পদের কোন কদর বুঝেনি, বরং তারা এটা নিয়ে ঠিক তেমনিভাবে খেলা করছে, যেমন হীরকখণ্ড নিয়ে খেলা করে হীরক খনিতে প্রসূত শিশু সন্তান। আর তাকে সে মনে করে সাধারণ পাথরের ন্যায় মূল্যহীন। মুসলমান নিজেদের মূর্খতা এবং অজ্ঞতার কারণে এ বিরাট মূল্যবান সম্পদ ও শক্তির উৎস নিয়ে অত্যন্ত হীনভাবে খেলা করছে। এর অপচয় করছে—এটাকে নষ্ট করছে—এসব দেখে আমার প্রাণ জ্বলে যায়। পাথর চূর্ণকারীর হাতে মূল্যবান হীরক খণ্ড বরবাদ হতে দেখে সহ্য করা বাস্তবিকই কঠিন ব্যাপার। কোন এক কবি সত্যিই বলেছিলেন ঃ

"যদিও ঈসার গাধা যায় মক্কা ভূমি
হেথাও থাকবে গাধা জেনে রাখ তুমি।"

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-এর ন্যায় মহান পয়গাম্বরের গাধা হলেও পবিত্র মক্কার দর্শন দ্বারা তার কোন উপকার হতে পারে না। সে যদি সেখানে থেকেও যায় তথাপি সে যেমন গাধা তেমন গাধাই থেকে যাবে।

নামায-রোযা হোক, কিংবা হজ্জ হোক, এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের প্রশিক্ষণ। কিন্তু যারা এগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝতে চায় না, এর উপকার ও কল্যাণ লাভ করার কথা এতটুকুও ভাবে না ; বরং যারা এ ইবাদতসমূহের যে কোন মকছুদ ও উদ্দেশ্য থাকতে পারে তৎসম্পর্কেও বিন্দুমাত্র কোন ধারণা রাখে না। তারা যদি পূর্ববর্তী লোকদের দেখাদেখি শুধু ওগুলোর নকলই করতে থাকে, তাহলে এটা দ্বারা সেই সুফল কখনো আশা করা যেতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাধারণত আজকের মুসলমানগণ এভাবেই ঐ ইবাদতগুলো করে চলেছে। সকল ইবাদাতের বাহ্যিকরূপ তারা ঠিকই বজায় রাখছে ; কিন্তু (লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি না থাকার কারণে) এতে কোন প্রাণশক্তি সৃষ্টি হচ্ছে না। প্রতি বছর হাজার হাজার লোক ইসলামের কেন্দ্রে গমন করে এবং হজ্জের সৌভাগ্য লাভ করে ফিরে আসে। কিন্তু হারাম শরীফের যাত্রীর স্বভাব-চরিত্রে যে পরিবর্তন কাম্য ছিল, তা যেমন দেখা যায় না তেমন হজ্জ থেকে ফিরে আসার পরও তার মানসিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। অনুরূপভাবে যে সকল এলাকা অতিক্রম করে হজ্জে গমন করা হয়, সেখানকার মুসলমান-অমুসলমান অধিবাসীদের ওপরেও তার কোন উত্তম চরিত্রের প্রভাব পতিত হয় না। বরং অনেকের অসৎ স্বভাব, বদমেজাজী, অশালীন ব্যবহার ও চারিত্রিক দুর্বলতা ইসলামের সম্মানকে বিনষ্ট করে দেয়। বস্তুত এসব কারণেই আমাদের অনেক মুসলিম যুবকও প্রশ্ন করেন যে, 'হজ্জের উপকার আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন।' অথচ হজ্জ তো ছিল এমন এক জিনিস যে তাকে প্রকৃতরূপে সম্পন্ন করা হলে কাফেররাও এর উপকার প্রকাশ্যে দেখে ইসলাম গ্রহণ করতো। যদি কোন আন্দোলনের লক্ষ লক্ষ সদস্য প্রতি বছর বিশ্বের সকল অঞ্চল থেকে এক স্থানে সমবেত হয় এবং আবার নিজ নিজ দেশে ফিরে যায় বিভিন্ন দেশ ও নগর হয়ে যাওয়ার সময়ে নিজেদের পবিত্র জীবন, পবিত্র চিন্তাধারা ও পবিত্র নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ করতে করতে অগ্রসর হয়, যেখানে যেখানে অবস্থান করে কিংবা যে যে স্থান অতিক্রম করে সেখানে নিজেদের আন্দোলনের যাবতীয় মৌলিক নীতির শুধু মৌখিক আলোচনা না করে আপন আচরণ ও কর্মতৎপরতায়ও তাকে বাস্তবায়িত করতে থাকে, আর এটা শুধু দশ-বিশ বছরই নয় বরং বছরের পর বছর ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরেই চলতে থাকে তাহলে বলুন তো, এটা কোন নিষ্ক্রিয় জিনিস থেকে হতে পারে কি ? প্রকৃতপক্ষে হজ্জ এরূপ হলে তার উপকার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করার

প্রয়োজনই হতো না। তখন অন্ধ ব্যক্তিও এর উপকার দেখতে পেত। বধির ব্যক্তিও এর কল্যাণ শুনতে পারতো। প্রতি বছরের হজ্জ কোটি কোটি মুসলমানকে নেক বান্দায় পরিণত করতো, হাজার হাজার অমুসলমানকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করতো, লক্ষ লক্ষ অমুসলমানের অন্তরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বদ্ধমূল করে দিত। কিন্তু আফসোস ! আমাদের মূর্খতার কারণে কত বড় মূল্যবান সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে।

হজ্জের অন্তর্নিহিত এই বিরাট সার্থকতা ও উপকারিতা পুরোপুরি লাভ করার জন্য ইসলামের কেন্দ্রস্থলে কোন বিরাট শক্তিসম্পন্ন কর্তৃত্ব বর্তমান থাকা উচিত। যা এই মহান বিশ্ব শক্তিকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম। এখানে এমন একটি হৃৎপিণ্ড (দিল) থাকা উচিত ছিল যা প্রত্যেক বছর সমগ্র বিশ্ব দেহে তাজা রক্তের দ্বারা প্রবাহিত করতে সক্ষম। এমন একটি মস্তিষ্ক থাকারও দরকার ছিল যা এই হাজার হাজার আল্লাহর দূতের মারফতে দুনিয়ার কেন্দ্রে কেন্দ্রে ইসলামের বিপ্লবী পয়গাম পৌঁছাতে চেষ্টা করতো। আর কিছু না হোক, অন্তত এই কেন্দ্রভূমিতে খালেস ইসলামী জীবন ধারার বাস্তবরূপ যদি বর্তমান থাকতো, তবুও দুনিয়ার মুসলমান প্রত্যেক বছরই সেখান থেকে খালেস ইসলামী জিন্দেগী এবং দ্বীনদারীর শিক্ষা নিয়ে নিজ নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করতে পারতো। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এখানে তেমন কিছু নেই। দীর্ঘকাল পর্যন্ত আরব দেশে মূর্খতার অন্ধকার পুঞ্জিভূত হয়ে আছে, আব্বাসীয় যুগ থেকে শুরু করে ওসমানী যুগ পর্যন্ত সকল অক্ষম ও অনুপযুক্ত শাসক ইসলামের কেন্দ্রস্থলের অধিবাসীগণকে উন্নতি লাভের সুযোগ দেয়ার পরিবর্তে কয়েক শতাব্দীকাল ধরে তাদেরকে কেবল অধঃপতনের দিকেই ঠেলে দিয়েছে। ফলে আরব দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞান, নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতি—সকল দিক দিয়েই অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। এ কারণে যে ভূখণ্ড থেকে একদা ইসলামের বিশ্বপ্লাবী আলোক ধারা উৎসারিত হয়ে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল আজ তাই ইসলামের পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের ন্যায় অন্ধ কূপে পরিণত হয়েছে। এখন সেখানে ইসলামের জ্ঞান নেই, ইসলামী জীবনধারা নেই। মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে বুকভরা আশা ও ভক্তি নিয়ে প্রত্যেক বছর পাক 'হারামে' আগমন করে ; কিন্তু এ এলাকায় পৌঁছে তার চারদিকে যখন কেবল মূর্খতা, মলিনতা, লোভ-লালসা, নির্লজ্জতা, আত্মপূজা, চরিত্রহীনতা, উচ্ছৃংখলতা এবং জনগণের নির্মম অধঃপতিত অবস্থা দেখতে পায়, তখন তাদের আশা-আকাংখার স্বপ্ন জাল ছিন্ন হয়ে যায়। এখন অনেক লোক হজ্জ করে নিজের ঈমানকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে তাকে অধিকতর দুর্বলই করে আসে। হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর পরে জাহেলিয়াতের যুগে আরব

দেশে যে পৌরোহিত্যবাদ ও ঠাকুর পূজার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল এবং যা শেষ নবী হযরত রাসূলে করীম (সা) নির্মূল করেছিলেন, আজ তা-ই প্রবলরূপে পুনঃপ্রবির্তত হয়েছে। 'হারামে কা'বার' ব্যবস্থাপক পূর্বের ন্যায় আবার সেবায়েত হয়ে বসেছে। আল্লাহর ঘর তাদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। এ ঘরের প্রতি যারা ভক্তি রাখে তারা এদের শিকার বিশেষ। বিভিন্ন দেশে বড় বড় বেতনভূক্ত এজেন্ট নিযুক্ত রয়েছে, তারা ভক্তদেরকে চারদিক থেকে টেনে টেনে নিয়ে আসে। কুরআনের আয়াত আর হাদীসের নির্দেশ পড়ে শুনিয়ে তাদেরকে হজ্জ যাত্রায় উদ্বুদ্ধ করে এজন্য নয় যে, আল্লাহ তাদের প্রতি হজ্জ ফরয করেছেন, তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। বরং এর উদ্দেশ্য এই যে, এ আদেশ শুনলে তারা অবশ্যই হজ্জ করতে যাবে এবং তাতে তাদের যথেষ্ট আমদানী হবে। এসব দেখে পরিষ্কার মনে হয় যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল বুঝি এ বিরাট ব্যবস্থা করেছেন শুধু এই পুরোহিত 'পাণ্ডা' এবং দালালদের প্রতিপালনের জন্য। তারপর হজ্জ যাত্রায় বাধ্য হয়ে মানুষ যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন সফরের শুরু থেকে হজ্জ করে বাড়ী ফিরে আসা পর্যন্ত প্রত্যেক জায়গায় ধর্মীয় মজুর এবং ধর্ম ব্যবসায়ীরা জোকের ন্যায় তাদের সামনে উপস্থিত হয়। মুয়াল্লেম, তাওয়াফ শিক্ষাদাতা, কা'বার কুঞ্জিকা বাহক এবং স্বয়ং হেজায সরকার— সকলেই এ ধর্ম ব্যবসায়ে সমানভাবে অংশীদার। হজ্জের সমস্ত অনুষ্ঠানাদিই পয়সা দিয়ে সম্পন্ন করতে হয়। এমন কি পবিত্র কা'বা গৃহের দরযাও পয়সা ব্যতীরেকে কোন মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত হতে পারে না (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। ইসলামের এ তথাকথিত খাদেমগণ এবং কেন্দ্রীয় উপাসনাগারের সেবায়েতগণও শেষ পর্যন্ত বেনারস ও হরিদ্বারের পণ্ডিত পুরোহিতদের পেশা অবলম্বন করে নিয়েছে, অথচ এটাই একদা এই পুরোহিতবাদের মূলোচ্ছেদ করেছিল। যেখানে ইবাদাত করানোর কাজ বিশেষ ব্যবসায় এবং ইবাদাতের স্থান উপার্জনের উপায়ে পরিণত হয়েছে, সেখানে আল্লাহর আয়াত কেবল এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় যে, লোক তা শুনে হজ্জ করতে বাধ্য হবে এবং এ সুযোগে তার পকেট মেরে টাকা নিয়ে যাবে। যেখানে ইবাদাতের কাজ সম্পন্ন করার জন্য মূল্য দিতে হয় এবং দ্বীনি কর্তব্য ব্যবসায়ের পণ্য হয়—এমতস্থানের ইবাদাতে ইসলামের প্রাণ শক্তি কি করে বেঁচে থাকতে পারে। হাজীগণ যে এ ইবাদাতের প্রকৃত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপকারিতা লাভ করতে পারবে— সমস্ত কাজ যখন একটা কেনা-বেচার মাল হয়ে রয়েছে—তখন এমন আশা কিছুতেই করা যায় না।[১]

১. স্মরণীয় যে, এটা লিখিত হয়েছিল ইংরেজী ১৯৩৮ সনে। তারপর থেকে এ পর্যন্ত অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। সৌদি আরব সরকার অধিকতর উন্নতির জন্য সচেষ্ট রয়েছে। আরবে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। রিয়াদ, মক্কা, জেদ্দা প্রভৃতি শহরে ইসলামী শরীয়াতের শিক্ষার জন্য উচ্চ পর্যায়ে বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। মদীনা তাইয়েবায় একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাপকভাবে কাজ

এ আলোচনা দ্বারা কারো ওপর দোষারোপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু বলতে চাই হজ্জের ন্যায় একটি বিরাট শক্তিকে কোন্ কোন্ জিনিস প্রায় নিষ্ক্রিয় ও অর্থহীন করে দিয়েছে।

ইসলাম এবং ইসলাম প্রবর্তিত নিয়মসমূহে কোন ত্রুটি রয়েছে, এরূপ ধারণা কারোই মনে যেন না জাগে। কারণ তাতে আসলে কোনই ত্রুটি নেই —ত্রুটি রয়েছে তাদের মধ্যে যারা সঠিকভাবে পূর্ণ ইসলামের অনুসরণ করে চলে না। অতএব, এ অবস্থার জন্য দায়ী বর্তমান মুসলমানরাই। তাই যে ব্যবস্থা তাদেরকে মানবতার পরিপূর্ণ আদর্শে পরিচালিত করতে পারতো এবং যা অনুসরণ করে তারা নেতা হতে পারতো, তা থেকে আজ কোন ভাল ফল লাভ করা যাচ্ছে না। এমন কি অবস্থা এতদূর খারাপ হয়ে গেছে যে, এ ব্যবস্থাই মানবতার পক্ষে সত্যই কল্যাণকর কিনা আজ সে সম্পর্কেও মানুষের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। একজন সুদক্ষ চিকিৎসক যদি কয়েকটি অব্যর্থ ওষুধের তালিকা রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন, তখন তার অকর্মণ্য ও নির্বোধ উত্তরাধিকারীগণের হাতে তা একেবারেই 'অকেজো' হয়ে যায়। ফলে সেই তালিকারও যেমন কোন মূল্য হয় না, অনুরূপভাবে স্বয়ং চিকিৎসকের দুর্নাম হয়—আসল তালিকা যতই ভাল, সঠিক এবং অব্যর্থ হোক না কেন। অতএব এ নির্ভুল তালিকাকে কার্যকর করে তুলতে হলে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতা অপরিহার্য। অপটু ও অজ্ঞ লোকরা সেই তালিকা অনুযায়ী ওষুধ তৈরি করলে তা দ্বারা যেমন কোন উপকার পাওয়া যাবে না শুধু তাই নয়, বরং তাতে ক্ষতি হওয়ার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে। ফলে জাহেল লোকেরা যারা তালিকার যথার্থত যাচাই করতে নিজেরা অক্ষম—তারাই শেষ পর্যন্ত মনে করতে শুরু করবে যে, মূলত তালিকাটাই ভুল। বর্তমান মুসলমানদের সর্বাত্মক অধঃপতনের ব্যাপারে ইসলামেরও ঠিক এই অবস্থা হয়েছে।

শুরু করেছে। মক্কা মোয়াজ্জমায় রাবেতায়ে আলমে ইসলামী বা বিশ্ব মুসলিম সংহতি নামে মুসলিম জাহানের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। পবিত্র হজ্জ ও তার সম্মেলন থেকে প্রকৃত কল্যাণ ও উপকার লাভ করে মুসলমানগণ যাতে পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম উম্মাতের মধ্যে দ্বীনি প্রাণ শক্তি প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে, তার জন্য এ প্রতিষ্ঠান সচেষ্ট রয়েছে। এ সকল দিক থেকে বর্তমানে অবস্থা অনেকটা সন্তোষজনক। এখন দু'টি কাজের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা অপরিহার্য। প্রথমটি হচ্ছে, 'হারামাইনিস–শারীফাইন' (অর্থাৎ পবিত্র মক্কা ও মদীনা)-কে পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বনাশা সয়লাব থেকে রক্ষা করতে হবে আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মুয়াল্লেমদের কর্মপদ্ধতির সংশোধন করতে হবে। আল্লাহ সহায় হোন, সৌদি সরকার এ পর্যায়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জিহাদের হাকীকত

بسم الله الرحمن الرحيم

জিহাদের উদ্দেশ্য

নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেই আলোচনা প্রসঙ্গে বার বার আমি বলেছি যে, এসব ইবাদাত অন্যান্য ধর্মের ইবাদাতের ন্যায় নিছক পূজা, উপাসনা এবং যাত্রার অনুষ্ঠান মাত্র নয় ; কাজেই এ কয়টি কাজ করে ক্ষান্ত হলেই আল্লাহ তাআলা কারো প্রতি খুশী হতে পারেন না। মূলত একটি বিরাট উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে প্রস্তুত করার জন্য এবং একটি বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাদেরকে সুদক্ষ করার উদ্দেশ্যেই এসব ইবাদাত মুসলমানদের প্রতি ফরয করা হয়েছে। এটা মুসলমানকে কিভাবে সেই বিরাট উদ্দেশ্যের জন্য প্রস্তুত করে এবং এর ভিতর দিয়ে মুসলমান কেমন করে সেই বিরাট কাজের ক্ষমতা ও যোগ্যতা লাভ করে, ইতিপূর্বে তা আমি বিস্তারিতরূপে বলেছি। এখন সেই বিরাট উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণ এবং তার বিস্তারিত পরিচয় দানের চেষ্টা করবো।

এ বিষয়ে সংক্ষেপে বলা যায় যে, মানুষের ওপর থেকে গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য শক্তির) প্রভুত্ব বিদূরিত করে শুধু আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করাই এসব ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য এবং এ উদ্দেশ্য লাভের জন্য মন-প্রাণ উৎসর্গ করে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করার নামই হচ্ছে জিহাদ। নামায, রোযা ও যাকাত প্রভৃতি ইবাদাতের কাজগুলো মুসলমানকে এ কাজের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত করে। কিন্তু মুসলমানগণ যুগ যুগ ধরে এ মহান উদ্দেশ্য ও এ বিরাট কাজকে ভুলে আছে। তাদের সমস্ত ইবাদাত বন্দেগী নিছক অর্থহীন অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তাই আমি মনে করি যে, জিহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এর অন্তর্নিহিত বিরাট লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হওয়ার জন্য কিছুমাত্র যথেষ্ট নয়। সে জন্য বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক।

দুনিয়ায় যত পাপ, অশান্তি আর দুঃখ-দুর্দশা স্থায়ী হয়ে রয়েছে, তার মূল কারণ হচ্ছে, রাষ্ট্র এবং শাসন ব্যবস্থার মূলগত দোষ-ত্রুটি, শক্তি এবং সম্পদ সবই সরকারের করায়ত্ব থাকে। সরকারই আইন রচনা করে এবং জারী করে দেশের নিয়ম-শৃংখলা রক্ষা, শাসন ইত্যাদির যাবতীয় ক্ষমতা সরকারেরই একচ্ছত্র অধিকারের বস্তু। পুলিশ ও সৈন্য-সামন্তের শক্তি সরকারের কুক্ষিগত হয়ে থাকে। অতএব, এতে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, যা কিছু

অশান্তি এবং পাপ দুনিয়ায় আছে তা হয় সরকার নিজেই সৃষ্টি করে, নতুবা সরকারের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সাহায্য ও সমর্থনে তা অবাধে অনুষ্ঠিত হতে পারছে। কারণ দেশের কোন জিনিসের প্রচার ও স্থায়িত্ব লাভের জন্য যে শক্তির আবশ্যক তা সরকার ছাড়া আর কারো থাকতে পারে না। চোখ খুলে তাকালেই দেখতে পাওয়া যায়, দুনিয়ার চারদিকে ব্যভিচার অবাধে অনুষ্ঠিত হচ্ছে—দালান-কোঠায়, বাড়ীতে প্রকাশ্যভাবে এ পাপকার্য সম্পন্ন হচ্ছে। কিন্তু এর কারণ কি ? এর একমাত্র কারণ এই যে, রাষ্ট্র ও সরকার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে ব্যভিচার বিশেষ কোন অপরাধ নয়। বরং তারা নিজেরাই এ কাজে লিপ্ত হয়ে আছে এবং অন্যকেও সে দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নতুবা সরকার যদি এ পাপানুষ্ঠান বন্ধ করতে চায়, তবে এটা এত নির্বিকভাবে চলতে পারে না। অন্যদিকে সুদের কারবার অব্যাহতভাবে চলছে। ধনী লোকগণ গরীবদের বুকের তাজা-তপ্ত রক্ত শুষে তাদেরকে সর্বস্বান্ত করে দিচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এটা কেমন করে হতে পারছে ? শুধু এই যে, সরকার নিজেই সুদ খায় এবং সুদখোরদের সাহায্য ও সমর্থন করে। সরকারের আদালতসমূহ সুদের ডিক্রী দেয় এবং তাদের সহায়তা পায় বলে চারদিকে বড় বড় ব্যাংক আর সুদখোর মহাজন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমান সময়ে দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশে ও সমাজে লজ্জাহীনতা ও চরিত্রহীনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরও একমাত্র কারণ এই যে, সরকার নিজেই লোকদেরকে এরূপ শিক্ষা দিচ্ছে এবং তাদের চরিত্রকে এরূপেই গঠন করছে। চারদিকে মানব চরিত্রের যে নমুনা দেখা যাচ্ছে, সরকার তাই ভালোবাসে এবং পসন্দ করে। এমতাবস্থায় জনগণের মধ্যে যদি সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের কোন শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের চেষ্টা করতে চায় তবে তাতে সফলতা লাভ করা সম্ভব হতে পারে না। কারণ, সে জন্য যে উপায়-উপাদান একান্ত অপরিহার্য তা সংগ্রহ করা বেসরকারী লোকদের পক্ষে সাধারণত সম্ভব হয় না। আর বিশেষ প্রচেষ্টার পর তেমন কিছু লোক তৈরী করতে পারলেও প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাদের নিজ নিজ আদর্শের ওপর সুদৃঢ়ভাবে টিকে থাকা মুশকিল হয়ে পড়ে। যেহেতু জীবিকা উপার্জনের যত উপায় আছে এবং এই ভিন্নতর চরিত্র-বিশিষ্ট লোকদের বেঁচে থাকার যতগুলো পন্থা থাকতে পারে তার সবগুলোরই বন্ধ দরযার চাবিকাঠি সাম্প্রতিক বিকৃত ও গুমরাহ সরকারের হাতেই নিবদ্ধ রয়েছে। দুনিয়ায় সীমা-সংখ্যাহীন খুন-যখম ও রক্তপাত হচ্ছে। মানুষের বুদ্ধি এবং জ্ঞান আজ গোটা মানুষকে ধ্বংস করার উপায় উদ্ভাবনেই নিযুক্ত হয়ে আছে। মানুষের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমলব্ধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আজ আগুনে জ্বালিয়ে ভস্ম করা হচ্ছে। মানুষের অসংখ্য মূল্যবান জীবনকে মূল্যহীন মাটির পাত্রের ন্যায় অমানুষিকভাবে সংহার করা হচ্ছে। কিন্তু এটা কেন হয় ? হওয়ার কারণ শুধু

এটাই যে, মানব সন্তানের মধ্যে যারাই সর্বাপেক্ষা বেশী শয়তান প্রকৃতির ও চরিত্রহীন, তারাই আজ দুনিয়ার জাতিসমূহের 'নেতা' হয়ে বসেছে এবং কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের সার্বভৌম শক্তি নিজেদেরই কুক্ষিগত করে নিয়েছে। আজ শক্তি সামগ্রিকভাবে তাদের করতলগত, তাই তারা আজ দুনিয়াকে যেদিকে চালাচ্ছে দুনিয়া সেদিকেই চলতে বাধ্য হচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধন-সম্পদ, শ্রম-মেহনত এবং জীবন ও প্রাণের ব্যবহার এবং প্রয়োগ ক্ষেত্রে তারা যা কিছু নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, তাতেই আজ সব উৎসর্গীকৃত হচ্ছে। দুনিয়ায় আজ যুলুম ও অবিচারের প্রবল রাজত্ব চলছে। দুর্বলের জীবন বড়ই দুঃসহ হয়ে পড়েছে। এখানকার আদালত বিচারালয় নয় এটা আজ বানিয়ার দোকান বিশেষে পরিণত হয়েছে। এখানে আজ কেবল টাকা দিয়ে 'বিচার' ক্রয় করা যায়। মানুষের কাছ থেকে আজ জোর-যবরদস্তি করে ট্যাক্স আদায় করা হয়। সেই ট্যাক্সের পরিমাণেও কোন সীমাসংখ্যা নেই। এবং সরকার তা উচ্চ কর্মচারীদেরকে রাজকীয় বেতন ও ভাতা দেয়ায় (উজির-দূতের টি-পার্টি আর ককটেল পার্টি দেয়ায়), বড় বড় দালান-কোঠা তৈরী করায়, লড়াই সংগ্রামের জন্য গোলা বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করায় এবং এ ধরনের অসংখ্য অর্থহীন কাজে গরীবদের রক্ত পানি করে উপার্জিত অর্থ-সম্পদ নির্বিচারে খরচ করছে। সুদখোর-মহাজন, জমিদার, রাজা এবং সরদার উপাধি প্রাপ্ত এবং উপাধি প্রার্থী রাজন্যবর্গ, গদিনশীন পীর ও পুরোহিত, সিনেমা কোম্পানীর মালিক, মদ ব্যবসায়ী, অশ্লীল পুস্তক-পত্রিকা প্রকাশক ও বিক্রেতা এবং জুয়াড়ী প্রভৃতি অসংখ্য লোক আজ আল্লাহর সৃষ্ট অসহায় মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু, চরিত্র ও নৈতিকতা সবকিছু ধ্বংস করে ফেলছে। কিন্তু তাদেরকে বাধা দেবার কেউ নেই কেন ? এজন্য যে, রাষ্ট্রযন্ত্র বিপর্যস্ত হয়েছে। শক্তিমান লোকেরা নিজেরাই ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তারা নিজেরা তো যুলুম করেই, পরন্তু অন্যান্য যালেমকেও সাহায্য করে। মোটকথা দেশে দেশে যে যুলুমই অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার একমাত্র কারণ এই যে, সাম্প্রতিক সরকার এরই পক্ষপাতী এবং তা সে নীরবে সহ্য করে।

এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে আশা করি একথাটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, সমস্ত বিপর্যয়ের মূল উৎস হচ্ছে হুকুমতের খারাবী। মানুষের মত ও চিন্তার খারাপ হওয়া, আকীদা বিকৃতি হওয়া, মানবীয় শক্তি, প্রতিভা ও যোগ্যতার ভ্রান্ত পথে অপচয় হওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যেও মরাত্মক নীতি-প্রথার প্রচলন হওয়া, যুলুম, না-ইনসাফী ও কুৎসিত কাজ-কর্মের প্রসার লাভ হওয়া এবং বিশ্বমানবের ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাওয়া প্রভৃতি সবকিছুরই মূল কারণ একটি এবং তা এই যে, সমাজ ও সরকারের নেতৃত্ব, শক্তি সবই আজ অনাচারী ও দুরাচারী লোকদের হাতে চলে গেছে। আর শক্তি ও সম্পদের চাবিকাঠি যদি খারাপ লোকদের হাতে থাকে এবং জীবিকা নির্বাহের সমস্ত উপায়ও যদি তাদেরই

করায়ত্ব হয়ে থাকে তবে শুধু যে তারাই আরও খারাপ হয়ে যাবে তাই নয় বরং সমগ্র দুনিয়াকে আরও অধিক ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে, তাদের সাহায্য ও সমর্থনের সর্বব্যাপী বিপর্যয় আরও মারাত্মকভাবে জেগে ওঠবে। বস্তুত তাদের হাতে শক্তি থাকা পর্যন্ত আংশিক সংশোধনের জন্য হাজার চেষ্টা করলেও তা সফল হতে পারে না, একথা একেবারে সুস্পষ্ট।

এ বুনিয়াদী কথাটি বুঝে নেয়ার পর মূল বিষয়টি অতি সহজেই বোধগম্য হতে পারে। মানুষের দূরাবস্থা দূর করে এবং আসন্ন ধ্বংস থেকে তাদেরকে রক্ষা করে এক মহান কল্যাণকর পথে পরিচালিত করার জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সরকারের কর্মনীতিকে সুসংবদ্ধ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ হতে পারে না। একজন সাধারণ বুদ্ধির মানুষও একথা বুঝতে পারে যে, যে দেশের লোকদের ব্যভিচার করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে সেখানে ব্যভিচারের বিরুদ্ধে হাজার ওয়াজ করলেও তা কিছুতেই বন্ধ হতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি দখল করে যদি ব্যভিচার বন্ধ করার জন্য বলপ্রয়োগ করা হয়, তবে জনসাধারণ নিজেরাই হারাম পথ পরিত্যাগ করে হালাল উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হবে। মদ, গাঁজা, সুদ, ঘুষ, অশ্লীল সিনেমা-বায়স্কোপ, অর্ধনগ্ন পোশাক, নৈতিকতা বিরোধী শিক্ষা এবং এ ধরনের যাবতীয় পাপ প্রচলনকে নিছক ওয়াজ-নসিহত দ্বারা বন্ধ করতে চাইলে তা কখনও সম্ভব হবে না। অবশ্য রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে বন্ধ করতে চাইলে অনায়াসে বন্ধ করা যাবে। যারা জনসাধারণকে শোষণ করে এবং তাদের চরিত্র নষ্ট করে, তাদেরকে শুধু মৌখিক কথা দ্বারা লাভজনক কারবার থেকে বিরত রাখা যাবে না। কিন্তু শক্তি লাভ করে যদি এ অন্যায় আচরণ বন্ধ করতে চেষ্টা করা হয় তবে অতি সহজেই সমস্ত পাপের দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে।

মানুষের শ্রম, মেহনত, সম্পদ, প্রতিভা ও যোগ্যতার এই অপচয় যদি বন্ধ করতে হয় এবং সেগুলোকে সঠিক ও সুস্থ পথে প্রয়োগ করতে হয়—যুলুম বন্ধ করে যদি বিচার-ইনসাফ কায়েম করতে হয়, দুনিয়াকে ধ্বংস এবং ভাঙ্গনের করাল গ্রাস ও সর্বপ্রকার শোষণ থেকে রক্ষা করে মানুষকে যদি বাঁচাতে হয়, অধপতিত মানুষকে উন্নত করে সমস্ত মানুষকে যদি সমান মান-সম্মান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি দিয়ে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হয় তবে শুধু মৌখিক ওয়াজ-নসীহত দ্বারা এ কাজ কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। অবশ্য এ জন্য যদি রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করা হয়, তবে তা খুবই সহজে সম্পন্ন হতে পারে। অতএব এতে আর কোন সন্দেহ নেই যে, সমাজ সংস্কারের কোন প্রচেষ্টাই রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ ছাড়া সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না। একথা আজ এতই সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এটা বুঝার জন্য খুব বেশী চিন্তা-গবেষণার আবশ্যক হয় না। আজ

দুনিয়ার বুক থেকে প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি ফেতনা-ফাসাদ দূর করতে চাইবে এবং দুনিয়ার মানুষের দুরাবস্থা দূর করে শান্তি এবং সমৃদ্ধি স্থাপন করতে অন্তর দিয়ে কামনা করবে তার পক্ষে আজ শুধু ওয়ায়েজ ও উপদেশদাতা হওয়া একেবারেই অর্থহীন। আজ তাকে ওঠতে হবে এবং ভ্রান্ত নীতিতে স্থাপিত সরকার ব্যবস্থাকে খতম করে দিয়ে, ভ্রান্ত নীতি অনুসারী লোকদের হাত থেকে রাষ্ট্রশক্তি কেড়ে নিয়ে সঠিক নীতি এবং খাঁটি (ইসলামী) নীতির রাষ্ট্র ও সরকার গঠন করতে হবে।

এ তত্ত্ব বুঝে নেয়ার পর আর এক কদম সামনে অগ্রসর হোন। একথা ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার মানুষের জীবনে যত কিছু খারাবী ও অশান্তি প্রসারিত হচ্ছে, তার মূলীভূত কারণ হচ্ছে রাষ্ট্র ও সরকারের ভ্রান্তি। এবং একথাও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সংশোধন যদি করতে হয়, তবে এর মূল শিকড়ের সংশোধন করতে হবে সর্বাগ্রে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, স্বয়ং রাষ্ট্র ও সরকারের দোষ-ত্রুটির মূল কারণ কি এবং কোন্ মৌলিক সংশোধনের দ্বারা সেই বিপর্যয়ের দুয়ার চিরতরে বন্ধ করা যেতে পারে?

এর একমাত্র জবাব এই যে, আসলে মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্বই হচ্ছে সকল বিপর্যয়ের মূল কারণ। অতএব সংশোধনের একমাত্র উপায় স্বরূপ মানুষের ওপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব খতম করে দিয়ে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করতে হবে। এতবড় প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব শুনে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই। বস্তুত এই প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে যতই খোঁজ ও অনুসন্ধান করা হবে এই একটি মাত্র কথাই এর সঠিক জবাব হতে পারে বলে বিবেচিত হবে।

একটু চিন্তা করে দেখুন, যে দুনিয়ায় মানুষ বাস করে তা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, না অন্য কেউ? পৃথিবীর এই মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, না অন্য কেউ? মানুষের জীবন যাত্রা নির্বাহের এ সীমাসংখ্যাহীন উপায়-উপাদান আল্লাহ সংগ্রহ করে দেন, না অন্য কোন শক্তি? এ প্রশ্নগুলোর একটি মাত্র উত্তরই হতে পারে এবং এছাড়া অন্য কোন উত্তর বস্তুতই হতে পারে না যে, পৃথিবীর মানুষ এবং এ সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। অন্য কথায় এ পৃথিবী আল্লাহর, ধন-সম্পদের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ, মানুষ একমাত্র আল্লাহরই প্রজা। এমতাবস্থায় আল্লাহর রাজ্যে অপরের হুকুম চালাবার কি অধিকার থাকতে পারে? আল্লাহর 'প্রজা' সাধারণের ওপর আল্লাহ ছাড়া অন্যের রচিত আইন কিংবা স্বয়ং প্রজাদের রচিত আইন কি করে চলতে পারে? দেশ ও রাজ্য হবে একজনের আর সেখানে আইন চলবে অপরের। মালিকানা হবে একজনের আর মালিক হয়ে বসবে অন্য কেউ? প্রজা হবে একজনের আর তার ওপর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে অন্য

কারো ? মানুষের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি একথা কেমন করে স্বীকার করতে পারে ? বিশেষত একথাটাই প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আর যেহেতু এটা প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ খেলাপ, তাই যখনই এবং যেখানেই এরূপ হয়েছে সেখানে তারই পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক হয়েছে। যেসব মানুষ আইন প্রণয়ন ও প্রভুত্ব করার অধিকার লাভ করে তারা নিজেরা স্বাভাবিক মূর্খতা ও অক্ষমতার দরুনই নানারূপ বিরাট বিরাট ভুল করতে বাধ্য হয়। আবার অনেকটা নিজেদের পাশবিক লালসার বশবর্তী হয়ে ইচ্ছা করে যুলুম ও অবিচার করতে শুরু করে। তার প্রথম কারণ এই যে, মানবীয় সমস্যা ও ব্যাপারসমূহের সুষ্ঠু সমাধান ও পরিচালনার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় নির্ভুল নিয়ম-কানুন রচনা করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি এবং বিদ্যাই তাদের থাকে না। দ্বিতীয়ত, তাদের মনে আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার আতঙ্ক আদৌ থাকে না বলেই তারা একেবারে বল্গাহারা পশু হয়ে যায় এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী মারাত্মক। যে মানুষের মনে আল্লাহর ভয় একবিন্দু থাকবে না এবং কোন উচ্চতর শক্তির কাছে জবাবদিহি করার চিন্তাও যার হবে না বরং যার মন এই ভেবে নিশ্চিন্ত হবে যে, 'আমার কাছে কৈফিয়ত চেতে পারে এমন কোন শক্তি কোথাও নেই, —এ ধরনের মানুষ যখন শক্তি লাভ করবে, তখন তারা যে বল্গাহারা হিংস্র পশুতে পরিণত হবে তাতে আর সন্দেহ কি ? একথা বুঝার জন্য খুব বেশী বুদ্ধি-জ্ঞানের আবশ্যক করে না। এসব লোকের হাতে যখন মানুষের জীবন-প্রাণ এবং রিযক ও জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিসের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব এসে পড়বে, যখন কোটি কোটি মানুষের মস্তক তাদের সামনে অবনমিত হবে, তখন তারা সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের আদর্শ রক্ষা করে চলবে এমন আশা কি কিছুতেই করা যায় ? তারা পরের হক কেড়ে নিতে, হারাম উপায়ে ধন লুণ্ঠন করতে এবং আল্লাহর বান্দাহগণকে নিজেদের পশু বৃত্তির দাসানুদাস বানাতে চেষ্টা করবে না, এ ভরসা কিছুতেই করা যেতে পারে না। এমন ব্যক্তি নিজেরা সৎপথে থাকবে এবং অন্য মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে, এমন কোন যুক্তি আছে কি ? কখনও নয়। মূলতই তা সম্ভব হতে পারে না, হওয়া বিবেক-বুদ্ধির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতা এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে। বর্তমান সময়েও যাদের মনে আল্লাহর ভয় ও পরকালের জবাবদিহির আতঙ্ক নেই, তারা শক্তি ও ক্ষমতা লাভ করে কত যুলুম, বিশ্বাসঘাতকতা ও মানবতার চরম শত্রুতা করতে পারে, তার বাস্তব প্রমাণ চোখ খুললেই দেখতে পাওয়া যায়।

কাজেই আজ রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসন পদ্ধতির গোড়াতেই সর্বাত্মক আঘাত হানতে হবে। অর্থাৎ মানুষের ওপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব ক্ষমতাকে নির্মূল করে

তথায় একমাত্র আল্লাহ তাআলার প্রভুত্ব ও আইন প্রণয়নের অধিকার স্থাপিত করতে হবে।

অতপর যারাই আল্লাহর প্রভুত্বের বুনিয়াদে হুকুমাত কায়েম করবে ও চালাবে তারা নিজেরা কখনও রাজাধিরাজ ও একচ্ছত্র প্রভু হয়ে বসতে পারবে না—আল্লাহকেই একমাত্র বাদশাহ স্বীকার করে তাঁর প্রতিনিধি হয়েই তাদেরকে রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনা করতে হবে। এ দায়িত্ব হলো তাদের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে অর্পিত মহান আমানত। একথা তাদের অবশ্যই মনে করতে হবে যে, শেষ পর্যন্ত একদিন না একদিন তাদের এ আমানতের হিসেব দিতে হবে সেই মহান আল্লাহর সমীপে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য—সবকিছুই জানেন। রাষ্ট্রের বুনিয়াদী আইন হবে আল্লাহর দেয়া বিধান। কারণ তিনি সবকিছুরই নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত—সকল জ্ঞানের উৎস একমাত্র তিনিই। তাই তাঁর আইন ও বিধানের এক বিন্দু পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার ক্ষমতা বা অধিকার কারো থাকবে না। তাহলেই তারা মানুষের মূর্খতা, স্বার্থপরতা এবং অবাঞ্ছিত পাশবিক লালসার অনধিকার চর্চা থেকে চিরকাল সুরক্ষিত থাকতে পারবে।

ইসলাম এ মূল সংশোধনের দায়িত্ব নিয়েই দুনিয়ায় এসেছে। সমগ্র বিপর্যয়ের মূল উৎসকেই এটা এমনিভাবে সংশোধন করতে চায়। আল্লাহকে যারা নিজেদের বাদশাহ—কেবল মৌখিক আর কাল্পনিক বাদশাই নয়—প্রকৃত বাদশাহ বলে স্বীকার করবে এবং তিনি তাঁর নবীর মধ্যস্থতায় যে বিধান দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তাকে যারা বিশ্বাস করবে ইসলাম তাদের কাছে এ দাবী উত্থাপন করে যে, তারা যেন তাদের বাদশাহর রাজ্যে তাঁর আইন ও বিধান জারি করার জন্য সচেষ্ট হয়। সেই বাদশাহর যেসব প্রজা বিদ্রোহী হয়েছে এবং নিজেরাই রাজাধিরাজ হয়ে বসেছে তাদের শক্তি ক্ষুণ্ন করতে হবে, আর আল্লাহর প্রজাবৃন্দকে অন্য শক্তির 'প্রজা' হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করতে হবে। আল্লাহকে 'আল্লাহ' এবং তাঁর আইনকে জীবন বিধান বলে কেবল স্বীকার করাই ইসলামের দৃষ্টিতে কিছুমাত্র যথেষ্ট নয়, বরং সেই সাথে এ কর্তব্যও আপনা আপনিই তাদের ওপর আবর্তিত হয় যে, তোমরা যেখানেই বাস কর, যে দেশ বা রাজ্যেই তোমাদের বাসস্থান হোক না কেন সেখানেই মানুষের সংশোধন প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। সেখানকার ভ্রান্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলিয়ে সঠিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আল্লাহদ্রোহী নাস্তিক ও আল্লাহ-নির্দিষ্ট সীমালংঘনকারী লোকদের হাত থেকে আইন রচনা ও দায়িত্ব নিজেদের হাতে গ্রহণ করে আল্লাহর বিধান অনুসারে পরকালে জবাবদিহির জাগ্রত অনুভূতি সহকারে আল্লাহকে 'আলেমুল গায়েব' মনে করেই রাষ্ট্রীয় কার্যসম্পন্ন কর।—বস্তুত এই উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা করার নামই জিহাদ।

প্রভুত্ব ও রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার মূলতই অত্যন্ত জটিল, দায়িত্বপূর্ণ কাজ সন্দেহ নেই। তা লাভ করার বাসনা কারো মনে জাগ্রত হলেই তার মধ্যে স্বভাবতই লালসার লেলিহান শিখা জ্বলে ওঠে। পৃথিবীর ধন-সম্পদ ও মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকার লাভ হলেই মানুষের মধ্যে সুপ্ত লালসা জেগে ওঠে—তখন মানুষের ওপর নিরংকুশ প্রভুত্ব বিস্তারের স্পৃহা সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করা খুব কঠিন কাজ নয় ; কিন্তু তা লাভ করার পর নিজে খোদা না হয়ে 'আল্লাহর অনুগত দাস' হিসেবে কর্তব্য পালন করা অধিকতর কঠিন ব্যাপার। কাজেই এক ফিরাউনকে পদচ্যুত করে তুমি নিজে যদি সেখানে 'ফিরাউন' হয়ে বস, তাহলে আসলে লাভ কিছুই হলো না। কাজেই এ বিরাট অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে ইসলাম তোমাকে সে জন্য সর্বতোভাবে তৈরি করে দেয়া অপরিহার্য মনে করে। স্বয়ং তোমার মন ও মগয থেকে স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা দূর না হলে, তোমার মন ও আত্মা নির্মল না হলে, নিজের বা জাতীয় স্বার্থের খাতিরে লড়াই করার পরিবর্তে খালেসভাবে আল্লাহর সন্তোষ লাভ ও বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সাধনা ও সংগ্রাম করতে প্রস্তুত না হলে ; উপরন্তু রাষ্ট্রশক্তি লাভ করার পর নিজের লোভ-লালসা ও দুষ্প্রবৃত্তির অনুসরণ করে খোদা হয়ে বসার পরিবর্তে প্রাণে ঐকান্তিক আগ্রহের সাথে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করার যোগ্যতা না জন্মালে রাষ্ট্র শক্তি লাভের দাবী উত্থাপন করা এবং দুনিয়ার বাতিল শক্তির সাথে লড়াই শুরু করে দেয়ার কোন অধিকার কারো থাকতে পারে না।

কালেমা পড়ে ইসলামের সীমার মধ্যে প্রবেশ করলেই ইসলাম তোমাকে মানুষের ওপর আক্রমণ করার অধিকার বা অনুমতি দেয় না। কারণ তখন তুমিও ঠিক সেই দুষ্কার্য করতে শুরু করবে, যা করছে দুনিয়ার বর্তমান আল্লাহদ্রোহী ও যালেম লোকগণ। বরং এতবড় বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করার আদেশ দেয়ার পূর্বে ইসলাম তোমার মধ্যে সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে চায়।

বস্তুত ইসলামে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদাতসমূহ এ উদ্দেশ্যে প্রস্তুতির জন্যেই নির্দিষ্ট হয়েছে। দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী, পুলিশ ও সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীদের সর্বপ্রথম এক বিশেষ ধরনের ট্রেনিং দিয়ে থাকে। সেই ট্রেনিং-এ উপযুক্ত প্রমাণিত হলে পরে তাকে নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত করা হয়। ইসলামও তার কর্মচারীদের সর্বপ্রথম এক বিশেষ পদ্ধতির ট্রেনিং দিতে চায়। তারপরই তাদের জিহাদ ও ইসলামী হুকুমাত কায়েম করার দায়িত্ব দেয়া হয়। তবে এ উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। দুনিয়ার রাষ্ট্রসমূহ তাদের কর্মচারীদের যে কাজে নিযুক্ত করে থাকে

তাতে নির্মল নৈতিক চরিত্র, মনের নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতা এবং আল্লাহর ভয় সৃষ্টির কোনই আবশ্যক হয় না। এজন্য তাদেরকে কেবল সুদক্ষ করে তোলারই চেষ্টা করা হয়। আর সুদক্ষ হওয়ার পর সে যদি ব্যভিচারী হয়, মদ্যপায়ী হয়, বেঈমান ও স্বার্থপর হয়, তবুও তাতে কোনরূপ আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু ইসলাম তার কর্মীদের ওপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে তা আগা-গোড়া সবই হচ্ছে একান্তভাবে নৈতিক কাজ। অতএব, ইসলামে তাদের 'সুদক্ষ' করে তোলার দিকে যতখানি লক্ষ্য দেয়া হয়, তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় জাগিয়ে তোলা এবং তাদের মন-আত্মাকে পবিত্র করার দিকে গুরুত্ব দেয়া হয় তদপেক্ষা অনেক বেশী। ইসলাম তাদের মধ্যে এতখানি শক্তি জাগাতে চায় যে, যখন তারা দুনিয়ার বুকে আল্লাহর হুকুমাত কায়েম করার দাবী নিয়ে ওঠবে, তখন যেন তারা নিজেদের এ দাবীর ঐকান্তিকতা ও সততা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণ করে দেখাতে পারে। তারা যেন কখনই নিজেদের ধন-দৌলত, জমি-জায়গা, দেশ ও রাজ্য, সম্মান ও প্রভুত্ব লাভ করার জন্য লড়াই না করে। তারা যেন খাঁটিভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে লড়াই করে, আল্লাহর কোটি কোটি বান্দার জন্য লড়াই করে, আর একথা যেন কাজ-কর্মের ভেতর দিয়ে স্বতস্ফূর্তভাবেই প্রমাণিত হয়। তারা বিজয়ী হলে যেন অহংকারী, দাম্ভিক ও আল্লাহদ্রোহী না হয়, তখনও যেন তাদের বিনয়াবনত মস্তক আল্লাহর সামনে অবনমিত থাকে। তারা শাসক হলে মানুষকে যেন তারা নিজেদের দাসানুদাসে পরিণত না করে। বরং নিজেরাই যেন আল্লাহর গোলাম হয়ে জীবন যাপন করে। আর অন্যান্য মানুষকেও যেন একমাত্র আল্লাহর দাস বানাতে চেষ্টা করে। তারা রাষ্ট্রের ধন-ভাণ্ডার হস্তগত করে থাকলে তা যেন কেবল নিজের বা নিজের বংশের কিংবা জাতীয় লোকদের পকেট বোঝাই করার কাজে উজাড় করে না দেয়। তারা যেন আল্লাহর ধন-ভাণ্ডারকে তারই বান্দাদের মধ্যে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে বন্টন করে দেয় এবং একজন খাঁটি আমানতদারের ন্যায় একথা স্মরণ রেখে কাজ করে যে, এক অদৃশ্য চোখ তাকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছে—ওপরে কেউ আছে, যার দৃষ্টি হতে সে কিছুতেই লুকিয়ে থাকতে সক্ষম নয় এবং তারই কাছে তাকে এক এক পয়সার হিসেব দিতে হবে।

বস্তুত মানুষকে এই উদ্দেশ্যে তৈরি করা ইসলামের নির্দিষ্ট এই ইবাদাত-গুলো ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সম্ভব হতে পারে না। আর ইসলাম মানুষকে এভাবে গঠন করে বলে ঃ এখন তোমরা দুনিয়ার বুকে আল্লাহর নেক ও সালেহ বান্দাহ, তোমরা সামনে অগ্রসর হও, লড়াই-সংগ্রাম করে আল্লাহদ্রোহী লোকদেরকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থেকে বিচ্যুত কর এবং সকল ক্ষমতা ও অধিকার নিজেদের হস্তগত করে নেও।

সহজেই বুঝতে পারা যায়, যেখানে সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, আদালত, জেল ও কর ধার্যকরণ ইত্যাদি সকল সরকারী কাজের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ আল্লাহভীরু হবে, পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার অনিবার্যতা সম্পর্কে সচেতন হবে, যেখানে রাষ্ট্র ও শাসন পরিচালনার সমস্ত নিয়ম-কানুন আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে রচিত হবে, সেখানে অবিচার ও অজ্ঞতার কোন অবকাশ নেই, যেখানে পাপ ও পাপানুষ্ঠানের সমস্ত পথ যথাসময়ে বন্ধ করে দেয়া হয়, সরকার নিজেই শক্তি ও অর্থ ব্যয় করে ন্যায়, পুণ্য ও পবিত্র ভাবধারার বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হয়। তথায় মানবতা যে সর্বাংগীন কল্যাণ লাভ করতে পারবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। এ ধরনের সরকার যদি ক্রমাগত চেষ্টা-যত্নের সাহায্যে কিছুকাল পর্যন্ত লোকদের চরিত্র ও স্বভাব-প্রকৃতি গঠন করতে নিযুক্ত থাকে, হারাম পন্থায় অর্থলাভ, পাপ, যুলুম, নির্লজ্জতা ও নৈতিক চরিত্রহীনতার সকল উৎস বন্ধ করে দেয়া হয়, ভুল-ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নীতি বন্ধ করে সুস্থ ও নিখুঁত শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা লোকদের মনোভাব ও চিন্তাধারা তৈরী করতে থাকে, তবে তার অধীনে সমাজে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা, শান্তি, নিরাপত্তা, সচ্চরিত্র ও সৎপ্রকৃতির পবিত্র পরিবেশে মানুষ জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করবে ; তখন মানুষের আমূল পরিবর্তন সূচিত হবে। পাপিষ্ঠ ও আল্লাহদ্রোহী নেতৃত্বাধীনে দীর্ঘকাল বসবাস করার ফলে যে চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে তা স্বতই সত্যদ্রষ্টা ও সত্যনিষ্ঠ হয়ে ওঠবে। নৈতিক পংকিলতার মধ্যে পরিবেষ্টিত থাকার দরুন যে দিল মসীলিপ্ত ও মলিন হয়ে গেছে ; ধীরে ধীরে তা দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হয়ে যাবে এবং সত্যের প্রভাব গ্রহণের যোগ্যতা জেগে ওঠবে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই যে সকলের একমাত্র রব, তিনি ছাড়া আর কেউ যে বন্দেগী পাওয়ার যোগ্য নয় এবং যে নবীজীর মারফত এ সত্যের পয়গাম লাভ হয়েছে, তিনি যে সত্য ও সত্যবাদী নবী—এ তত্ত্ব গভীরভাবে হৃদয়ংগম করা তখনকার পরিবেশে সকলের পক্ষে সহজ হবে। আজ যে কথা বুঝিয়ে দেয়া খুবই কঠিন মনে হয়, তখন তাই সকলের মগযে আপনা-আপনি স্থান লাভ করবে। আজ বক্তৃতা ও বই-পুস্তকের সাহায্যে যে কথা বুঝানো যায় না, তখনকার দিনে সেই কথা এতদূর সহজবোধ্য হবে যে, তাতে নামমাত্র জটিলতা অনুভূত হবে না।

মানুষের মনগড়া মত ও পথ অনুযায়ী কাজ-কর্ম সম্পন্ন হওয়া এবং আল্লাহ নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে তা যারা প্রত্যক্ষ করতে পারবে, আল্লাহর পরিপূর্ণ একত্ব (তাওহীদ) এবং তার পয়গাম্বরের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন তাদের পক্ষে খুবই সহজ এবং তা অবিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। বস্তুত, ফুল ও কাঁটার পার্থক্য জেনে

নেয়ার পর ফুল আহরণ করা সহজ এবং কাঁটা সংগ্রহ করা কষ্টকর হয়ে থাকে। তখনকার দিনে ইসলামের সত্যতা অস্বীকার করা এবং কুফর ও শিরককে আঁকড়িয়ে থাকা বড়ই কঠিন হবে। সম্ভবত, খুব বেশী হলেও হাজারে দশজন লোকের মধ্যেই এতখানি গোঁড়ামি পাওয়া যেতে পারে, তার বেশী নয়।

নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত যে কোন বৃহত্তর উদ্দেশ্যের জন্য ফরয করা হয়েছে, পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আশা করি পাঠকগণ তা সুস্পষ্ট রূপে বুঝতে পেরেছেন। যদিও আজ পর্যন্ত এগুলোকে নিছক পূজা অনুষ্ঠানের ন্যায়ই মনে করা হয়েছে এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই ভ্রান্ত ধারণাই বদ্ধমূল করে রাখা হয়েছে। এটা যে একটি বিরাট ও উচ্চতর কাজের জন্য প্রস্তুতির উদ্দেশ্যেই বিধিবদ্ধ হয়েছে, তা আজ পর্যন্ত প্রচার করা হয়নি। এ কারণেই মুসলমানগণ নিতান্ত উদ্দেশ্যহীনভাবেই এ অনুষ্ঠান উদযাপন করে আসছে ; কিন্তু মূল কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কোন ধারণাই মনের মধ্যে জাগ্রত হয়নি। যদিও মূলত এর জন্যই এ ইবাদাতসমূহ ফরয হয়েছে ; কিন্তু আমি একথা বলতে চাই যে, জিহাদের বাসনা না হলে এবং জিহাদকে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ না করলে এ ইবাদাতসমূহ একেবারে অর্থহীন। এ ধরনের অর্থহীন অনুষ্ঠান পালন করে যদি আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব মনে করা হয়, তবে বিচারের দিন এর সত্যতা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হবে।

জিহাদের গুরুত্ব

ইতিপূর্বে বিভিন্ন পুস্তিকায় দ্বীন, শরীয়াত ও ইবাদাত প্রভৃতি ইসলামী পরিভাষাসমূহের বিস্তারিত অর্থ লিখিত হয়েছে। এখানে প্রসংগত তার দিকে সামান্য ইংগিত করাই যথেষ্ট হবে।

'দ্বীন' অর্থ আনুগত্য করা,
আইনকেই বলা হয় শরীয়াত
ইবাদাত অর্থ বন্দেগী ও দাসত্ব।

আপনি কারো আনুগত্য স্বীকার করলে এবং তাকে নিজের শাসক ও বিধানদাতা হিসেবে মেনে নিলে তার অর্থ এই হবে যে, আপনি তার 'দ্বীন' গ্রহণ করেছেন। পরন্তু আপনি যখন তাঁকে নিজের বিধানদাতা হিসেবে স্বীকার করলেন এবং কার্যত আপনি তাঁর প্রজা হলেন তখন তাঁর আদেশ-নিষেধ ও তাঁর নির্ধারিত নিয়ম-পন্থা আপনার জন্য আইন কিংবা শরীয়াতের মর্যাদা পেল। এমতাবস্থায় আপনি তাঁর 'শরীয়াত' অনুযায়ী জীবন যাপন করেন, তিনি যা কিছুর দাবী করেন আপনি তা পূরণ করেন, তাঁর প্রত্যেকটি হুকুম আপনি পালন করেন, তার নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকেন, যে সীমার মধ্যে থেকে আপনার কাজ করা তিনি সংগত ঘোষণা করবেন, সেই সীমার মধ্যে থেকে আপনি কাজ করতে থাকেন, শুধু তাই নয়, নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ, কাজ-কর্ম, আত্মীয়তা, শত্রুতা ও মামলা-মোকদ্দমা—সবকিছুই তাঁর নির্দিষ্ট নিয়ম-বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন করেন। তাঁরই মত ও ফায়সালাকে চূড়ান্ত বলে মনে করেন ও তাঁর সামনে মাথা নত করেন, কাজেই আপনার এ আচরণকে তাঁর ইবাদাত বা বন্দেগী বলে অভিহিত করা যাবে।

এ বিশ্লেষণ থেকে সুস্পষ্টরূপে বুঝা গেল যে, দ্বীন মূলত রাষ্ট্র সরকারকেই বলা হয়, শরীয়াত হচ্ছে এর আইন এবং এর আইন ও নিয়ম-প্রথা যথারীতি মেনে চলাকে বলা হয় ইবাদাত। আপনি যাকেই শাসক ও নিরঙ্কুশ রাষ্ট্র-কর্তারূপে মেনে তাঁর অধীনতা স্বীকার করবেন, আপনি মূলত তাঁরই দ্বীন-এর অন্তর্ভুক্ত হবেন। আপনার এ শাসক ও রাষ্ট্রকর্তা যদি আল্লাহ হন তবে আপনি তাঁর দ্বীন-এর অধীন হলেন, তিনি যদি কোন রাজা-বাদশা হন, তবে বাদশাহর 'দ্বীন'কেই আপনার কবুল করা হবে। বিশেষ কোন জাতিকে এ মর্যাদা দিলে সেই জাতিরই 'দ্বীন' গ্রহণ করা হবে। আর আপনার নিজের জাতি বা নিজ দেশের জনগণকে সেই অধিকার দিলে জনগণের 'দ্বীন'ই আপনি গ্রহণ করলেন। মোটকথা, যারই আনুগত্য করবেন, প্রকৃতপক্ষে আপনি তাঁরই 'দ্বীন' পালন

করতে থাকবেন এবং যারই আইন আপনি মেনে চলবেন, মূলত তাঁরই ইবাদাত করা হবে।

একথার পরে এ সহজ কথাটিও বুঝতে এতটুকু কষ্ট হবার কথা নয় যে, একজন মানুষ একই সময়কালে দু'টি 'দ্বীন' কোনরূপে পালন করতে পারে না। বিভিন্ন শাসকের মধ্যে এক সময়ে মূলত ও কার্যত একজনকেই অনুসরণ করা সম্ভব। বিভিন্ন আইনের মধ্যে একটি আইন মানুষের জীবনের দায়িত্ব নিতে পারে এবং অসংখ্য মাবুদের মধ্যে একজনেরই ইবাদাত করা আপনার পক্ষে সম্ভব। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে আমরা একজনকে শাসনকর্তা মানবো আর বাস্তবক্ষেত্রে আনুগত্য করবো অপরজনের এবং বন্দেগী করবো তৃতীয় একজনের আইন অনুসারে, এতে আপত্তি কি থাকতে পারে? এর উত্তর এই যে, এটা হতে পারে—বস্তুত এখন চারদিকে এটাই হচ্ছে। কিন্তু জেনে রাখুন এটা পরিষ্কার শির্‌ক, আর শির্‌কের সবটাই সম্পূর্ণ মিথ্যা। বাস্তব ক্ষেত্রে আপনি যারই আইন পালন করে চলবেন, মূলত তারই 'দ্বীন' আপনার পালন করা হবে। অতএব, যার আনুগত্য আপনি করেন না তাঁকে শাসনকর্তা এবং তাঁর 'দ্বীন'কে নিজের 'দ্বীন' বলে প্রকাশ করা বিরাট মিথ্যা ছাড়া কি-ইবা হতে পারে? মুখে একথা প্রচার করলে কিংবা মন দিয়ে তা বুঝতে থাকলে তাতে লাভ কি এবং বাহ্য জগতে তার কি-ইবা ফল পাওয়া যেতে পারে? আপনার জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্ম যখন একজনের শরীয়াত নির্দিষ্ট সীমালংঘন করে, আর কার্যত আপনি অপর কারো শরীয়াত পালন করতে থাকেন, তখন সেই শরীয়াত মেনে চলা সম্পর্কে আপনার দাবী কি একেবারে অর্থহীন হয়ে যায় না? বাস্তবক্ষেত্রে আপনি যখন একজনের বন্দেগী করেন তখন অন্য কাউকে নিজের মাবুদ বলে প্রচার করা এবং নিজের মস্তক তাঁর সামনে অবনত করা কি একটি কৃত্রিম ব্যাপারে পরিণত হয় না? কারণ, প্রকৃতপক্ষে আপনি তাঁরই হুকুম পালন করে চলেন, তাঁরই নিষিদ্ধ কাজ থেকে আপনি বিরত থাকেন, তাঁরই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে সকল কাজ সম্পন্ন করেন এবং তাঁরই উপস্থাপিত নিয়ম-পন্থা আপনি বাস্তবক্ষেত্রে পালন করে চলেন। নিজেদের মধ্যে লেনদেনও তাঁরই দেয়া নিয়ম-নীতি অনুসারে করে থাকেন। আপনার যাবতীয় ব্যাপারে ও কাজ-কর্মে আপনি তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, আপনাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, সংগঠন এবং অধিকার বন্টনের কাজও তাঁরই দেয়া বিধান অনুযায়ী করে থাকেন। শুধু তাই নয় তাঁরই দাবী ও নির্দেশ অনুযায়ী আপনি আপনার মন-মগয ও হাত-পায়ের সমগ্র শক্তি, প্রতিভা, শ্রমোপার্জিত সমস্ত ধন-সম্পদ এবং সর্বশেষে নিজের মহামূল্যবান জীবন প্রাণ পর্যন্ত তাঁর সামনে পেশ করে থাকেন। অতএব, আপনার কাজ যদি আকীদা-

বিশ্বাসের বিপরীত হয়, তবে আপনার বাস্তব কাজই হবে আসল ধর্তব্য ব্যাপার। এমতাবস্থায় নিছক আকীদা-বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই, তা হিসেবের মধ্যে আসতে পারে না। এমন আকীদা-বিশ্বাসের গুরুত্বইবা কি হতে পারে—বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নেই? বাস্তবক্ষেত্রে একজন লোক যদি বাদশাহর দ্বীন মেনে চলে, তবে আল্লাহর দ্বীনের কোন স্থানই সেখানে হতে পারে না। অনুরূপভাবে বাস্তব কাজ-কর্ম যদি জনগণের 'দ্বীন' কিংবা ইংল্যাণ্ড, জার্মান দেশ ও রাজ্যের দ্বীন পালন করা হয়, তবে সেখানেও আল্লাহর দ্বীনের আদৌ কোন স্থান হতে পারে না। পক্ষান্তরে আপনি যদি আল্লাহর দ্বীন মেনে চলেন তবে অন্যান্য কোন দ্বীনের স্থানই সেখানে হবে না। এক কথায় এটা চূড়ান্তভাবে মনে রাখা দরকার যে, শির্‌ক নিছক মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ তত্ত্ব বুঝে নেয়ার পর কোন দীর্ঘ ও জটিল আলোচনা ছাড়া আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, 'দ্বীন' যাই এবং যে ধরনেরই হোক না কেন, রাষ্ট্র ও সরকারী কর্তৃত্ব ছাড়া তার কোন মূল্য নেই। গণ-দ্বীন, শাহী-দ্বীন, কমিউনিষ্ট-দ্বীন কিংবা আল্লাহর দ্বীন যা-ই হোক না কেন, একটি দ্বীনেরও প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রশক্তি ছাড়া আদৌ সম্ভব নয়। প্রাসাদের শুধু কাল্পনিক চিত্র—যার বাস্তব কোন অস্তিত্বই নেই—যেমন অর্থহীন, অনুরূপভাবে রাষ্ট্র সরকার ছাড়া একটি দ্বীন (এবং জীবনব্যবস্থা)-ও সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আপনি যখন বাস করবেন বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদে, তারই দ্বারে প্রবেশ করবেন, তা থেকে বের হবেন, তার ছাদ ও প্রাচীরের ছায়া আপনাকে আশ্রয় দান করবে, তখন এক কাল্পনিক প্রাসাদের রংগীন চিত্র হতে কি ফায়দা আপনি আশা করতে পারেন। আপনাকে তো বসবাসের সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ অনুযায়ী। পরন্তু একটা চিত্র অনুযায়ী নির্মিত প্রাসাদে বসবাস শুরু করে অন্য প্রাসাদের চিত্র কল্পনা করা কিংবা তার প্রতি নিছক একটা ভক্তি বা বিশ্বাস রাখার বাস্তব ক্ষেত্রে কি ফল পাওয়া যেতে পারে? একটি কাল্পনিক প্রাসাদ মনের মধ্যে রেখে বাস্তব বসবাস অন্য কোন প্রাসাদে করা কতখানি হাস্যকর ব্যাপার তা সহজেই অনুমেয়। মস্তিষ্কের মধ্যে যে প্রাসাদের কাল্পনিক চিত্র রয়েছে, তাকে কখনও প্রাসাদ বলা যায় না, আর তাতে বসবাস করাও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ উদাহরণ অনুযায়ী কোন 'দ্বীন'কে সত্য 'দ্বীন' হিসেবে শুধু বিশ্বাস করারই কোন অর্থ হয় না। মানুষ যখন বাস্তব জীবন যাপন করবে একটি 'দ্বীন' অনুসারে তখন অন্য কোন 'দ্বীন'কে কাল্পনিকভাবে বিশ্বাস করা একেবারেই অর্থহীন। কাল্পনিক 'দ্বীন'কেও অনুরূপভাবে 'দ্বীন' বলা যায় না এবং কল্পিত প্রাসাদের ন্যায় কাল্পনিক 'দ্বীন' ও কেউ প্রকৃত 'দ্বীন' রূপে গ্রহণ করতে পারে না। বাস্তব ক্ষেত্রে যার ক্ষমতা স্বীকৃত ও কর্তৃত্ব স্থাপিত হবে, যার আইন

কার্যত চলবে এবং যার দেয়া ব্যবস্থানুযায়ী মানব জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্ম সুসম্পন্ন হবে, বস্তুত দ্বীন তাঁর হবে। অতএব প্রত্যেক দ্বীন স্বভাবতই নিজের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী রাখে এবং দ্বীন এ জন্যই হয় যে, তা যে ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় বন্দেগী, দাসত্ব ও আইন পালনও একমাত্র তাঁরই হবে। একটি উদাহরণ দেয়া যাচ্ছে ঃ

গণ-দ্বীন-এর অর্থ কি ? একটি দেশের অধিবাসী জনগণই সেখানে নিজস্ব ক্ষমতা ও প্রভুত্বের মালিক হয়, তাদের নিজেদের রচিত আইনই তাদের ওপর জারী হয় এবং দেশের সমগ্র অধিবাসী সম্মিলিতভাবে নিজেদের গণ-শক্তির আনুগত্য ও দাসত্ব করে—বস্তুত তাই হচ্ছে গণ-দ্বীন বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কাজেই দেশের প্রকৃত ক্ষমতায় যতদিন জনগণ রচিত আইন জারী না হয়, ততদিন পর্যন্ত এ গণ-দ্বীন বা গণ-রাষ্ট্র কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। প্রতিষ্ঠিত হলো বলে মনে করাও যায় না। কিন্তু জনগণের পরিবর্তে দেশের শক্তি প্রভুত্ব যদি কোন ভিন্ন জাতি কিংবা কোন বাদশাহ্ করায়ত্ব করে নেয় এবং সারা দেশে তারই রচিত আইন জারী হয়, তবে গণ-দ্বীন এর অস্তিত্ব কোথায় থাকবে ? সেখানে কেউ যদি গণ-দ্বীন বা রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তবে তার কি মূল্য হতে পারে ? কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত বাদশাহ্ কিংবা ভিন্ন জাতির দ্বীন প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততদিন সে গণ-রাষ্ট্রের অনুসরণ করতে পারে না।

শাহী-দ্বীন-এর কথাই ধরা যাক। এ দ্বীন অনুযায়ী যে বাদশাহ্ উচ্চতর কর্তা ও প্রভু নির্ধারিত হয়, তার আনুগত্য ও ইবাদাত করা এবং তার আইন বাস্তবে জারী করাই তার মূল লক্ষ্য। তাই যদি না হয় তবে বাদশাহকে বাদশাহ মানলে এবং তাকে শ্রেষ্ঠ প্রভু স্বীকার করলে বাস্তবে কি লাভ হবে ? বাস্তব ক্ষেত্রে যদি গণ-দ্বীন বা গণ-রাষ্ট্র কিংবা ভিন্ন জাতির শাসন স্থাপিত হয় তাহলে 'শাহী-দ্বীন' থাকলো কোথায় ? তার অনুসরণই বা কে করতে পারে ?

বেশী দিনের কথা নয়, এ দেশে (অধুনা তিরোহীত) ইংরেজের দ্বীন বা রাষ্ট্র সম্পর্কে চিন্তা করলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইংরেজের শক্তি ও প্রভুত্বের মারফতে ভারত শাসন আইন ও দেওয়ানী আইন জারী ছিল বলেই তো এ দ্বীন চলছিল। দেশবাসীর সমস্ত কাজ-কর্ম ইংরেজের নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতিতে সম্পন্ন হতো। সকল মানুষ তারই হুকুম মাথা নত করে পালন করতো। এ দ্বীন এতখানি শক্তি সহকারে যতদিন পর্যন্ত স্থাপিত ছিল, ততদিন পর্যন্ত এখানে অন্য কোন দ্বীনের বস্তুতই কোন স্থান ছিল না। ফৌজদারী দণ্ডবিধি ও দেওয়ানী কার্যবিধি রহিত হয়ে গেলে এবং ইংরেজের আইন পালনও কার্যত তার দাসত্ব না করা হলে ইংরেজ রাষ্ট্র বা দ্বীন কোথায় থাকবে ?—বস্তুত দ্বীন ইসলামের

অবস্থাও ঠিক এরূপ। এ দ্বীনের মূল কথা এই যে, পৃথিবীর মালিক ও সমগ্র মানুষের একমাত্র বাদশাহ হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। কাজেই আনুগত্য ও দাসত্ব একমাত্র তারই করতে হবে এবং তাঁর দেয়া শরীয়াত অনুযায়ী মানব জীবনের সকল প্রকার কাজ-কর্ম সম্পন্ন করতে হবে। ইসলাম কর্তৃক স্থাপিত এ মত —উচ্চতর ক্ষমতা ও প্রভুত্ব একমাত্র আল্লাহর—কেবলমাত্র এজন্যই পেশ করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহরই আইন চলবে, অন্য কারো নয়। আদালতের বিচার তাঁর বিধান অনুযায়ী হবে, পুলিশ তাঁরই বিধান জারী করবে। লোকদের পারস্পরিক যাবতীয় কাজ-কর্ম, লেন-দেন ইত্যাদি তাঁর বিধান অনুসারে সম্পন্ন হবে। তাঁরই মর্জী অনুযায়ী 'কর' নির্ধারিত হবে —তার ব্যয়ও হবে একমাত্র তাঁরই দেয়া রীতিনীতি অনুযায়ী। সিভিল সার্ভিস এবং সৈন্য বিভাগ তাঁরই হুকুমের অধীন হবে। সকল লোক ভয় করবে —অন্তরের সাথে সমীহ করে চলবে—দেশের প্রজা সাধারণ একমাত্র তারই অনুগত হবে। এক কথায় মানুষ আল্লাহ ভিন্ন কারো দাসত্ব বরণ করবে না। অতএব এটা সুস্পষ্ট কথা যে, খাঁটি ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত না হলে উক্ত উদ্দেশ্য কিছুতেই লাভ করা যেতে পারে না। অন্য কোন দ্বীনের সাথে এর কোন সামঞ্জস্য নেই— অংশীদারিত্বও নেই, আর সত্য কথা এই যে, কোন 'দ্বীন'ই অন্য দ্বীনের অংশীদারিত্বও বরদাশত করতে পারে না। অন্যান্য দ্বীনের ন্যায় দ্বীন ইসলামও এ দাবী করে যে, ক্ষমতা ও প্রভুত্ব নিরংকুশভাবে কেবলমাত্র আমারই হবে এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি 'দ্বীন'ই আমার সামনে অবনত পরাজিত থাকবে। অন্যথায় আমার অনুসরণ কি করে সম্ভব হতে পারে ? আমার দ্বীন 'গণ-দ্বীন' হবে না, 'শাহী-দ্বীন' হবে না, 'কমিউনিষ্ট-দ্বীন' হবে না। অপর কোন দ্বীনেরই অস্তিত্ব থাকবে না। পক্ষান্তরে অন্য কোন দ্বীনের অস্তিত্ব থাকলে আমি থাকবো না। তখন আমাকে শুধু মুখেই সত্য বলে স্বীকার করলে কোন বাস্তব ফল পাওয়া যাবে না। কুরআন মজীদ বার বার একথাই ঘোষণা করেছে ঃ

وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَاءَ -

"লোকদের শুধু এ হুকুমই দেয়া হয়েছে (এছাড়া অন্য কোন নির্দেশই দেয়া হয়নি) যে, তারা সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদাত করবে।"

–(সূরা আল বাইয়্যেনাহ ঃ ৫)

هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ

وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○ (التوبة : ٣٣)

"তিনি তাঁর রাসূলকে জীবনব্যবস্থা ও সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন—এজন্য যে, একে সমগ্র দ্বীনের ওপর জয়ী করে দেবেন ; যদিও শিরক-বাদীগণ এটা মোটেই বরদাশত করে না।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৩৩)

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ج (الانفال : ٣٩)

"তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতদিন না ফেতনা নির্মূল হয়ে যায় এবং 'দ্বীন' সমগ্রভাবে আল্লাহ তাআলারই স্থাপিত হয়।"–(সূরা আনফাল ঃ ৩৯)

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ط -(يوسف : ٤٠)

"আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম দেয়ার অধিকার নেই। তাঁরই নির্দেশ এই যে, স্বয়ং আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না।"–(ইউসুফ ঃ ৪০)

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا ۝ (الكهف : ١١٠)

"যে ব্যক্তি নিজের রবের সাক্ষাত লাভ করতে ইচ্ছুক সৎকাজ করা এবং রবের ইবাদাতের ব্যাপারে অপর কাউকে শরীক না করা তার একান্তই কর্তব্য।"–(সূরা আল কাহাফ ঃ ১১০)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ط

... وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط (النساء : ٦٠-٦٤)

"যারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে যা নাযিল হয়েছে, তার প্রতি তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের এ বৈষম্য তুমি লক্ষ্য করনি যে, তারা 'তাগুত' (আল্লাহদ্রোহী রাষ্ট্রশক্তি ও বিচার ব্যবস্থা)-এর কাছে নিজেদের (মকদ্দমার) বিচার ফায়সালা চায়। অথচ তাকে অস্বীকার ও অমান্য করার নির্দেশই তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। .... আমরা যে রাসূলই পাঠিয়েছি, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর অনুসরণ করার উদ্দেশ্যেই তাঁকে পাঠিয়েছি।"
–(সূরা আন নিসা ঃ ৬০-৬৪)

ইবাদাত, দ্বীন ও শরীয়াতের পূর্বোক্ত ব্যাখার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের এ আয়াতসমূহের মূল অর্থ ও ভাবধারা অনুধাবন করতে পাঠকদের আদৌ অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

ইসলামে জিহাদের এতদূর গুরুত্ব কেন, তাও পূর্বোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। অন্যান্য ধর্ম ও দ্বীনের ন্যায় শুধু সত্য বলে মেনে নিলেই এবং এই আকীদা ও বিশ্বাসের বাহ্যিক নিদর্শন স্বরূপ শুধু পূজা-উপাসনার অনুষ্ঠান পালন করলেই আল্লাহর 'দ্বীন' সন্তুষ্ট হতে পারে না। কারণ অন্য কোন দ্বীনের অধীন থেকে আল্লাহর দ্বীনের আনুগত্য ও অনুসরণ করা আদৌ সম্ভব নয়,—অন্য কোন দ্বীনের সংমিশ্রণে তার অনুসরণ অসম্ভব। অতএব আল্লাহর এ দ্বীনকে যদি বাস্তবিকই সত্য দ্বীন বলে বিশ্বাস করেন, তবে তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ সাধনা ও সংগ্রাম করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় থাকতে পারে না। এ সাধনা ও সংগ্রামের ফলেই ইসলাম কায়েম হবে, অন্যথায় এই প্রচেষ্টায় নিযুক্ত থেকে জীবন দান করতে হবে, বস্তুত এটা একটি শাশ্বত মানদণ্ড, এতে আপনার ঈমান ও আকীদার সত্যতার যাচাই হতে পারে। ইসলামের প্রতি আপনার যথার্থ ঈমান থাকলে অপর কোন দ্বীনের অধীন থেকে সুখ নিদ্রায় অচেতন থাকা আপনার পক্ষে অসম্ভব হবে, তার খেদমত করা এবং তার বিনিময়ে লব্ধ জীবিকার কিছুমাত্র স্বাদ গ্রহণ করার তো কোন কথাই ওঠতে পারে না। দ্বীন ইসলামকে একমাত্র সত্য হিসেবে মেনে নেয়ার পর অন্য কোন দ্বীনের অধীন আপনার জীবন যদি অতিবাহিত হয়ও তবু আপনার শয্যা কন্টকাকীর্ণ, খাদ্য বিষাক্ত ও তিক্ত বিবেচিত হবে এবং আল্লাহর এ সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ সাধনা না করে এক বিন্দু স্বস্তিও আপনি লাভ করতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহর দ্বীন ভিন্ন অপর কোন দ্বীনের অধীন জীবন যাপন করায় আপনার যদি তৃপ্তি লাভ হয় এবং সেই অবস্থায় আপনার মন সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত হয়ে থাকে, তবে আপনি আদৌ ঈমানদার নন—আপনি মনোযোগ দিয়ে যতই নামায পড়েন, দীর্ঘ সময় ধরে 'মোরাকাবা' করেন, আর কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা করেন ও ইসলামের দর্শন প্রচার করেন না কেন ; কিন্তু আপনার ঈমানদার না হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। দ্বীন ইসলাম বিশ্বাস করে অন্য কোন দ্বীনের প্রতি যে সন্তুষ্ট থাকবে, তার সম্পর্কে এটাই চূড়ান্ত কথা। কিন্তু যেসব মুনাফিক অন্যান্য দ্বীনের নিষ্ঠাপূর্ণ খেদমত করে, কিংবা অন্য কোন দ্বীন (যথা গণ-দ্বীন) প্রতিষ্ঠার জন্য সাধনা ও চেষ্টা করে তাদের সম্পর্কে কিইবা বলা যায় ? ..... মৃত্যু দূরে নয়, যখন তা উপস্থিত হবে, তখন তাদের বৈষয়িক জীবনের 'আমলনামা' স্বয়ং আল্লাহই তাদের সামনে উপস্থিত করবেন। বস্তুত এরা নিজেদেরকে যদি মুসলমান বলে মনে করে, তবে এটা তাদের চরম নির্বুদ্ধিতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাদের সুষ্ঠু বুদ্ধি থাকলে তারা নিজেরাই বুঝতে পারতো যে, একটি দ্বীনকে সত্য বলে মানা ও স্বীকার করা আর বাস্তব ক্ষেত্রে অপর কোন দ্বীনের প্রতিষ্ঠায় সন্তুষ্ট থাকা কিংবা সেই কাজে অংশগ্রহণ করা ও সে জন্য চেষ্টা করা—পরস্পর বিরোধী কাজ। আগুন ও পানি হয় তো

মিলতে পারে ; কিন্তু আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে এরূপ কার্য পদ্ধতির কোন সামঞ্জস্যই হতে পারে না।

কুরআন শরীফে এ সম্পর্কীয় সমস্ত আয়াত এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। মাত্র কয়েকটি আয়াত এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ○ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ○ (العنكبوت : ٢-٣)

"তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, ঈমান এনেছি বললেই তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে ? এ ব্যাপারে তাদেরকে বিন্দুমাত্র পরীক্ষা করা হবে না ; অথচ তাদের পূর্বে যারাই ঈমানের দাবী করেছে তাদেরকে আমরা পরীক্ষা করেছি, যেন আল্লাহ জানতে পারেন যে, ঈমানের দাবী করার ব্যাপারে কে খাঁটি ও সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী।" -(সূরা আনকাবুত ঃ ২-৩)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ط وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ط اَوَ لَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ○

"কিছু সংখ্যক লোক এমন আছে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাবী করে ; কিন্তু আল্লাহর পথে তারা যখনই নির্যাতিত হয়েছে, তখনই মানুষের নির্যাতনে তারা এতদূর ভীত হয়ে পড়েছে, ঠিক যতখানি ভীত হওয়া উচিত আল্লাহর আযাবের। অথচ তোমার রবের কাছ থেকে সাফল্য ও বিজয় লাভ হলে এরাই অগ্রসর হয়ে বলবে ঃ 'আমরা তোমাদের সাথেই ছিলাম'। এদের মনের কথা কি আল্লাহ্ জানেন না ? তবুও কোন্ সব লোক প্রকৃত মু'মিন এবং কোন্ সব লোক মুনাফিক, তা আল্লাহ অবশ্যই দেখে নেবেন।"-(সূরা আনকাবুত ঃ ১০-১১)

مَاكَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ط (ال عمران : ١٧٩)

"মু'মিনগণকে বর্তমান অবস্থায় ছেড়ে দেয়া আল্লাহর নীতি বিরোধী, (কেননা, এখন সত্যবাদী, মিথ্যাবাদী এবং খাঁটি ঈমানদার ও মুনাফিক

একাকার হয়ে আছে) আল্লাহ পবিত্র ও পাপীদের মধ্যে নিশ্চয়ই তারতম্য করবেন।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৯)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ط ـ التوبة : ١٦

"তোমরা কি মনে কর, তোমাদেরকে আল্লাহ এমনি ছেড়ে দেবেন ? অথচ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে, আর আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিন লোকদেরকে কে ত্যাগ করে অন্য লোকদের সাথে গোপন সম্পর্ক স্থাপন করেনি, তা এখনও আল্লাহ তাআলা পার্থক্য করে দেখেননি।"

–(সূরা আত তাওবা ঃ ১৬)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ط مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ لا ..... أُولٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ط أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ أُولٰئِكَ فِي الْأَذَلِّيْنَ ○ كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيْ ط إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○ ـ المجادلة : ١٤ـ١٩

"তুমি কি ওসব লোকের কথা চিন্তা করে দেখেছ, যারা অভিশপ্ত লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করে ? মূলত এরা না তোমাদের আপন লোক, না তাদের। .... এরা শয়তানের দলভুক্ত ! সাবধান ! শয়তানের দলই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে। যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় (দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধাচরণ করে) তারা নিশ্চয়ই পরাজিত হবে। আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা এই যে, আমি (আল্লাহ) এবং আমার রাসূলগণই জয়ী হবো। প্রকৃত শক্তিশালী পরাক্রমশালী হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা।"

–(সূরা মুজাদালা ঃ ১৪, ১৯-২১)

উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহর দীন ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন কোথাও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকলে তথাকার সত্যনিষ্ঠ আদর্শবাদী মু'মিনদের পরিচয় এই হবে যে, এ বাতিল 'দ্বীন' নির্মূল করে প্রকৃত আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য তারা সাধনা করবে। তারা যদি বাস্তবিক তাই করে, নিজেদের সমগ্র শক্তি এ উদ্দেশ্যেই নিযুক্ত করে, নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত কুরবানী দেয় ও সকল প্রকার ক্ষতি-লোকসান অকাতরে বরদাশত করে, তবে তাদের সাচ্চা ঈমানদার হওয়ায় কোন সন্দেহ নেই। তাদের চেষ্টা-সাধনা সাফল্য লাভ করলো কি করলো না সেই প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু তারা যদি

বাতিল দ্বীনের প্রতিষ্ঠায়ই সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত থাকে, কিংবা তাকে জয়ী ও প্রতিষ্ঠিত রাখার কাজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অংশগ্রহণ করে, তবে তাদের ঈমানদার হওয়ার দাবী একেবারেই মিথ্যা, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

পরন্তু দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নানা প্রকার বাধা-প্রতিবন্ধকতার কথা যারা ওযর হিসেবে পেশ করে থাকে, উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাদেরও জবাব দিয়েছেন। দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যখন কোথাও চেষ্টা করা হবে, কোন না কোন বাতিল 'দ্বীন' পূর্ণ শক্তি সহকারে তথায় পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত থাকবেই। সকল প্রকার শক্তি ক্ষমতা তার দখলে থাকবে, জীবিকার ভাণ্ডার তারই কুক্ষিগত হবে এবং মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তার প্রভাব প্রবল থাকবে ; এরূপ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীনকে চূর্ণ করে অপর কোন দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি আর যাই হোক—কোন কুসুমাস্তির্ণ পথ হতে পারে না। পরম শান্তি ও স্বস্তি সহকারে নবাবী চালে কাজ করলে এ উদ্দেশ্য কখনই সফল হতে পারে না, আর তা কখনও সম্ভব নয়। বাতিল দ্বীনের অধীনে থেকে কিছু না কিছু বৈষয়িক সুখ-শান্তি লাভ হতে থাকবে, আর সেই সাথে দ্বীন ইসলামও প্রতিষ্ঠিত হবে—এটা একেবারেই অসম্ভব। এ বিরাট কাজ তখনই সম্পন্ন হতে পারে যখন বাতিল দ্বীনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সকল অধিকার, স্বার্থ ও যাবতীয় আয়েশ-আরামকে আপনারা পদাঘাত করতে প্রস্তুত হবেন এবং এ কাজে যত ক্ষতি-লোকসানেরই সম্মুখীন হতে হয়, সাহসের সাথে আপনারা তা বরদাশত করতে প্রস্তুত থাকবেন। বস্তুত যারা এ কঠোর সাধনা করতে প্রস্তুত থাকবে, আল্লাহর পথে জিহাদ করা কেবলমাত্র তাদের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের লোক সকল সমাজে মুষ্টিমেয়ই থাকে। আর যারা দ্বীন ইসলাম অনুসরণ করে চলতে চাইলেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়, তাদের সম্পর্কে আমি কোন ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাই না, তারা নিরাপদে নিজেদের নফসের খেদমত করতে থাকুক, সত্যের মুজাহিদগণ দুঃখ-নির্যাতন অকাতরে ভোগ করে এ পথে অপরিসীম কুরবানী দিয়ে যখন দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করে দেবে তখনই তারা এসে বলবে—"আমরা তো তোমাদেরই দলের লোক, অতএব এখন আমাদেরও প্রাপ্য অংশ দাও।"

–ঃ সমাপ্ত ঃ–

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই